বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)

মুহাম্মদ নুরল ইসলাম

২য় খন্ড

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৩
প্রকাশকাল : জুন ২০০০
প্রচ্ছদ ঃ রফিক উল্যাহ

মম প্রকাশ ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে এ. জেড. এম. তৌহিদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালুক প্রিন্টার্স, প্যারিদাস রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষরবিন্যাস জীবন কম্পিউটার, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ১৫০ টাকা

ISBN : 984-8418-72-5

সূচনা

"বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)' পুস্তকের প্রথম খণ্ডে সমাজ বিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞান নিয়ে সামান্য কিছুটা আলোচনা করেছি। যদিও এ আলোচনা ছিল ব্যাপক এবং সীমাহীন, তবুও শেষ করতে হয়েছিল এ জন্যেই যে, আমরা সংক্ষেপে হলেও এ মহামানবের মুখনিঃসৃত বাণী ও কার্যপদ্ধতি দেখে অন্যান্য বিষয়ের ওপর কিছুটা জ্ঞানলাভ করব। দ্বিতীয় খণ্ডে তাই লিখতে চললাম যৌন-বিজ্ঞান।

রসুল (দঃ)-এর জীবন চরিত আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম 'যৌন-বিজ্ঞান পরিচ্ছেদ' তাঁর জীবনের এক সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। আমরা ভ্রমবশতই হোক, অজ্ঞতাবশতই হোক অথবা লজ্জাবশতই হোক, তাঁর এ শ্রেষ্ঠ অবদানকে সমাজের কাছে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারি নি, আর এ জন্যই পুরুষ নারীকে—আর নারী পুরুষকে সঠিকভাবে চিনবার সুযোগ পায় নি। তাই পরিবারের মাঝে বিশৃঙ্খলা, জীবনের মাঝে অশান্তি আর পরম সুখের মাঝে অনাবিল দুঃখ ভরে আছে।

নারীর সৃষ্টি-রহস্য না জানলে নারীকে বোঝা যায় না। নারীর শারীরিক গঠন, মানসিক অবস্থা, প্রেমের ভঙ্গি পুরুষ হতে কেমন ভিন্ন এ তত্ত্ব জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি পুরুষের আকৃতি, প্রকৃতি, মন-মেজাজ ও কার্যক্ষমতার একটা সঠিক চিত্র নারীদের মনেও ভাসমান থাকা প্রয়োজন। তবেই একে অপরকে জানা ও চেনার মাঝে এক সুখের জীবন রচিত হয়। এ উদ্দেশ্য নিয়েই নারী-পুরুষের বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আবহাওয়া ও পরিবেশে লালিত-পালিত নারী-পুরুষের চালচলন, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি ও যৌনতৃষ্ণা যে বিভিন্ন, তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনপদ্ধতি যে একরূপ নয়, অথচ কিভাবে তারা সংসার-জীবন যাপন করে, স্বামী-স্ত্রীর বিরহ, ব্যথা, বিচ্ছেদ কলহ কিভাবে সৃষ্টি হয়, এর সমাধানের উপায় কি, এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর জীবনচরিত ও বাণীর মাধ্যমে এ পুস্তকে আলোচনা করবার সামান্যতম প্রয়াস পেয়েছি।

অপূর্ব সৃষ্টির অপূর্ব স্বাদ গ্রহণ করারই নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের বৈজ্ঞানিক নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি ঘোষণা করলেন— "লাইছার রাহ্‌বানিয়াতা ফিল ইসলাম'—অর্থাৎ ইসলামে বৈরাগ্য নেই। সংসার জীবনেই মুক্তি, ভালবাসার মাঝেই আকর্ষণ, প্রেম ও মায়ার মাঝেই আনন্দ—যা সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন, তা-ই তিনি দেখালেন দৈনন্দিন জীবনে। বললেন— 'বিবাহ করা আমার বিধান। অতএব কেহ তাহা লঙ্ঘন করিও না।' (সগির) এমন কঠোর নির্দেশ আমরা ইতিপূর্বে পাই নি। তিনি নিজে বিবাহ করেছেন, প্রেমের বন্ধন শিখিয়েছেন, যৌন-জীবনের টুকিটাকি আলোচনা করে জ্ঞানদান করেছেন এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। কিভাবে করেছেন, কি শিখিয়েছেন—বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন ও যৌনমিলন পরিচ্ছেদে তার কিছুটা আলোচনা করেছি।

যুগে যুগে নারীকে নিয়ে যে বিভৎস কাণ্ড ঘটত, টানা হেঁচড়া করে পথে-ঘাটে নামিয়ে তাদের কিরূপে মান-ইজ্জত নষ্ট করা হতো, ইচ্ছামতো গ্রহণ ও বর্জন করে তাদের কিভাবে সমাজচ্যুত করা হতো এসব ঘটনা কারো জানবার বাকি নেই। করুণার নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) তাদের এমন দুর্দশা দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন- 'নারীর উপর পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে, পুরুষের উপরও নারীর তদ্রূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।' (হাদিস)

pdf By Syed Mostafa Sakib

'নারীকে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী' আখ্যায়িত করে তিনি কিভাবে তাদের সম্মানিত করলেন, পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী করলেন, স্বামীর সংসারে শান্তিদায়িনী হিসাবে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নারী-পুরুষের মধুময় জীবনের ব্যবস্থা করলেন, যুগ যুগের ভ্রান্ত, অলীক ও কুসংস্কারের মাথায় কুঠারাঘাত করে 'মায়ের পদপ্রান্তে বেহেশ্‌ত'—এমন শান্তির বাণী শোনালেন তার কিছুটা বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি। হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা পরিহার করে কিভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নারীকে নিয়ে সংসার-জীবন যাপন করা যায়, রসুল (দঃ)-এর 'বহু বিবাহ ও তার কারণ' পরিচ্ছেদে তার ব্যাখ্যা দান করে মানুষের মাঝে এক প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরবারও প্রয়াস পেয়েছি। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ মেলামেশা, ব্যভিচার প্রভৃতি সমাজের কি অধঃপতন ঘটায়, এর কারণ, ফলাফল ও প্রতিকারের উপায় কি, 'দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ও প্রতিকার' পরিচ্ছেদে নবীজীর আদেশ ও উপদেশের মাধ্যমেও তা দেখিয়েছি। উপরন্তু কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সচেতন হতে অনুরোধ জানিয়েছি।

পর্দাপ্রথা কি ও কেন—এর বৈজ্ঞানিক যুক্তি কি, এটা না মানার কুফল সমাজে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, বিভিন্ন দেশের সামাজিক আচরণ ও ফলাফল দেখে তার বর্ণনা যেমন দিয়েছি—তেমনি বিভিন্ন ধর্মের মনীষীদের এবং আল্লাহ-রসুলের নির্দেশিত পথও দেখিয়েছি।

অতি সামান্যতম বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান নিয়ে যতটুকু গবেষণা করে পেয়েছি, তা-ই এ ক্ষুদ্র বইখানিতে তুলে ধরেছি। নর-নারী, যুবক-যুবতী ও আমার স্কুল-কলেজের ভাই-বোনেরা যদি এ লেখার মাধ্যমে কিছুটা আনন্দ লাভ করেন এবং প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনকে মধুময় করে গড়ে তোলেন এবং মহান আল্লাহর কাছে এ নিয়ামতের জন্য শোকর আদায় করেন, তবেই নিজেকে ধন্য মনে করব এবং এ লেখার সার্থকতা বোধ করব। খোদা হাফেজ।

—লেখক

---------- আরজ

জনাব নুরল ইসলাম সাহেবের লিখিত 'বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ) দ্বিতীয় খণ্ড' প্রকাশ করতে পেরে আজ আমি আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে শোকর আদায় করছি। পাঠকের বহু আকাঙ্ক্ষিত এ বইখানি সমাজের প্রতিটি স্তরেই, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে সমাদৃত হবে এ আশা আমি দৃঢ়ভাবেই পোষণ করি। তাই বিনীতভাবেই আরজ করি আমার ভাই-বোনদের কাছে তারা যেন গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিয়ে এ বইখানি পাঠ করেন এবং বৈজ্ঞানিক নবীর তত্ত্ববহুল আদেশ ও উপদেশকে পালন করে সুখী ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলেন। এ বইখানি সযত্নে আপনার বংশধরদের জন্য রাখুন, বন্ধু ও বান্ধবীকে উপহার দিয়ে আপনার দায়িত্ব পালন করুন—একান্তভাবে এটাই কামনা করি। ইতি

—প্রকাশক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সৃষ্টি-বৈচিত্র্য	৯
যৌন-বিজ্ঞান	১২
নর ও নারী	১২
নারী ও পুরুষের দৈহিক পার্থক্য	১৪
নারীর বাধ্য পুরুষের ধ্বংস অনিবার্য	১৬
যৌবন	১৭
পুরুষের যৌবন	১৭
নারীর যৌবন	১৮
বিবাহ	১৮
বিবাহের প্রয়োজনীয়তা	১৯
বিবাহের উপকারিতা	১৯
বিবাহের শর্ত	২৩
বিভিন্ন ধর্মে বিবাহ প্রথা	৩০
ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানী প্রথা	৩১
স্বয়ম্বর প্রথা	৩১
গান্ধর্ব প্রথা	৩১
পৈশাচিক বিবাহ	৩১
রাক্ষস বিবাহ	৩১
আসুর বিবাহ	৩১
বিনিময় বিবাহ	৩২
পরীক্ষামূলক প্রথা	৩২
প্রেম নিবেদন প্রথা	৩২
ইসলামী প্রথা	৩৩
আনন্দ উৎসব	৩৫
পণ প্রথা	৩৭
বিবাহের বিধি-নিষেধ	৩৯
অবৈধ নারী	৪০
অদল-বদল বিবাহ	৪২
বহু বিবাহ	৪৫
শলোমনের পাপে পতন ও তার ফল	৪৫
বিবাহের মহানায়ক	৪৬
কারণ	৪৬
প্রয়োজন ও ফলাফল	৪৭
হজরতের বহু বিবাহ ও তার কারণ	৪৯
খাদিজাকে বিবাহের কারণ	৫০
হজরত আয়েশার সাথে বিবাহের কারণ	৫১
হাফসাকে বিবাহের কারণ	৫২
সওদা ও মায়মুনাকে বিবাহের কারণ	৫২
উম্মে হাবিবার সঙ্গে বিবাহের কারণ	৫২
জয়নবকে বিবাহের কারণ	৫৩
জওয়ায়েরার সঙ্গে বিবাহের কারণ	৫৪
সফিয়ার সঙ্গে বিবাহের কারণ	৫৫
রায়হানাকে বিবাহের কারণ	৫৬
মেরীর সঙ্গে বিবাহের কারণ	৫৬
দ্বিতীয়া জয়নবকে বিবাহের কারণ	৫৭
দাম্পত্য জীবন	৫৯
দাম্পত্য জীবনের সুখ ও দুঃখ	৬১
পুরুষ চরিত্র	৬২
নারী চরিত্র	৬৯
যৌন-কামনা	৭০
দুর্বলতা	৭০
সহিষ্ণুতা ও আবেগপ্রবণতা	৭০
শক্তির পূজারিণী	৭১
মায়াবিনী	৭৩
বিশ্বাসিনী	৭৩
বিদ্বেষিণী	৭৩
বিলাসিনী	৭৫
সংসারিণী	৭৫
বিশ্বাসঘাতিনী	৭৬
কলহিনী	৭৭
যৌন মিলন	৭৮
চোখ	৮২
কান	৮৪
ত্বক	৮৪
নাসিকা	৮৫
সঙ্গমের গুরুত্ব	৮৭
সঙ্গমের নিয়ম ও নিষিদ্ধ সময়	৮৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৯৫
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য	৯৫
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য	৯৯
দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ও প্রতিকার	১০০
অশিক্ষা	১০১
অধৈর্য	১০২
যৌনমিলনের গরমিল	১০৭
শ্বেত প্রদর রোগে	১০৮
হরিদ্রাবর্ণ প্রদর রোগে	১০৮
শ্বেতরক্ত ও নীলদি সকল প্রকার প্রদর রোগে	১০৮
পরিণত বয়সে বিবাহ না হওয়া	১০৯
অবাধ মেলামেশা	১১০
পর্দা প্রথা	১১৩
পুরাণে আছে	১১৩
বেদে আছে	১১৩
নারী আজ কোন্ পথে	১১৫
দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ও প্রতিকার	১১৮
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্দার গুরুত্ব	১২২
ব্যভিচার	১২৪
ব্যভিচারের প্রকারভেদ	১২৮
সমমৈথুন	১২৯
নারীতে-নারীতে মৈথুন	১৩৩
কোরআন	১৩৩
বাইবেল	১৩৩
ব্যভিচারের কারণ	১৩৪
উপযুক্ত বয়সে বিবাহ না হওয়া	১৩৪
অবাধ মেলামেশা	১৩৪
অসুখী দাম্পত্য জীবন	১৩৪
যৌন-অক্ষমতা	১৩৫
ধর্মের নামে ব্যভিচার	১৩৫
ব্যবসা	১৩৫
বিরহ	১৩৫
জাত স্বভাব	১৩৬
ব্যভিচারের শাস্তি	১৩৯
ইস্রাইলীদের দেব পূজা ও ব্যভিচার	১৪১
কোরআনের মতে	১৪১
ব্যভিচারের শাস্তি	১৪৪
তালাক	১৪৫
তালাকের বিধি-নিষেধ	১৫০
তালাকপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্ত	১৫৩
কিভাবে তালাক হয়	১৫৫
নারী-স্বাধীনতা	১৫৬
ইসলামে নারীর অধিকার	১৬১
স্বামীর তালাকে অধিকার	১৬১
সম্পত্তির অধিকার	১৬২
ফারায়েজ	১৬৪
শিক্ষার অধিকার	১৬৬
মানসিক অধিকার	১৬৭
ধর্মের অধিকার	১৬৮
বিধবা বিবাহ	১৭৩
মানুষের জন্য ধর্ম	১৭৩

বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)

[দ্বিতীয় খণ্ড]

❑ যৌনবিজ্ঞান অংশ ❑

"এবং তাঁহার অন্যতম নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদিগ হইতেই তোমাদের জন্য সহধর্মিণীসকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহাদিগ হইতে শান্তিলাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।" (৩০ ঃ ১১)

[কোরআন ঃ সূরা রুম, আয়াত ১০-১১]

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঃ পড়ুন ঃ

আমাদের প্রকাশিত লেখকের বিশ্বজাহানে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকখানি বই ঃ

পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে

যে বইটি পৃথিবীর৭০টি দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিবিসি (লন্ডন) হতে লেখকের নাম প্রচারিত হয়েছে। ৫০ হাজার টাকার চ্যালেঞ্জ দিয়ে সপ্তম সংস্করণ বের হয়েছে, বাংলাদেশ আর প্রথম সংস্করণ কলকাতা হতে।

বিজ্ঞান না কোরআন

যে বইটি চিন্তা জগতে বিপ্লব এনেছে। লাইব্রেরী অফ আমেরিকায় স্থান লাভ করেছে। ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দঃ)

সিরিজ (১ হতে ৪র্থ খণ্ড) এতে রয়েছে রসুলুল্লাহর (দঃ) অমিয় বাণীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। ভারত থেকে যে বইটিকে কেন্দ্র করে লেখককে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান অদৃশ্য বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে।

জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ)

বইটিতে কোরআন-হাদিস, বেদ-বাইবেল জিন্দাবেস্তা ও বিশ্বমনীষীদের মন্তব্য নিয়ে রসুলের (দঃ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে।

রহস্যে ভরা বিছমিল্লাহ

আমরা বিছমিল্লাহর গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যের উপর জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টা করি না। মহাত্মারা এর উপর রিসার্চ করেছেন এবং প্রচুর সুফল লাভ করেছেন। তাদের ধ্যান-ধারণার মধ্যে 'বিছমিল্লাহ' জপ সর্বশ্রেষ্ঠ কেননা বিছমিল্লাহ আল্লাহর পবিত্র নাম।

মানবজাতির মুক্তির পথ

যত মানব সন্তান এ বিশ্বে আছে, ছিল এবং আসবে সবারই মুক্তির পথ রয়েছে। পৃথিবী সৃষ্টির পর যত নবী-রসুল বিভিন্ন দেশ ও জাতির উপর প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের মূল চিন্তাধারা অভিন্ন। সৃষ্টিকর্তা-এক। তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। বিভিন্ন জাতির জন্য কোরআন হাদিস-বেদ বাইবেল অনুযায়ী।

সর্বধর্মে বেহেশত দোজখ

পাপ পূণ্যের উপর বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য অসংখ্য নবী ও রসুল প্রেরিত হয়েছিল একই উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে। পাপ পূণ্যের পরীক্ষার উপর নির্ভর করে কেউ পাবে মহাপুরস্কার কেউ পাবে মহা তিরস্কার। প্রতিদান তিনি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন– বণ্টন করবেন পরকালে বেহেশত দোজখে।

সৃষ্টি-বৈচিত্র্য

যেদিকে তাকান যায়, সেদিকেই যেন সৃষ্টির অদ্ভুত বৈচিত্র্যই ফুটে ওঠে। সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, আকাশ-বাতাস, জল-স্থল, বন-মরু, নারী-পুরুষ, জীব-জন্তু সবার মধ্যেই নিহিত এ সৃষ্টির অদ্ভুত রহস্য। নিহিত এ সুসামঞ্জস্য সৃষ্টির মাঝে মহাপাণ্ডিত্য ও বৈচিত্র্য। কোন সৃষ্টিই যেন তুচ্ছ নয়, কোন সমষ্টিই যেন অসুন্দর নয়, কোন সৃষ্টিই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। কোন সৃষ্টির মাঝেই যেন ফাঁক নেই। প্রতিটি সৃষ্টির সঙ্গেই প্রতিটি সৃষ্টির সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রয়েছে। এই সুসামঞ্জস্য জগতের কোলেই রূপ নিয়েছে সুন্দর ও সেরা সৃষ্টি—নর ও নারী। এই বিপরীতধর্মী নারী ও পুরুষ নিয়েই চলছে দুনিয়ার খেলা। চরিত্র বৈশিষ্ট্য, দৈহিক গঠন প্রভৃতির পার্থক্য থেকেও কি করে অভেদ্য প্রাণ নিয়ে নারী ও পুরুষ একত্রিত হচ্ছে ও শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে তা চিন্তার ঊর্ধ্বে এবং বহু ঊর্ধ্বে। তাই আমরা অন্যান্য সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ছেড়ে আজ 'নর-নারীর' এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য নিয়েই কিছু আলোচনা করব।

আল্লাহ পাক বলেছেন,

"এবং নভোমণ্ডল—আমি উহাকে শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। নিশ্চয়ই আমি সম্প্রসারণকারী। এবং ভূমণ্ডল—আমি উহাকে সুবিস্তৃত করিয়াছি। ফলত আমি কেমন উত্তম বিস্তারকারী এবং আমি প্রত্যেক বিষয়ের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি—যেন তোমরা অনুধাবন কর।"[১]

"এক আমি তোমাদিগকে যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়াছি।"[২]

ওপরে বর্ণিত সূরা 'জারিয়াত' ও সূরা 'নবা' হতে দেখতে পাচ্ছি, মানব সৃষ্টির আসল রূপ, মাহাত্ম্য ও আল্লাহর কারিগরি বিদ্যার অপরিসীম কৌশল ও সৃষ্টি-বৈচিত্র্য। মানুষের মধ্যে তিনি প্রভেদ সৃষ্টি করেছেন নারী ও পুরুষে। একই রক্ত মাংসে গঠিত, একই উপাদান হতে সৃষ্ট, একই আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়েও নারী পুরুষ হতে সম্পূর্ণই পৃথক। পুরুষ হয় বল-বীর্যবান, শক্তিশালী; আর নারী হয় কোমল ও লাজুক। পুরুষেরা সাধারণত চঞ্চল, নারীরা অমায়িক, ধীরস্থির। পুরুষ সাহসী, নারীরা ভীরু। পুরুষের উন্নত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ; নারীর স্বাভাবিক দেহ ও স্তনযুগল বক্ষ। পুরুষ চিন্তাশীল ভাবুক, নারী স্বভাবধর্মী ও পরশ্রীকাতর। পুরুষের চিন্তাধারা জাগ্রত ও বিপ্লবী; নারীর চিন্তাধারা সুপ্ত ও সাম্য। পুরুষ আলোড়নকারী, নারী প্রেরণাকারী।

উপর্যুক্ত প্রভেদ ছাড়া আরও বহু প্রভেদ দেখা যায়। কণ্ঠস্বরেও যথেষ্ট পার্থক্য। পুরুষ ও নারীর চিন্তাধারার মধ্যেও আকাশ এবং পাতাল প্রভেদ। পুরুষ সমাজে মিশে স্বাভাবিকভাবে থাকতে ভালবাসে; আর নারীরা চায় স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে সব চাইতে রূপসী, ধনাঢ্য ও বিলাসপ্রিয় করতে। এদের মানসিক চিন্তাধারাও স্থির নয়। প্রাচুর্য ও কামের প্রলোভনে এদের

১। কোরআন ঃ সূরা জারিয়াত, আয়াত ৪৭। (৫১ ঃ ৪৭-৪৯)

২। কোরআন ঃ সূরা নবা, আয়াত ৮। (৭৮ ঃ ৮)

pdf By Syed Mostafa Sakib

জলের মতোই গড়িয়ে নেওয়া যায়। কোমল হৃদয়, স্নেহ-ভালবাসা আর মায়াতেও আবার ভরপুর। লিঙ্গভেদে পুরুষ ও নারীর যে পার্থক্য দেখা যায় তা হতে মহাবৈজ্ঞানিক ও কলা-কৌশলময় বৈচিত্র্যই ফুটে ওঠে। পুরুষ ও নারী তাদের এই লিঙ্গ-পার্থক্য হেতুই একে অপরকে সজোরে আকর্ষণ করে ও একত্র মিলে অভেদ্য প্রাণ নিয়ে নতুন সৃষ্টির রূপদান করে।

এই যে সৃষ্টির অদ্ভুত পার্থক্য—এটা কি রহস্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়? নারীর সৃষ্টি পুরুষের জন্যই। তাদের হৃদয়ে এমনি এক প্রেমের খনি আছে যার সন্ধান পুরুষ একবার পেলে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। এমনি অদ্ভুত এদের প্রেমাকর্ষণ যে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি, বুদ্ধিমান জীব পুরুষ হয়েও মান-অপমান, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার ক্ষমতা এদের থাকে না। ধন-দৌলত, জ্ঞান-গরিমা, আভিজাত্য তুচ্ছ করে ফেরে এই নারীর পিছনে। রাজা যার জন্য সিংহাসন ছেড়েছে, ভিখারী ভিক্ষা ছেড়েছে, মুনীর ধ্যান ভেঙেছে, ফেরেশ্‌তা পর্বত গুহায় ঝুলেছে, ফরহাদ, মজনু দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ছেড়েছে, শাহজাহান প্রেমের মর্মরে মমতাজকে জ্যান্ত রাখতে তাজমহল গেঁথেছে। নারী তার ঐ সুন্দর, সুশ্রী দেহ নিয়ে পুরুষকে মাতিয়ে তোলে উত্তাল সমুদ্রের মতো। পুরুষ তার এই মন-ভুলান কোমল দেহ ভোগ করে পায় অনাবিল আনন্দ, শান্তি ও তৃপ্তি। এই নারীই আবার বিভেদ, বিচ্ছেদ, মনোমালিন্য, রক্তারক্তি ও হানাহানির মূলে। এই নারীর অধ্যায় নিয়ে যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে এটাতে আমরা বিস্মিত হই নি। সীতার জন্য স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়েছে ও রাবণ সবংশে নির্বংশ হয়েছে। হেলেনের জন্য বিখ্যাত ট্রয় নগরীর পতন ঘটেছে। পদ্মিনীকে নিয়ে চিতোর ধ্বংস হয়েছে। জয়নব, মায়মুনা মুসলিম ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। প্রমুথো কিলারকে নিয়ে মন্ত্রিত্ব ছেড়েছে। ফারুককে মিশরের সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছে। এডোয়ার্ড সিমসনের প্রেমে অর্ধ পৃথিবীর রাজত্ব বিসর্জন দিয়েছে, আর সংযুক্তাকে ঘিরেই পৃথ্বিরাজের পতন ঘটেছে। আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য এ নারী সৃষ্টি!

চোখের সম্মুখে সব কিছু দেখেও আল্লাহর সৃষ্টিরহস্যকে বুঝতে পারি নি। কোনদিন ভাবতেও পারি নি যে ভূমি হতে উদ্গত প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই যুগল সৃষ্টি রয়েছে, আর এই যুগল সৃষ্টির মাধ্যমেই মায়ার ও প্রেমের টানে তাদের আবদ্ধ করা হয়েছে। নারী-পুরুষ ও জীবজন্তুর জোড়াকেই শুধু কল্পনা করেছি। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি যে অগণিত সৃষ্টির মাঝেই রয়েছে জোড়া—যারা একে অপরকে ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট করে নতুন প্রাণ ও নতুন সৃষ্টির রসদ জোগাচ্ছে। বিজ্ঞানের চর্চা করতে গিয়েও দেখলাম এই বিপরীত সৃষ্টি-ধর্মী পদার্থ ছাড়া নতুনত্বের রূপ দেওয়া যায় না। জড় পদার্থের মধ্যেও আজ দেখতে পাচ্ছি প্রাণ, আর এই প্রাণের রূপদান করছে Electron ও Proton—যাদের কেন্দ্র করে উঠেছে Atom bomb, Hydrogen bomb, বিদ্যুৎ, স্পুটনিক আর দুনিয়ার যত রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভার। কোথায় ছিল এ শক্তি? কে সৃষ্টি করেছে এ বিপরীতধর্মী Electron ও Proton? দুটো ইলেকট্রন একত্রিত হয় না। দুটো প্রোটনকেও একত্রিত করা যায় না। ইলেকট্রন ও প্রোটন সুযোগ পেলেই বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করেও নারী-পুরুষের মতো একত্রিত হয়। সারা দুনিয়ায় এই নিয়মই চলছে। মানুষ পশু-পক্ষী, জীবজন্তু যারা চলতে পারে ও যাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, তারা যৌন-প্রবৃত্তির তাগিদে মিলিত হচ্ছে ও যৌনসুখ অনুভব করছে। এ বুদ্ধি, এ কৌশল কাউকেই শেখাতে হয় না। প্রকৃতি যেন নিজ হস্তেই এ কৌশল শিক্ষা দেয়। উদ্ভিজ,

তরুলতা যেগুলো চলতে পারে না তাদের মধ্যেও একই নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। তাদের সঙ্গম-কৌশল যেন আরও রহস্যপূর্ণ। বোটানিতে পড়েছি যে, একই গাছে স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় ফুল ফোটে। যখন স্ত্রী ফুলটা Matured হয় তখন পুরুষ ফুলটা ওপর হতে নিচের দিকে আসতে থাকে আর স্ত্রী ফুলটাও নিচ হতে ওপর দিকে উঠতে থাকে এবং একত্রিত হয়। ফলে পুরুষ ফুলটির পরাগরেণু স্ত্রী ফুলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। যদি ভিন্ন ডালে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল থাকে তাহলে মক্ষিকা পুরুষ ফুল হতে পরাগরেণু বহন করে স্ত্রী ফুলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দেয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের, তরুলতার সঙ্গে তরুলতার ও স্বজাতীয় প্রাণীর সঙ্গে স্বজাতীয় প্রাণীর মিলনে শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর, জীবজন্তুর সঙ্গে তরুলতার মিলন হয় না। যদি এরূপ হতো তাহলে শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি হতো ও জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের কোলাহল হয়ে উভয়েই ধরা হতে বিদায় নিত।

দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে কোটি কোটি মানুষ জন্মেছে, মরেছে, জন্মাবে ও মরবে, কিন্তু এই অগণিত মানুষের চেহারা ও কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোন মিল ছিল না, নেই এবং থাকবেও না। প্রতিটি মানুষের চেহারা ও কণ্ঠস্বর যদি একইরূপ হতো তাহলে কি অদ্ভুত কাণ্ডই না ঘটত। স্বামী তার স্ত্রীকে ভুল করত আর স্ত্রী তার স্বামীকে ভুল করত। পিতা তার ছেলেকে চিনত না, ছেলে তার পিতাকে চিনত না। মা তার নিজের সন্তানকে অন্যের সন্তান হতে পার্থক্য করতে পারত না, আর ছেলে তার মাকে খুঁজে বর করতে পারত না। ভাই-বোন এদের মধ্যে নিজের বলে যে একটা মায়ার টান সেটাও থাকত না। শুধু কি তাই? যদি চেহারার মিল না থেকে কণ্ঠস্বরের মিল থাকত তাহলেও একইরূপ কাণ্ড ঘটত। যারা অন্ধ বা বৃদ্ধ বয়স হেতু চোখে কম দেখে তারা কণ্ঠস্বরেই বুঝতে পারে। যদি সবারই একই রূপ গলার স্বর হতো, তাহলে কত ফাঁকিবাজি, গুণ্ডামি ও ভণ্ডামি যে চলত তার ইয়াত্তা ছিল না। দুনিয়া তাহলে হতো ভণ্ডামির কারাগার আর রূপ নিত জ্বলন্ত দোজখের। তাই মহান সৃষ্টি-কৌশলকারী বৈজ্ঞানিক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি ও তাঁরই শুকুর আদায় করি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যৌন-বিজ্ঞান

নর ও নারী

আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি-বৈচিত্র্য লিখতে পারে কার সাধ্য? সৃষ্টির মাহাত্ম্য বুঝতে পারে কার ক্ষমতা? সৃষ্টির লীলা-কৌশল বিশ্লেষণ করে কার শক্তি? তবুও যৌন-বিজ্ঞান লিখতে গিয়ে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ওপর দু-একটি কথা লিখেছি। 'বিজ্ঞান না কোরআন?' পুস্তকেও এ সৃষ্টি বৈচিত্র্য পরিচ্ছেদে আল্লাহর বৈজ্ঞানিক কারিগরির দু-একটা উপমা দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, কত বড় মহান শিল্পী সে স্রষ্টা। এ স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর শিল্প কারুকার্য বোঝাতেই এ ধরায় নেমে এসেছিলেন অমর বৈজ্ঞানিক হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। শিল্পকে হাতে নিয়ে শিল্পীর ধ্যানে ও তাঁরই সন্ধানে কাটিয়েছেন সারাটি জীবন। তাঁর ধ্যান, ধারণা ও প্রমাণের মাধ্যমে যা তিনি দেখেছেন, শুনেছেন ও পেয়েছেন তা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। যৌন-বিজ্ঞানী না হয়ে যৌন-জীবনকে তিনি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তার তুলনা বিরল। এ বৈজ্ঞানিকের সামান্য দু-চারটি বাণী নিয়েই আমরা অগ্রসর হচ্ছি ও যৌন-বিজ্ঞান আলোচনা করছি।

তিনি বলেছেন, "নারী পুরুষেরই অর্ধাঙ্গিনী।"[১]

নর ও নারী এ দুটি মিলেই হয় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন। নারী ভিন্ন নর ও নর ভিন্ন নারী পূর্ণাঙ্গ নয়। নর ও নারীতে মিলেই জোড়া হয়। আর এ জোড়ার মিলনেই হয় নতুন সৃষ্টি। দৈহিক আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে যদিও নারী ও পুরুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবুও মানসিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একের জন্য অপরের এক আকর্ষণ বিদ্যমান। এ আকর্ষণই আনে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা। দুজন পুরুষে জোড়া হয় না। দুজন নারীতেও জোড়া হয় না। পুরুষে-পুরুষে অথবা নারীতে-নারীতে আকর্ষণ জন্মে না। আর এ আকর্ষণ না হবার ফলেই মিলন হয় না। মিলন না হলে নব সৃষ্টি রূপ লাভ করে না।

শুধু পুরুষের সৃষ্টিতে যদি দুনিয়া চলত, বংশ বৃদ্ধি হতো, তাহলে আদমের জন্য আর এক আদমের সৃষ্টিই আল্লাহ্ পাক করতেন। আদমের মনের সঙ্গে মিল রেখে একই উপাদান দিয়ে তাহলে ভিন্ন পদ্ধতির যৌনাঙ্গ দিয়ে হাওয়াকে সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু না, আল্লাহ্ পাক তা করেন নি। আদমের বাম পাশের হাড় থেকেই করলেন হাওয়ার সৃষ্টি। একই উপাদান হতে এ সৃষ্টি হলেও যৌনাঙ্গের পার্থক্য করে উভয়ের মাঝে এক প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করলেন। হাত, পা, চোখ, নাক, কান, মাথা, পেট সব অঙ্গের সঙ্গে আদম ও হাওয়ার মিল থাকলেও কতকগুলো অঙ্গের সঙ্গে হলো সম্পূর্ণ গরমিল। পুরুষ যৌনাঙ্গের ক্ষুধা মেটাতে পারে অপর কোন পুরুষ যৌনাঙ্গ দিয়ে নয়-নারী যৌনাঙ্গ দিয়ে, যা না পেলে পুরুষের তৃপ্তি আসে না। ভালবাসা আসে না, প্রেম-প্রীতির শিকড় গড়ে না। কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত! কি অপরূপ সৃষ্টিকর্তার এ কৌশল!

শুধু পুরুষ যে নারী-যৌনাঙ্গের জন্য উন্মাদ তা নয়। নারীও পুরুষ-যৌনাঙ্গের জন্য হয় পাগল। যে যৌনাঙ্গ ভিন্নতর আকৃতিতে গড়া, সে যৌনাঙ্গের জন্য পাগল—অন্য কোন সুশ্রী ও সবল অঙ্গের জন্য নয়। সে অঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সে অঙ্গ নির্ভরশীল। মানুষের প্রতিটি অঙ্গ যদিও ভিন্নতর আকৃতিতে গড়া, তবুও যেমন একে অপরের ওপর নির্ভরশীল ঠিক তদ্রূপ

১। সগির—সংগৃহীত মোহাম্মদ আজহারউদ্দীন এম. এ. কর্তৃক হাদিসের আলো। (২য় খণ্ড, হাঃ নং ৮২)

পুরুষ ও নারীর আকৃতি ভিন্ন হলেও একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। শুধু নারীর সৃষ্টিতে যেমন এ বিশ্ব চলত না, তেমনি শুধু পুরুষের সৃষ্টিতেও এ বিশ্ব চলত না। আগুন, বাতাস, পানি, মাটি যদিও ভিন্নতর উপাদানে গড়া; ভিন্নতর তাদের চরিত্র তবুও একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। বাতাস, পানি ও উত্তাপের সমাবেশ না ঘটলে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা যেমন থাকে না—অস্তিত্ব না থাকলে হাত, পা, চোখ, কান যেমন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তেমনি নারী এবং পুরুষ না থাকলেও এ ধরা অচল হয়ে যেত। নারীর জন্যই পুরুষ। পুরুষের জন্যই নারী। এরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাউকে ছাড়া কেউ চলতে পারে না। কারো প্রয়োজন কারো চাইতে কম নয়। একে অপরের পরিপূরক।[১]

এই জন্যই হজরত (সঃ) বলেছেন, 'নারী পুরুষেরই অর্ধাঙ্গিনী।'[২]

এবারে দেখি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের সামঞ্জস্য কতটুকু।

যে সব উপাদানে দেহ গঠন হয়, তা নারী ও পুরুষের মধ্যে একইভাবে বিদ্যমান। পুরুষের শরীরে যেমন রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা আছে, নারীর শরীরেও ঠিক তাই আছে। ক্যালসিয়াম, মাগনেসিয়াম, ফস্ফরাস, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর সমন্বয়ে যেমন পুরুষের দেহ গঠিত, ঠিক সেই সব ধাতুর সংমিশ্রণেই নারীর দেহও গঠিত। যৌনাঙ্গসমূহের পার্থক্য ছাড়া অন্য সব অঙ্গের গঠন-প্রণালীও একই রূপ। এতটুকু সামঞ্জস্য আছে বলেই একে অপরকে তুচ্ছ বা ঘৃণা করতে পারে না। আর এ জন্যই চালচলন ও মানসিক চিন্তাধারাতেও সমন্বয় সাধিত হয়। একটি পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে একটি পুরুষ অথবা নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনরূপ সাদৃশ্য নেই। তাই এদের মধ্যে মিলনের বা সামাজিকতার কোন প্রশ্ন আসে না। নারীর খাদ্য যা, পুরুষের খাদ্যও ঠিক তাই। এর মধ্যেও কোন ব্যতিক্রম নেই। পুরুষের মাঝে নারীর সত্ত্বা বিদ্যমান। পুরুষের অণ্ডকোষে নারীর হরমন আছে। পুরুষ যা হারিয়েছে, নারী তা পেয়েছে। পুরুষ তার হারানো উপাদান খুঁজে বেড়ায় নারীর মাঝে। নারীও তার এ উপাদানের উৎস খুঁজে বেড়ায় পুরুষের মাঝে। পুরুষ তার পাঁচ ভাগের একভাগ নারীকে দিয়েছে আর নারীও তার পাঁচ অংশের এক অংশ পুরুষকে বিলিয়েছে। নারী-পুরুষের মিলনের মাঝেই দুজন দুজনে তাদের হারানো অংশ খুঁজে পায়। এ জন্যই এত তৃপ্তি, আনন্দ, ভালবাসা ও আকর্ষণ। এখান থেকে প্রমাণ করা যায় যে, নারী ও পুরুষ পরস্পর সম্পর্কহীন নয়, বিচ্ছিন্ন নয়, ভিন্ন উপাদান বিশিষ্ট নয়। এরা কোন কালেও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। এখনও নেই এবং কোন কালেও থাকবে না। এর প্রমাণ সৃষ্টির শুরুতেই আদমের জন্য হাওয়ার সৃষ্টি। আদমের বৃদ্ধ অবস্থায় অথবা মৃত্যুর পর যদি হাওয়ার সৃষ্টি হতো অথবা শুধু আদম বা শুধু হাওয়ার মাধ্যমে যদি প্রেম আকর্ষণ এবং সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ হতো তাহলে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যেত। কিন্তু তা হয় নি। আজও সেই পূর্ব পদ্ধতিই চলছে এবং ধ্বংসের পূর্ব দিন পর্যন্ত হয়ত এ অবস্থাই চলবে! বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারায়ও তা হলে এর প্রমাণ মিলল যে, নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী।

হজরতের এ বাণী নিছক নয়। কল্পনাপ্রসূত নয়। অযৌক্তিক নয়। বৈজ্ঞানিকদের জন্য ও চিন্তাশীল মনীষীদের জন্য এ বাণী উপহার স্বরূপ। কোরআনও এর সাক্ষী।

"এবং তাহার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদিগ হইতেই তোমাদের জন্য

১। কোরআন ঃ "তাহারা তোমাদের জন্য আবরণ, তোমরাও তাহাদের জন্য আবরণ।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৮৭)

২। হাদিস ঃ সংগৃহীত হাদিসের আলো—আজহারউদ্দিন, এম. এম.।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সহধর্মিণীসকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহাদিগ হইতে শান্তিলাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।"[১] (৩০ ঃ ২১)

বাইবেলে (ইঞ্জিল অংশে মার্ক পরিচ্ছেদ ১০/৭-৯) বলা হয়েছে,

"ঈশ্বর মানুষকে নর ও নারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এজন্য পুরুষ আপন পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিবে ও আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে। তাহারা দুইজন এক দেহ হইবে। সুতরাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একই দেহ। ঈশ্বর যাহাদের যুক্ত করিয়াছেন মানুষ তাহাদের বিচ্ছিন্ন না করুক।"

আল্লাহ্ ও রসুলদের বাণী সর্বত্র একই। সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টি-রহস্যের এমন অপূর্ব বাণী আমাদের মতো সাধারণ চিন্তাবিদদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও নারী-পুরুষের দৈহিক সৃষ্টির পার্থক্য দেখে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করি।

নারী ও পুরুষের দৈহিক পার্থক্য

নারী ও পুরুষের শারীরিক উপাদান ও গঠন প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকলেও দৈহিক পার্থক্য এদের কম নয়। সৃষ্টির এটা এক অপরূপ বৈচিত্র্য। শরীর বিজ্ঞানীরা নারী-পুরুষের দেহ নিয়ে বিশ্লেষণ করে যে পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

(১) মেয়েদের শরীর অম্লধর্মী আর পুরুষের শরীর ক্ষারধর্মী।

(২) মেয়েদের শরীর চুম্বকধর্মী আর পুরুষের শরীর বিদ্যুৎধর্মী।

(৩) মেয়েদের শরীর স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল আর পুরুষের শরীর গতিশীল ও সৃজনশীল।

(৪) মেয়েদের দেহের আকৃতি পুরুষের দেহের আকৃতি হতে অনেক ছোট।

(৫) সাধারণত পুরুষের দৈহিক ওজন ১৪০ পাউন্ড আর নারী দেহের ওজন ১২৮ পাউন্ড।

(৬) পুরুষ দেহের মাংসপেশী শতকরা ৪১.৫ ভাগ আর নারী দেহের মাংসপেশী শতকরা ৩৫ ভাগ।

(৭) পুরুষ দেহের হাড়ের ওজন সাধারণত ৭ সের আর নারীর ৫$\frac{১}{৪}$ সের।

(৮) পুরুষ দেহে শতকরা ১৮ ভাগ চর্বি। নারী দেহে শতকরা ২৮ ভাগ চর্বি। জলীয় অংশও নারী দেহে পুরুষের চাইতে বেশি।

(৯) রক্তের লাল কণিকা মেয়েদের চাইতে পুরুষের অনেক বেশি। পুরুষের এক কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৫০ লক্ষ রক্ত কণিকা থাকে আর মেয়েদের থাকে ৪৫ লক্ষ।

(১০) পুরুষের মগজের ওজন গড়-পড়তা ৪৯$\frac{১}{২}$ আউন্স এবং নারীদের মগজের ওজন ৪৪ আউন্স। পুরুষের মগজের ওজন সর্বনিম্ন ৩৪ আর সর্বোচ্চ ৬৫ আউন্স। নারীদের সর্বনিম্ন ৩১ আউন্স এবং সর্বোচ্চ ৫৪ আউন্স। (প্রতি আউন্স ২$\frac{১}{২}$ তোলার সমান।) পুরুষের মস্তিষ্ক মগজের সহিত লঘু মস্তিষ্কের সম্পর্ক ১ ঃ ৮$\frac{১}{৪}$। পক্ষান্তরে নারীদের মস্তিষ্ক তা ১ ঃ $\frac{১}{৪}$। পুরুষের মগজ তার শারীরিক ওজনের তুলনায় ৪০ ভাগের একভাগ আর নারীর ৪৪ ভাগের একভাগ।

---

১ । কোরআন ঃ সূরা রুম, আয়াত ১০-১১।

(১১) নারীর পঞ্চেন্দ্রিয় পুরুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল। পুরুষের ঘ্রাণশক্তি নারীর চেয়ে অনেক প্রবল। পুরুষ যে পরিমাণ ঘ্রাণ অনুভব করতে সক্ষম, নারী তার অর্ধেকটুকু করতে সক্ষম। পঞ্চেন্দ্রিয়ের এই দুর্বলতা হেতুই নারীর আস্বাদন ক্ষমতা কম। ভাল-মন্দের বিচার করা, স্বর পরীক্ষা করা, পিয়ানোর সুরের সমালোচনা করা, নারীরা সাধারণত পারে না। পুরুষ এ বিষয়ে তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ, পারদর্শিতা প্রমাণ করে।

(১২) নারীর মগজের বক্রতা ও প্যাঁচ পুরুষের চেয়ে অনেক কম। মগজের স্নায়ু মণিতেও বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।

(১৩) মেয়েদের হৃদপিণ্ড পুরুষের হৃদপিণ্ড থেকে ওজনে ৬০ গ্রাম কম।

(১৪) নাড়ীর স্পন্দন পুরুষের চেয়ে নারীর মিনিটে পাঁচটি বেশি।

(১৫) শ্বাস-প্রশ্বাসে পুরুষ ঘণ্টায় ১১ গ্রাম কার্বন জ্বালাতে পারে আর নারী পারে মাত্র ৬ গ্রাম। এখান থেকে বোঝা যায় নারীদেহে অক্সিজেনের ভাগ কম।

(১৬) দৈহিক শক্তিতে নারী পুরুষের চেয়ে অনক দুর্বল। তাদের শারীরিক শক্তি পুরুষের শক্তির $\frac{২}{৩}$ ভাগ।

(১৭) পুরুষের শরীর সম্মুখ দিকে ভারি আর নারীর শরীর পেছন দিকে ভারি। এজন্য নারীর মৃতদেহ পানিতে ভাসে চিৎ হয়ে আর পুরুষের মৃতদেহ ভাসে উপুড় হয়ে। আর এ জন্যই নারীরা হাইহিল জুতো পরে স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারে। ওপরে উল্লিখিত পার্থক্য ছাড়াও আরও এত বেশি পার্থক্য নারী ও পুরুষের মাঝে রয়েছে যা এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য এদের দেহে যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে পরিপূর্ণ অসামঞ্জস্য। সামঞ্জস্যের দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় এক দেহ, এক প্রাণ ও একই উপাদান দিয়ে গড়া। আবার অসামঞ্জস্যের দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে এরা স্বতন্ত্র ভিন্ন দেহের সৃষ্টি। এই অসামঞ্জস্যের দিক বিশ্লেষণ করে তাই উনবিংশ শতাব্দীর এন্সাইক্লোপেডিয়া প্রণেতা 'নারী' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"নারী ও পুরুষের মধ্যে যদিও যৌনাঙ্গসমূহের গঠন ও আকৃতির পার্থক্যটাই সর্বপ্রধান, কিন্তু পার্থক্য কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই নয়। নারীর মাথা হতে পা পর্যন্ত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। এমনকি নারী ও পুরুষের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাহ্যত একান্তই একরূপ মনে হয়, সেগুলিও প্রকৃতপক্ষে সামঞ্জস্যহীন।"[১]

আবার সামঞ্জস্যের দিক বিশ্লেষণ করে ফিজিওলজির অধ্যাপক এবং ইতালি অ্যাকাডেমির সদস্য মে-তুন-জজু তার 'Physiology of Women', 'নারীদের শরীরতত্ত্ব' পুস্তকে লিখেছেন ঃ শরীর বিশ্লেষণ সংক্রান্ত গবেষণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য প্রমাণিত হয় না।"[২]

সৃষ্টির কি অপরূপ লীলা! স্রষ্টার কি অপরূপ কৌশল! সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের মাঝেই গড়ে তুলেছেন এক প্রেম-প্রীতির বন্ধন। আর এ প্রেম-প্রীতি গাঢ় হতে গাঢ়তর শক্তির ওপর অধিক শক্তিশালী। চুম্বক শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, পারমাণবিক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি সবই শক্তির কাছে পরাজিত। অথচ এ আকর্ষণ সমগ্র শক্তিরই এক মিলিত মহাশক্তি।

পুরুষে পুরুষে নয়, নারীতে নারীতে নয়, নর ও নারীর শুভ মিলনেই এ আকর্ষণ রূপলাভ করে, নতুনত্বের সৃষ্টি করে ও বিশ্বের বুকে এক স্পন্দন আনে। পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভে স্থান পায়। নারীর গর্ভও পুরুষের বীর্যে ধন্য হয়। এমন সুন্দর ব্যবস্থা, নতুন সৃষ্টির জন্য এমন

---

১ । সংগৃহীত—হাফেজ আজিজুল ইসলাম "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী" পৃষ্ঠা ৪৯।

২ । সংগৃহীত—হাফেজ আজিজুল ইসলাম "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী" পৃষ্ঠা ৪৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অদ্ভুত পদ্ধতি কোন রসায়নবিজ্ঞানী বা যৌনবিজ্ঞানী তার ল্যাবরেটরিতে দেখাতে নারী ও পুরুষের দৈহিক পার্থক্য পারেন নি। কোনদিন পারবেনও না। এমন যুগল সৃষ্টি মহাবৈজ্ঞানিক আল্লাহ্ ছাড়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কোরআন এর সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ

"এবং যেহেতু তিনিই নর ও নারীকে যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। শুক্রবিন্দু হইতে যখন উহা নিক্ষিপ্ত হয়। এবং যেহেতু তাহার উপরই পরবর্তী সৃষ্টি।"[১] (৫৩ ঃ ৪৫—৪৭)

নারীর বাধ্য পুরুষের ধ্বংস অনিবার্য

চোদ্দশো বছর আগে যে মহাবৈজ্ঞানিকের জন্ম হয়েছিল, সে বৈজ্ঞানিক শুধু অপার্থিব জগতের সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, পার্থিব জগতের যাবতীয় বিষয়ের ওপরও তাঁর দৃষ্টি অতি সূক্ষ্মভাবেই নিবদ্ধ ছিল। যৌনবিজ্ঞানী নাম নিয়ে নারী-পুরুষের দৈহিক, সামাজিক, মানসিক রূপরেখা বিচার করার সুযোগ কোন্ সময় তাঁর হয়েছিল, কি করে এদের চরিত্রকে যাচাই করে অমর বাণী আমাদের জন্য রেখে গেছেন তা চিন্তা করলে সত্যি অবাক হতে হয়। নারী-পুরুষের দৈহিক যে পার্থক্য আমরা দেখলাম, তা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে নারী পুরুষের মতো শক্তিশালী নয়, সূক্ষ্মদর্শী নয়, চিন্তাশীল নয়, বিপ্লবী নয়, আবিষ্কারক নয়, ধৈর্যশীল নয়। জ্ঞান-বুদ্ধি ও সৃজনশীলতায় নারী পুরুষ হতে অনেক গুণ কম ক্ষমতার অধিকারিণী। তাদের মগজের গঠন-প্রণালী সহজ ও সরল। পুরুষের মগজের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম ও জটিল নয়। এইজন্যই নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেওয়া সত্ত্বেও নতুন কিছু আবিষ্কার করে জগৎকে মুগ্ধ করতে পারে নি, নতুন থিওরী দিয়ে সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে নি, সুশাসক হয়ে প্রজার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে নি। দুঃসাহসিক কোন অভিযান করে সমুদ্র গর্ভে, পর্বত শিখরে অথবা মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারে নি। নারী কোন যুগে ধর্ম-যাজক, ধর্মনেতা বা পয়গম্বর হয়েও আসে নি। জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সাহস, বল-ভরসা যার কম সে পুরুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। পুরুষকে সর্বশক্তি দিয়েই আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন। আর নারীকে করেছেন পুরুষের বাধ্য করে তার প্রাণে প্রেমের সুধা ঢেলে দিতে। অবশ্য পুরুষের ওপর নারীদের অধিকার আছে। ন্যায়সঙ্গতভাবে পুরুষের মনে তাদের আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষমতা আছে। ভাগে, ভোগে, বিলাসে এবং সংসার যাত্রায় পুরুষের ন্যায় তাদের সমদাবি আছে। তথাপি নারীর ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। এটাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। কোরআনও এ কথারই সাক্ষ্য দেয়।

"এবং নারীগণের উপর তাহাদের যেরূপ স্বত্ব আছে। নারীগণেওর তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব আছে। এবং তাদের উপর পুরুষগণের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।"[২] (২ঃ ২২৮)

কোরআনের এ বাণীর ঘোর তাৎপর্য আছে। নারীরা যুগে যুগে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও পৈতৃক সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হত। আল্লাহ্ তাদের অধিকার দিলেন। তার বাণীর মাধ্যমে ঘোষণা করে মানুষকে সাবধান করে দিলেন। তবে সর্বকালের জন্য পুরুষের অধিকার দিলেন নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বকে নারীরা কোন দাবির মাধ্যমেই খর্ব করতে পারবে না। যে পুরুষশ্রেণী সৃষ্টির কৌশলেই নারী অপেক্ষা অধিক

১ । কোরআন ঃ সূরা নজম, আয়াত ৪৫—৪৭।

২ । কোরআন ঃ সূরা বাকারাহ, আয়াত ২২৮-এর শেষাংশ।

শক্তিশালী ও সৃজনশীলতার অধিকারী সে পুরুষের পক্ষে নারীর বাধ্য হয়ে থাকার অর্থ নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রতিভাকে জলাঞ্জলি দেওয়া। নারীর মোহ ও মায়াজালে বেষ্টিত হয়ে যে পুরুষ নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলে সে পুরুষ ধিকৃত ও অধঃপতিত না হয়ে পারে না। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। পুরুষ চরিত্র পরিচ্ছেদে এর ওপর কিছুটা আলোচনা করেছি। নারীদেহ বিশ্লেষণ করেও কিছুটা পেয়েছি। নারী-চরিত্র বিশ্লেষণ করে আবার দেখব এ বাণীর সারবত্তা কতটুকু।

এবারে চলুন আমরা যৌবনের ওপর কিছুটা আলোচনা করি ও দেখি মানব জীবনের এ মূল্যবান অংশটুকুর পরিচয় কি? এর সদ্ব্যবহারের উপায় কি?

যৌবন

যৌবন কি? এ কথা বোঝান কঠিন। যৌবনের রূপ, যৌবনের ক্ষুধা, যৌবনের স্বরূপ ব্যক্ত করার জ্ঞান অনেকের থাকলেও আমার নেই। তাই এর ওপর আলোচনা কতটুকু আকর্ষণীয় হবে জানি না। তবুও দু-এক কথা লিখতে বসলাম।

জীব মাত্রেরই জন্ম ও মৃত্যু আছে। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে তারা যে কালের সম্মুখীন হয় সে কালকে সাধারণত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়—শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ। যৌবন জীবনের চরম এবং পরম সময়।

বিশ্বের সৌন্দর্য নিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ যেমন আবির্ভাব হয়, প্রখর তেজ ও আলোর ছটা নিয়ে বৈশাখের সূর্য যেমন ধরার বুকে এক অসহ্য জ্বালা এনে দেয়, শ্রাবণের বারিধারা পৃথিবীর বক্ষে যেমন মহাপ্লাবন নিয়ে আসে, ফাল্গুনের সমীরণ যেমন প্রাণে প্রাণে আনন্দের হিল্লোল বয়ে আনে, তেমনি জীবের প্রাণে যৌবন নিয়ে আসে এক পাগল করা জোয়ার। এ জোয়ারের মাঝে পড়েই জীবকুল আত্মভোলা হয়ে যায়। চঞ্চলতা, চপলতা, অস্থিরতা যেমন নিয়ে আসে এ যৌবন, তেমনি নিয়ে আসে কর্মপ্রেরণা, প্রেম, ভক্তি ও দিগন্তের ভালবাসা। আলোকে যেমন ভরে তোলে তার মন, প্রেমের প্রবল আকর্ষণেও তেমনি নাড়া দেয় তার যৌবন। চোখে আসে অপরূপ দৃষ্টি, চিন্তায় আসে বিপ্লব, শরীরে আসে নতুন জোয়ার, যৌনাঙ্গে আসে এক চরম পুলকিত শিহরণ। এ শিহরণে জীব উন্মাদ হয়ে ওঠে। খুঁজতে থাকে তার দেহমনের খোরাক—এক নতুন সাথী।

পুরুষের যৌবন ঃ সাধারণত এগারো হতে তেরো বছর বয়সের মধ্যে কিশোরের শরীরে এ বিবর্তনমূলক পরিবর্তন ঘটে। শরীর বৃদ্ধি পায়; মাংস পেশীবহুল হয়। ছেলেদের দেহ-অভ্যন্তরে থাইরয়েড অ্যাড্রিলেন এবং পিটুইটারী প্রভৃতি গ্রন্থিসমূহ সবল হয়। অণ্ডকোষ সক্রীয় হয়ে নতুন জীব সৃষ্টিকারী শুক্রকীটের জন্ম দিতে শুরু করে। নির্জীব পৃথিবী বসন্তের ছোঁয়া পেয়ে যেমন শ্যামল ও সজীব হয়ে ওঠে, ফলে-ফুলে দিগদিগন্ত যেমন হেসে ওঠে, নতুন পত্রে শুষ্ক বনবীথি যেমন রূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়, কোকিলের কুহুতানে যেমন আকাশে-বাতাসে আনন্দের ধ্বনি ওঠে তেমনি যৌবনের অপরূপ সাজে নরের দেহে ভেসে ওঠে এক অপূর্ব শক্তি, কমনীয়তা, মধুরতা ও পরিচ্ছন্নতা। ওষ্ঠ ও গণ্ড দিয়ে গজিয়ে ওঠে পৌরুষের ছাপ, শ্যামল আভরণ আর যৌনপ্রদেশেও দেখা যায় চিক্কণ কালো ঘন বন। মুখে ফোটে মধুর হাসি। হাতে থাকে সুরের বাঁশী! চোখে আসে প্রখর দৃষ্টি, মনে অসীম বল, বুকে দুর্বার সাহস আর চালচলনে বীরত্বব্যঞ্জক পদক্ষেপ। কি যেন সে চায়। কি যেন তাকে উন্মাদ করে তোলে এক অজানা সুরের দোলায়। বাষ্প যেমন পাত্রের ঢাকনি ভেদ করে অসীমের দিকে ছুটে যায়, তেমনি যৌবনে মন সব ভেঙে-চুরে একাকার করে এক অচেনা রাজ্যে পথ

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিতে চায়। আর সে অচেনার রাজ্য হয় নারীর মন। পুরুষ চরিত্রে এ নারী কিভাবে স্থান লাভ করে, তার মন মেজাজে কি পরিবর্তন ঘটায়, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে তার দেহ মনের কি ক্রিয়া সাধিত হয় তার সামান্য একটু পরিচয় দিয়েছি এই গ্রন্থের 'পুরুষ চরিত্র' পরিচ্ছেদে। এ প্রবন্ধটি পরে উল্লেখ করব।

নারীর যৌবন ঃ পুরুষের ন্যায় নারীর যৌবনেও আসে এক উন্মত্ততা। নারীদের শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত হয় বিদ্যুৎগতি। নাচিয়ে তোলে তার সুপ্ত মনকে। দেহের অণু-পরমাণুকে জাগিয়ে তোলে দেয় এক নাড়া, যার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এক অজানা পুরুষকে পাবার নেশায়। চোখে-মুখে ফুটে ওঠে এক আকর্ষণীয় রূপ। লজ্জা, জড়তা ও মধুরতাকে করে তোলে সুন্দর। ঠোঁটে তার স্মিত হাসি, নয়নে এক পাগলরূপী ইশারা।

রক্তিম পদ্ম যেমন সরোবরে এক অপূর্ব শ্রী বৃদ্ধি করে, তেমনি পদ্মকলিসম নারীর স্তন তার বক্ষে এক পাগল-করা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে; নারীর গণ্ডদেশ, উরু, বাহু, বিস্তৃত নিতম্ব, ঘন কৃষ্ণ কেশ, মুখের উজ্জ্বল লাবন্য দেহের নিভাঁজ মসৃণতা তাকে অপরূপ রূপে সাজিয়ে তোলে।

কিশোরদের দেহে যেমন এক বিবর্তনমূলক পরিবর্তন দেখা দেয়, তেমনি কিশোরীদের দেহেও এক জোয়ার এসে যৌবনে টেনে নেয়। যৌন-গ্রন্থিগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। যৌনপ্রদেশ ও বগলে রেশমী ঘন কৃষ্ণ লোমরাশি দেখা দেয়। একদিন হঠাৎ ঋতুস্রাব এসে তাকে জানিয়ে দেয়, তুমি কিশোরী নও "যুবতী"—ভবিষ্যৎ জন্মদানের জন্য সদাপ্রস্তুত এক আকর্ষণীয় নারী—পুরুষের ভোগবিলাসের এক অমূল্য বস্তু—মায়া ও আকর্ষণের এক প্রবল চুম্বক। এ চুম্বক সজোরে টানে আর এক বিধর্মী চুম্বককে। সে বিধর্মী চুম্বক পুরুষ—নারীর গোপন মনের একান্ত বাসনা ও কামনার বস্তু। শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে, নিদ্রায়, অনিদ্রায় সে চায় তার পরম সাথী এক সবল সুন্দর যুবককে।

বিবাহ ঃ নারী চায় পুরুষকে আর পুরুষ চায় নারীকে। প্রকৃতিরই এ ধর্ম। এ ধর্ম অবাস্তব নয়। এ ধর্ম দোষের নয়। সৃষ্টজীব মাত্রই এই ধর্মের প্রয়াসী। এ ধর্ম আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি-কৌশলের এক পরম ধর্ম। তাই এই সুন্দর ও কামনার ধর্মকে পালন করার নির্দেশ যুগে যুগেই মনীষীরা দিয়ে গেছেন। দিয়ে গেছেন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। তাঁর নির্দেশিত পথ ও ব্যবস্থা যা অন্যান্য মহামনীষীদের চাইতে সুন্দর ও নিখুঁত। নরনারীর মন বিচার করে সৃষ্টির অপরূপ কৌশল বিশ্লেষণ করে যুবক-যুতীর জন্য তিনি যে ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন তা সমাজ, ধর্ম, জাতি, জীবন ও যৌবনের জন্য এক মহা উপকারী ও পরম সুখকর ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মহামিলনের এক মহাসূত্র। প্রেম-ভালবাসার এক পরম অমৃত সুধা। চলুন দেখি, এ ব্যবস্থা কি? হজরত বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে সে তাহার ধর্মের অর্ধাংশ পূর্ণ করিয়াছে। অতএব সে সভয়ে আল্লাহর জন্য অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করিবে"।[১]

সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতির মাধ্যমে নরনারীকে দেহ মিলনের যে বৈধ সনদ দেওয়া হয় তাকেই বলা হয় 'বিবাহ'। প্রতিটি দেশেই, প্রতিটি সমাজ ও ধর্মের মধ্যেই এ ব্যবস্থা আছে। বিবাহ আল্লাহর বিধান। "নরনারীকে তিনিই যুগল রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।"[২] এ

১। মিশকাত। সংগৃহীত, হাদিসের আলো আজহারউদ্দিন এম. এ., ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬ ও ১৭।

২। "এবং যেহেতু তিনিই নর-নারীকে যুগল রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন শুক্রবিন্দু হইতে যখন উহা নিক্ষিপ্ত হয়।" (কোরআন ঃ সূরা নজম, আয়াত ৪৫—৪৬)

অপূর্ব সৃষ্টি একে অপরের পরিপূরক। তাই নারী ও নরের মিলন ভিন্ন সৃষ্টির রূপ বিকাশ হয় না, সম্পূর্ণ হয় না, সুন্দর হয় না।[১]

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ঃ জীবনধারণের জন্য যেমন আলো, বাতাস পানি ও খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি যৌবনের ক্ষুধা মেটাতেও বিবাহ প্রয়োজন। বিবাহেই দৈহিক মিলন, পরস্পরকে জানা-শোনা ও চেনার এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। অবৈধ উপায়ে দেহমিলন ঘটে সত্য, কিন্তু মনের তৃপ্তি, আত্মার প্রশান্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলা আসে না। তাই দ্বন্দ্ব-কলহ, বিবাহ-বিসম্বাদে সমাজ হয় কলুষিত, রাষ্ট্র হয় ধ্বংস আর ধর্ম হয় অধর্ম। বিবাহের মাধ্যমেই নর ও নারীর মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এজন্যই বিবাহ প্রয়োজন।

বিবাহের উপকারিতা ঃ যৌন-সুখ অনুভব করাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। যৌবনের ঢেউ যখন শরীরে দোলা দেয় তখন স্বভাবতই নরনারী উন্মাদ হয়ে ওঠে। তাই স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে নরনারী তার যৌন-তৃষ্ণা মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়ে স্বার্থপর ও উন্মাদ হয়ে অশান্তি, অরাজকতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সুচিন্তার অবকাশ থাকে না। বিবাহ নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তায় যৌন-ক্ষুধা মেটানোর পক্ষে যেমন সহায়ক তেমনি কুচিন্তা, কুকার্য, অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচারের হাত থেকে রক্ষা করে ধর্মীয় জীবন পালন করার পক্ষেও সহায়ক।

কেননা, এতে থাকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট এক সাথী-যাকে যখন ইচ্ছা কাছে পাওয়া যায়। সময় অসময়ের প্রশ্ন থাকে না। স্থান, কাল, সম্মতি, অসম্মতি, লজ্জা, ভয়, স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক প্রশ্ন এসে বিভ্রান্ত ও বিব্রত হতে হয় না। স্বামী-স্ত্রীর ইচ্ছার ওপরই পরম তৃপ্তিতে যৌনসুখ উপভোগ করা যায়। এ অপূর্ব সুখ দুজনের জীবনে আনে শৃঙ্খলা, ভালবাসা, প্রেম ও ভক্তি। আত্মীয়তা হয় গাঢ়, সমাজ হয় সুন্দর। সুখে-দুঃখে একে অপরের হয় অংশীদার। সংসারে নেমে আসে এক পরম শান্তি। এই শান্তিই হলো ধর্ম।

এই যৌন-শান্তির মাঝেই নরনারী লাভ করে আর এক অচিন্ত্যনীয় ভবিষ্যৎ। সে ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে নিজ বীর্যের সৃষ্ট সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে। নিজের ঘরে বাতি জ্বলুক, নিজের বংশ বিস্তার লাভ করুক, মৃত্যুর পরে তার নিশানা অটুট থাকুক, নিজ উপার্জনের ধন-সম্পত্তি নিজ পুত্রকন্যা ভোগ করুক এই কামনা সবাই করে। এই বাসনা ও কামনা ফলবতী হয় একমাত্র বিবাহেরই মাধ্যমে। অবৈধ মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মে তা হয় জারজ সন্তান। এ জারজ সন্তানের পিতা থাকলেও পরিচয় থাকে না। মাতা থাকলেও মমতা থাকে না। তাই সমাজের এরা কলঙ্ক। এরা সমাজে গ্রহণের অনুপযোগী। এ হতভাগা জারজ সন্তানেরা ভাগ্যহীন বিড়ম্বনা ভোগ করে। আপন বলে এদের কেউ থাকে না। সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কেউ এদের বরণ করে কোলে তুলে নেয় না। সমাজকে এ অভিশাপ থেকে মুক্ত করতেই হজরত তাই কঠোর ভাষায় বললেন—

"বিবাহ করা আমার সুন্নত। যে তা পালন করে না সে আমার কেউ না।"[১]

বিশ্ব-মানুষের কল্যাণের জন্যই হয়েছিল হজরতের জন্ম। অনাচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতেই এসেছিলেন এ বৈজ্ঞানিক নবী। শুধু তপস্যা নিয়ে তিনি বসে থাকেন নি, পরকালের সুসংবাদ দান করতেই তিনি সময় কাটান নি, রাষ্ট্র পরিচালনা করতেই জীবন অতিবাহিত করেন নি সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল সমাজ জীবন যাপন করার

১। সহীহ বুখারী। হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড—কৃত আঃ রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ২৮১

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য বিবাহ করেছেন এবং যা কিছু প্রয়োজন তার ব্যবস্থা দিয়ে দেশ ও জাতিকে তিনি ধন্য করেছেন।

পূর্বের মহাপুরুষদের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। রতিক্রিয়া বা যৌন-ক্রিয়াকে ক্ষতিকর বলেও আখ্যায়িত করেছেন। শুক্রপাতে শারীরিক বল, মেধা ও স্মৃতিশক্তি কমে যায় বলে বিবাহিত নর-নারীদেরও সহবাস অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

হজরত তা করেন নি। তাঁদের এ মতবাদ ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণ করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর অগাধ প্রেম ও ভালবাসার এক উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন। সহবাস ক্ষতিকর নয়। স্বাস্থ্যের জন্য অতীব প্রয়োজন। নিয়মিত সহবাসে বল, বীর্য, মেধা স্মৃতিশক্তি দেহের কান্তি, ও লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। হজরতের নিম্নোক্ত বাণী তার সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন—

"পরিমিত ভাবে আবশ্যক মতো সঙ্গম করলে শরীরে পুষ্টি সাধন হয়। প্যাঁচড়া হয় না। রক্ত দূষিত হয় না। ভরা যৌবনে তিনদিন অন্তর অন্তর সঙ্গম না করলে শরীরের ক্ষতি হয়।"[২]

বিবাহ না করে চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করা, ব্রহ্মচর্যের পথ ধরে আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়া, নারীর স্পর্শ লাভ না করে দেশ ও সমাজের হিত সাধন করার যুক্তিকে হজরত কোন সময়ই মেনে নিতে পারেন নি। তাই এ সব অযৌক্তিক, অকল্যাণকর ব্যবস্থা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজে তা পালন করে যুক্তিগুলোর অসারতা প্রমাণ করেছেন। উপরন্তু আল্লাহর নিকট হতে 'আহম্মদ' ও 'মুহাম্মদ' অর্থাৎ প্রশংসাকারী ও প্রশংসিত ব্যক্তি বলে খেতাব নিয়েছেন।

সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষগণ ব্রহ্মচর্য পালন করে আল্লাহর প্রিয় হয়েছেন তাঁরা কি 'আহম্মদ' খেতাব পেয়েছেন? বিপ্লবী নবী বলে কেউ কি তাঁর মতো সাধনা ও সমাজ সেবা করতে পেরেছেন? যুগ-যুগান্তরের অমর বৈজ্ঞানিক বলে কেউ কি কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করে তাঁর মতো খ্যাতি লাভ করেছেন? করেন নি"। করতেও পারবেন না।

শান্তির ধর্ম ইসলাম। অশান্তি, অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণের জন্য ইসলাম নয়। যৌন-তৃষ্ণা মেটান প্রকৃতিরই এক বিধান। এ বিধানকে লঙ্ঘন করার অর্থ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা, আল্লাহর নির্দেশিত পথের অবমাননা করা। এ বিধান থেকে কোন সৃষ্ট জীবই রেহাই পায় না। তাই জড়, চেতন প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণেই পরস্পর আকর্ষিত হয়। বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী যখন যৌবনে উপনীত হয়, তখন কারো আদেশ বা উপদেশের অপেক্ষা না করে যৌন-তৃষ্ণা নিবারণ করে। গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার, সিংহ, সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদি যে ধরনের হিংস্র বা শান্ত প্রাণীই হাক না কেন যৌবনের চরম ক্ষুধা মেটাতে সহবাস করবেই। এ সহবাসের সুযোগ না পেলে শান্ত অশান্ত হয়ে ওঠে। উগ্র আরও উগ্র হয়ে হিংস্র রূপ ধারণ করে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সবারই জানা আছে। এই প্রমাণেই বিশ্বাসী আমাদের রসুল (দঃ)।

প্রকৃতির বরখেলাপ তিনি করেন নি। ভরা যৌবনকে চাপা দিয়ে আত্মা ও মনকে তিনি

১। হিন্দু মনীষীদের অনেকের মতে—'মাসে এক, বছরে বার, এর চাইতে যত কমাতে পার" —গার্হস্থ্য কোষ Published by Basac & Sons Calcutta মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট। পরিচ্ছেদ—ইন্দ্রিয় পরিচালন অধ্যায়।

২। সংগৃহীত, মকসুদোল মোমেদীন। মোঃ গোলাম রহমান।

কষ্ট দিতে বলেন নি। পরিবার-পরিজন ও সংসার ধর্ম ছেড়ে মানব ধর্ম পালন করা যে সম্ভব নয় এ কথা তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন ও তার প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহারিক জীবন ও নিম্নোক্ত বাণী এ কথার সাক্ষ্য দেয়।

আনাস-বিন মালিক হতে বর্ণিত আছে, "তিন ব্যক্তি নবী করিম (দঃ) এর ইবাদত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার পত্নীদের বাড়ি আসিল। যখন তাহাদের উহা জানান হইল তাহারা যেন উহা কম মনে করিল। তাহরা বলিল, কোথায় আমরা আর কোথায় নবী করিম (দঃ)। তাঁহাকে তো খোদা মাফ করিয়াছেন পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ। তাহাদের একজন বলিল, আমি সমস্ত রাত্রি নামাজ পড়িব। একজন বলিল, আমি সর্বদা রোজা রাখিব এবং কখনও ভাঙিব না। অপরজন বলিল, আমি স্ত্রীজাতি হইতে দূরে থাকিব, কখনও বিবাহ করিব না।"

অতঃপর রসুলল্লাহ (দঃ) তাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরাই কি ঐ সব লোক যাহারা এরূপ কথা বলিয়াছ? শুন, কসম খোদার আমি তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি খোদাকে এবং বেশি বাঁচিয়া থাকি তাহার অসন্তুষ্টি হইতে। কিন্তু আমি রোজাও রাখি, বে-রোজাও থাকি। নামাজও পড়ি, নিদ্রাও যাই এবং বিবাহ করিয়া সহবাস করি। শুভ, যে ত্যাগ করে আমার প্রথা নয়, সে নয় আমার দলের।"[১]

সবাই যদি চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করত, সবাই যদি নারীস্পর্শ হতে বিরত থাকত, সবাই যদি নামাজ ও রোজা পালন করতে ঘর-সংসার ছেড়ে মসজিদে পড়ে থাকত তাহলে এ ধরা অনেক আগেই নিঃস্পন্দ হয়ে যেত। আল্লাহকে বোঝবার ও মানবার মতো কোন মানুষ এ ধরায় থাকত না। মানুষই যদি না থাকত তবে কাদের জন্য ধর্ম প্রচার করতে যুগে যুগে নবীর আবির্ভাব হতো। পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ ও তরুলতার জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই, কেননা তারা প্রকৃতি হতেই ধর্ম শিখে আসে। এ ধর্মের অবমাননা তারা করে না। করতে জানেও না। আল্লাহর বিধান সঠিক ভাবেই তারা মেনে চলে। আল্লাহর গুণগান তাঁরা স্বজ্ঞানে করে ধন্য হয়।[২]

যত আপদ সৃষ্টির সেরা এ মানব জাতিকে নিয়ে। এরা বাবাকে মানে না, মায়ের প্রাধান্যকে স্বীকার করে না। ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে চলে না। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকেও মানে না। তাই এদের সতর্ক করে দিতেই যুগে যুগে নবী-পয়গম্বর ও মহাপুরুষদের আবির্ভাব।

প্রবল যৌন-ক্ষুধার তাড়নে নর-নারী যখন উন্মাদ হয়ে ওঠে তখন ধর্ম, কর্ম, সংসার লেখাপড়া সমাজ সেবার স্বপ্ন গ্যাসের মতো আকাশে বিলীন হয়ে যায়। অথচ এ যৌন-মিলনের পরেই আবার বিক্ষিপ্ত মন এককেন্দ্রিক হয়ে শান্ত অতি শান্ত রূপে গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হয়। এ জন্যেই অশান্ত অবিবাহিত নারী, পুরুষের এবাদত অপেক্ষা শান্ত, বিবাহিত নারী-পুরুষের এবাদতকেই আল্লাহ্ পছন্দ করেন। হজরতের বাণী এ কথারও সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন,

'অবিবাহিত পুরুষের ৭০ রাকাত নামাজ অপেক্ষা বিবাহিত পুরুষের ২ রাকাত নামজই উত্তম।'[১]

১। সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। পৃষ্ঠা ২৮১। হাঃ নং ৬৪১। বিবাহ পরিচ্ছেদ।

২। "আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জয়গান করে। (কোরআন)

১। হাদিস—মিশকাত, মুসলিম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'বিবাহিত পুরুষের নিদ্রা অবিবাহিত পুরুষের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[২]

সন্ন্যাস প্রথা অবলম্বন করে বা দিবারাত্রি নামাজ রোজায় মশগুল হয়ে সংসার ত্যাগী হবার মনোভাবকে তিনি পছন্দ করেন নি। এ জন্যই দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, 'লাইছার রাহবানিয়াতো ফিল ইসলাম।'[৩] অর্থাৎ ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নেই। এ বাণী দ্বারা বোঝা যায় যে বিবাহ ধর্মের সুদৃঢ় অঙ্গ আর সংসারিক জীবন সমাজের শৃঙ্খলিত ভিত্তি। এ ভিত্তিকে অবলম্বন করতে তাই তিনি উক্ত নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাজকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে দরকার পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, শান্তি, শৃঙ্খলা, প্রেম-প্রীতি ও সংহতি। আর এগুলো একযোগে আনতে পারে বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমেই এর একমাত্র সমাধান হয়। নারীকে নিয়ে যুগে যুগে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা যে চরম পর্যায়ে এসেছিল তার একমাত্র কারণ ছিল যে নারী কোনদিনই পুরুষের সহধর্মিণী রূপে আখ্যায়িত ছিল না। যে যখন ইচ্ছা ভোগ করার লালসায় অপরের জীবন নাশ করত। বিবাহ সর্বশেষে এ অরাজকতার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করেছে। তাই শুধু মুসলমানই নয়, যে কোন দেশ বা জাতির জন্যই বিবাহ-বন্ধন এক পবিত্র বন্ধন রূপে চিরস্থায়ী হওয়া উচিত। এটা শুধু আমার কথাই নয়। আল্লাহরও নির্দেশ।

"এবং তোমাদের অন্তর্গত অবিবাহিতদিগের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের অন্তর্গত সৎকর্মশীল দাস ও দাসীদিগেরও।"[১]

হজরত নিজেও বলেছেন ঃ

"অন্য সমস্ত বিষয় অপেক্ষা বিবাহ বন্ধন দ্বারা বন্ধুত্ব অধিকতর দৃঢ় হয়।"[২]

বিবাহ নারীকে রক্ষা করেছে। তার পবিত্রতাকে পালন করার সুযোগ দিয়েছে। পুরুষের যদৃচ্ছা ভোগ-বিলাসের উপকরণ থেকে বাঁচিয়েছে। নারীর আজীবনের দাসত্ব প্রথার অবৈধ ব্যবস্থার প্রতি কুঠারাঘাত করেছে এবং পুরুষের সহধর্মিণীরূপে গৃহীত হয়ে একই সঙ্গে সংসার জীবন পালন করার অপূর্ব সুযোগ নারী পেয়েছে। তার সন্তান-সন্ততি মায়া ও ভালবাসার জালে বেষ্টিত হয়ে আপন সত্ত্বাকে অনুভব করা শিখেছে। তাই সমাজ হয়েছে সুন্দর, প্রেম হয়েছে গাঢ়। ভালবাসা হয়েছে অটুট। ধর্ম হয়েছে সার্থক। এ জন্যই হজরত বলেছেন ঃ

'আত্ তাজাওদাজো নেছফোদ্দিন' অর্থাৎ বিবাহ ধর্মের অর্ধাংশ।[৩] যারা বিবাহ করেনি তারা ধর্মকে সঠিকভাবে পালন করে নি। নিজেকে চিনতে পারে নি। সন্তান-সন্ততির মায়া কেমন প্রবল তা ভাবতে পারেনি। প্রেম-সোহাগ ও ছেলেমেয়ের প্রাণের আকর্ষণ কেমন তা বুঝতে পারে নি। এদিক থেকে জীবন তাদের অভিশপ্ত। ছেলে-মেয়েদের হাসিভরা মুখ দেখা, তাদের আবেগভরা চাহনি অবলোকন করা মানুষ করে তাদের সংসার, দেশ ও জাতির জন্য প্রতিষ্ঠা করা কম গৌরবের কথা নয়। যারা সন্তানের বাবা-মা, তাদের কাছে সবাই সন্তান। এক সন্তানের চোখের পানি দেখে যেমন অন্য সন্তানের মা কেঁদে ফেলে, একজনের সুখ দেখে যেমন তার মুখে হাসি ফুটে উঠে, তেমনি করে কোন কুমারী নারী বা

২। সংগৃহীত হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড। বিবাহ-পরিচ্ছেদ।
৩। হাদিস—মিশকাত, মুসলিম সংগৃহীত হাদিসের আলো। ২য় খণ্ড বিবাহ-পরিচ্ছেদ।
১। কোরআন ঃ সূরা নহর, আয়াত ৩২।
২। মিশকাত—বিবাহ পরিচ্ছেদ। সংগৃহীত হাদিসের আলো কৃত আজহার উদ্দিন এম. এ.।
৩। মিশকাত—সংগৃহীত হাদিসের আলো। কৃত আজহারউদ্দিন এম. এ.। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬।

কুমার পুরুষের চোখে পানি আসে না, মুখেও হাসি ফোটে না। বিবাহিত নারী-পুরুষের জন্যই যেন হাসি-কান্না। ধন-দৌলতের আকাঙ্খা যেন তাদেরই জন্য। তাই দিন-রাত পরিশ্রম করেও তারা ক্লান্ত হয় না। নিজের সুখ বিসর্জন দিয়েই ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে কষ্ট অনুভব করে না। আল্লাহর তরফ থেকেই যেন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আনন্দ ও সুখ নেমে আসে। এদের জন্যই যেন সৃষ্টিকর্তার অফুরন্ত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ। রসুল (দঃ) সত্যই বলেছেন ঃ

'বিবাহ একটি আশীর্বাদ এবং সন্তানের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে স্নেহ কর। কারণ তাহাদিগকে স্নেহ করা ইবাদত।'[৪]

বিবাহের শর্ত

বিবাহ একটি আশীর্বাদ। নর-নারীর যৌন-জীবন, সংসার-জীবন ও বাস্তব জীবনের এক শৃঙ্খলিত ব্যবস্থা। আইনগত, ধর্মগত ও সমাজ পদ্ধতির এক সুদৃঢ় বন্ধন। এ বন্ধন এক দিনের নয়, দু দিনের নয়, সারা জীবনের। তাই এ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পূর্বে বহু বিষয়ের বিবেচনা করতে হয়। বিবাহ জীবনের যেমন উত্থান আনে তেমনি ধ্বংসও আনে। যেমন আনন্দ নিয়ে আসে তেমনি নিরানন্দের মহা অভিশাপেও নিক্ষেপ করে। যৌন-ক্ষুধার যেমন নিবৃত্তি করে তেমনি যৌন-বিকৃতি ঘটিয়ে উন্মাদ করে দেয়। ঘনিষ্ঠ হতে ঘনিষ্ঠতর করে যেমন পরম আত্মীয়তা আনে তেমনি দূর হতে বহুদূর নিক্ষেপ করে এক চরম শত্রুতারও সৃষ্টি করে। তাই বিবাহের পূর্বে নর-নারীর আচার, ব্যবহার, চরিত্র, বংশ, শিক্ষা, কৃষ্টি, সভ্যতা প্রভৃতি বহু বিষয়ের ওপর বিবেচনা করে দুটি জীবনের মিল খায় কিনা দেখা কর্তব্য। এ গুরুদায়িত্ব গুরুজনদের মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অপরিণত নর-নারীর স্কন্ধে এত বড় দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তবে হাঁ, এ কথা সত্য যে যারা মিলন সূত্রে আবদ্ধ হয় তাদের পছন্দ ও মতামতেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাদের মতামতকে উপেক্ষা করাও এক গোঁড়ামি।

আধুনিক জগতে দুটি ভিন্ন মত বিরাজ করছে। পাশ্চাত্য জগৎ মনে করে যে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে যে প্রেম ও প্রণয় গড়ে ওঠে তার ওপর ভিত্তি করেই তাদের বিবাহ হওয়া উচিত।

এ বিবাহে গুরুজনদের মতামতের কোন প্রয়োজন নেই। যে যাকে ভালবাসে, যে যাকে পছন্দ করে, যার সঙ্গে যার মিল খায়, যার প্রেমে যে পাগল সেই তাকে বিবাহ করবে। সুখী হলে সংসার করবে, সুখী না হলে ত্যাগ করবে। এতে বাবা-মা গুরুজনদের মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনই হয় না।

প্রাচ্যের মতামত পাশ্চাত্য হতে পৃথক। প্রণয়নের মাধ্যমে বিয়ে করবে, একে অপরের মাপকাঠিতে বিচার করবে, ইচ্ছা হলেই ত্যাগ করবে—এমন ধারণাকে তারা সমাজবিরোধী ও পাপ বলে মনে করে। তাদের মতে, ছেলেমেয়েদের ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখেই গুরুজনদের এ ব্যবস্থা করা উচিত। দুটো প্রথাই বিশ্ব মানব সমাজে চলছে। কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ বিচার করা খুব সোজা কথা নয়। তবে

৪। মিশকাত—সংগৃহীত হাদিসের আলো। কৃত আজহারউদ্দিন এম. এ.।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের বিবাহ ব্যবস্থার যে ফলাফল দেখা যায়, তার ওপর বিচার করে বলা চলে কোন্‌টি সমাজের জন্য গ্রহণীয়।

যাকে আজীবনের জন্য সাথী করে নেওয়া হচ্ছে—যার জীবনের সঙ্গে সুখ-দুঃখ জড়িত, যার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের কাঠামো রচিত হয়, তাকে না দেখে, তার চরিত্র না জেনে বিবাহ করা শুভ নয় একথা সত্য। একজন যুবকের মন কি চায়, কিসে সে তুষ্ট, কোন্ ধরনের নারী তার প্রাণ আকৃষ্ট করতে পারে একথা একজন বৃদ্ধের বোঝা সম্ভব নয়। তেমনি অল্প বয়স্কা একটি মেয়ের স্বপ্ন সাধ, রুচির বিকাশ-ভঙ্গি, মানসিক চিন্তাধারা একজন প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধের বোঝবার কথা নয়। এজন্যই একটি বালকের যা ভাল লাগে, যুবক তা পছন্দ করে না। যুবক যা ভালবাসে বৃদ্ধ তা মোটেই ভালবাসে না। বালকের মনকেই বালক চায়। যুবকের মন যুবক চায়। বৃদ্ধের সাথী বৃদ্ধ হয়। কথাগুলো চিরন্তন সত্য। এতে কোন ভুল নেই। কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে একজন বালক বা একজন যুবকের চিন্তাধারা শুভ এবং সঠিক কিনা সেটাও দেখার প্রয়োজন আছে।

বালক-বালিকা বা যুবক-যুবতীর যখন ভালবাসা গড়ে ওঠে অবাধ মেলামেশার ফলে, তারা আত্মবিস্মিত হয়ে যায় তখন গুণবিচারের অবকাশ থাকে না। কচি মন চায় মিলতে, মিশতে ও সঙ্গম ক্রিয়ায় রত হতে। কিছুদিন মেলামেশার ফলে এরা উন্মাদ হয়ে পড়ে। ক্ষুধা যেমন পান্তা ভাতের বিচার করে না, ঘুম যেমন শ্মশান ঘাট মানে না, অভাব যেমন পাপপূণ্যের দাঁড়িপাল্লা দেখে না, প্রেমও তেমনি জাত-বিজাত বোঝে না। তাই দেখা যায় রাজার ছেলে মেথরের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে, মন্ত্রীর ছেলে জেলের কন্যার জন্য ভাত-পানি ছাড়ে, আর মওলানার ছেলে নাস্তিক খ্রীষ্টানের কন্যাকে গলার হার করে। এসব ঘটনাও অবাস্তব নয়। এদের হাতে কি সমাজকে তুলে দেওয়া যায়? এমন সব প্রেমিকের ইচ্ছাই কি চূড়ান্ত? এরাই কি সংসারের শান্তি? এদের মাধ্যমে কি বাবা-মার ইচ্ছা পূর্ণ হয়? যারা ঐ মতের সমর্থক তারা হয়ত বলবেন, হাঁ, সব কিছুই হয়। তা না হলে ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশার মাঝে প্রণয় গড়ে তুলে কি তারা সুখী না? বড় জটিল প্রশ্ন ও জটিল উত্তর।

এ প্রসঙ্গ এখন আলোচনা করছি না। ইন্‌শাআল্লাহ্ পরবর্তী পরিচ্ছেদ অবাধ মেলামেশার ফলাফল কি, পর্দা-প্রথার প্রয়োজন কি এ নিয়ে আলোচনা করব। এখন বিবাহের শর্ত ও বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিয়েই অগ্রসর হচ্ছি। হজরত বলেছেন,

"নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি জিনিসের জন্য,

(১) তাহার ধনের জন্য, (২) তাহার বংশের জন্য, (৩) তাহার সৌন্দর্যের জন্য, (৪) তাহার ধর্মের জন্য। তোমার উচিত ধার্মিকাকে লাভ করা। দুলিময় হউক তোমার উভয় হাত।"[১]

প্রথমত, ধন ঃ আমরা সাধারণত বিবাহের পূর্বে যে সব বিষয়গুলোর ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করি সেসব বিষয়গুলো হজরত উল্লেখ করেছেন। আমাদের চিন্তাধারা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। বিবাহের পূর্বে সবাই এটাই প্রথম বিচার করে মেয়ের অর্থাৎ তার বাবার আর্থিক অবস্থা কেমন। যদি আর্থিক অবস্থা ভাল থাকে তবে ছেলে যে নিঃসন্দেহেই দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে লাঘব পাবে, স্ত্রীর বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে উন্নততর জীবন অতিবাহিত করতে পারবে, শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে মনের সুখে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে গর্বের সঙ্গে খাওয়া-

১। সহীহ বুখারী শরীফ—কৃত আবদুর রহমান খাঁ। বিবাহ পরিচ্ছেদ।

দাওয়া করবে তার সাহায্য নিয়ে গাড়ি-বাড়ি ও লেখা-পড়া করবে এ চিন্তা সবাই না করলেও শতকরা ৯৯ জন মানুষই করে থাকে। চিন্তাটি যে একেবারে অমূলক, তা নয়। হাজার হাজার প্রতিভাবান গরিব ছেলে স্ত্রীর বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে লেখাপড়া করে। জজ, ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, প্রফেসর ও ডাক্তাররূপে বের হয়ে আসে। স্ত্রীর বিষয়-সম্পত্তিই তাকে উত্তরকালে মনীষীরূপে গড়ে তোলে। অথচ এ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে লাখ লাখ ছেলে পথের ধুলিতে আশ্রয় নিচ্ছে। সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে না। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনা সাপেক্ষ। হজরতের জীবনী আলোচনা করলেও দেখা যায় যে, তিনি স্বয়ং একধনাঢ্যা চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া রমণী খাদিজার পাণি গ্রহণ করেন। বয়স, সৌন্দর্য এসব গুণ বিচার না করে শুধু ধনের গুণেই তাঁকে বিবাহ করেন। ধনাঢ্যা এ রমণীই ছিল রসুল (দঃ)-এর প্রাণের-সাথী। ক্ষুধার জ্বালায় যদি প্রথম বয়সেই পথে পথে ঘুরতে হতো, দারিদ্র্যের করাল গ্রাস যদি যৌবনের উত্তাল-তরঙ্গে ভীতির সঞ্চার করতো, তবে পরিণত বয়সে এমন নির্ভীক মহাপুরুষ ও নবী সম্রাটরূপে আখ্যায়িত হতে পারতেন কি না আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। আর জানেন বলেই তাঁকে এমন মহা নিপীড়ন ও কষ্টের হাত থেকে রেহাই করেছিলেন খাদিজাকে বিধবা করে, তাঁকে ধনাঢ্যা করে ও তাঁর সম্পত্তির অধিকারী রসুলুল্লা (দঃ)-কে করে। এ জন্যই হজরত বিবাহের শর্ত হিসাবে নারীর ধনকে অবজ্ঞা করেন নি।

দ্বিতীয়ত, বংশ মর্যাদা ঃ বংশের খ্যাতি ও মর্যাদার প্রভাব পরবর্তী বংশধরদের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। যে বংশে চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী, অত্যাচারী, দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোরের জন্ম হয়, সে বংশে সচ্চরিত্রবান ছেলের আশা করা কঠিন। এ জন্যই দেখা যায় চোরের ছেলে চোর হয়, ডাকাতের ছেলে ডাকাত হয়, ব্যভিচারীর ছেলে ব্যভিচারী হয়, ঘুষখোরের ছেলে ঘুষকে হালাল মনে করে। অন্যদিকে, আবার দেখা যায় জজের ছেলে জজ, ব্যারিস্টারের ছেলে ব্যারিস্টার মওলানার ছেলে মওলানা ও শিক্ষকের ছেলে শিক্ষক হয়। কচি মনে পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের কাজ-কর্ম ও চরিত্র যথেষ্ট দাগ কাটে। সাধুর ছেলে চোরকে ঘৃণা করবেই, শিক্ষিত ব্যক্তির ছেলে অশিক্ষিত মূঢ়কে অবজ্ঞা করবেই, ধার্মিকের ছেলে নাস্তিক ও ব্যভিচারীকে দেখে গালি দেবেই। শান্ত, ভদ্র, অমায়িক, ধার্মিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিন্তাধারা, রক্তপ্রবাহের গতি—উগ্র, অসৎ, অশিক্ষিত ও বদ মেজাজী বক্তিদের হতে স্বতন্ত্র। এজন্য হজরত বংশ মর্যাদাকে উৎকৃষ্ট গুণের অন্তর্ভুক্ত বলেই জানতেন। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নিম্নোক্ত বাণী হতে।

ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করিম (দঃ) বলেছেন, "এই মর্যাদা কোরাইশদের মধ্যেই থাকিবে যতদিন বাকি থাকে তাহাদের দুই ব্যক্তি।"[১]

জুবাইর ইবনে মুতাইম বলেন, আমি ও ওসমান ইবনে আফফান গেলাম রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকটে। ওসমান বলেন, "হে রসুলুল্লাহ! আপনি বনি মুত্তালিবকে দিয়াছেন কিন্তু বাদ দিয়াছেন আমাদের, যদিও আমরা ও তাহারা আপনার কাছে একই পর্যায়ের।" ইহাতে নবী (সঃ) বলিলেন, শুধু বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিব এক জিনিস।"[২]

ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) মিম্বরের ওপর হতে বলেছেন,

১। সহীহ বুখারী শরীফ-তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। হাদিস নং ২৮২, কোরাইশদের মর্যাদা পরিচ্ছেদ।

২। সহীহ বুখারী শরীফ—কৃত আবদুর রহমান খাঁ। বিবাহ পরিচ্ছেদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"খোদা মাফ করুন গিফার গোত্রকে এবং নিরাপদে রাখুন আসলাম গোত্রকে আর উমাইয়া গোত্র তো অবাধ্যতা করিয়াছে খোদার ও তাঁহার রসুলের।"

হজরত বলেছেন—"আনসার সম্প্রদায়ের রমণীদের চক্ষুর মধ্যে একটি জিনিস আছে—যাহা দর্শন করিবামাত্র সে স্ত্রীলোকটির উপর অন্তরে ঘৃণা জন্মে। অতএব তোমাদের মধ্যে কেহ আনসার গোত্রের রমণীকে বিবাহ করিবার পূর্বে তাহাকে দেখিয়া লওয়া উচিত।"

(কিমিয়ায়ে সা'আদাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০)

হজরত আব্বাছ হতে বর্ণিত আছে যে তিনি নবী করিম (দঃ)-এর নিকট এসেছিলেন। তখন তিনি যেন কিছু শুনে মিম্বরের ওপর উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'আমি কে' তারা বলল, 'আপনি আল্লাহর রসুল'। তিনি বললেন, আমি আবদুল মোত্তালিবের পৌত্র, আবদুল্লার পুত্র মুহাম্মদ। আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়া আমাকে তাহাদের মধ্যে উত্তম করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়াছেন এবং একদলের ভেতর তিনি আমাকে সর্বাপেক্ষা উত্তম করিয়াছেন। তারপর তিনি অনেক গোত্র করিয়াছেন এবং আমাকে গোত্রের মধ্যে উত্তম করিয়াছেন। তারপর তিনি তাহাদের মধ্যে বংশ করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে উত্তম। **তন্মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে আমি উত্তম এবং বংশ হিসাবেও আমি উত্তম।**"[৩]

রসুল (দঃ) বলেছেন, "তোমরা কি আশ্চর্য হও না কি প্রকারে খোদা সরাইয়াছেন কুরাইশদের গালিমন্দ ও অভিসম্পাত আমা হইতে? তারা গালি দেয় মন্দ লোককে এবং অভিসম্পাত দেয় মন্দ লোককে আর আমি তো প্রশংসিত।"[৪]

বংশ বিচারের অর্থ এ নয় যে এক অভিজাত বংশের কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গে অন্য কোন বংশের ছেলেমেয়েদের বিবাহ চলবে না। ছেলেমেয়েদের স্বভাব ও প্রকৃতিগত চালচলন বিচার করতে গেলেই প্রয়োজন পড়ে তার বংশানুক্রমিক ব্যাধি—যেমন হাঁপানী, ক্ষয়রোগ, বহুমূত্র, কিডনির দোষ, সিফিলিস, গনোরিয়া, জননেন্দ্রিয় ব্যাধি বা মস্তিষ্কের অর্থাৎ উন্মাদনার ব্যাধি আছে কিনা। এখন যদি কেউ মনে করে যে, সমাজতন্ত্রের যুগে এ সব বিচার করা চলবে না যে কোন যুবক-যুবতীর ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ সম্পাদন হওয়া উচিত তাহলে অবশ্য আমাদের বলার কিছু থাকে না। তবে এ ধরনের সমাজতন্ত্রের নাম করে শত শত সমাজকর্মীর জীবনে সর্বনাশ ঘটে। চিকিৎসাবিদরা এ ধরনের সমাজতন্ত্রের পক্ষে কোনদিনই ওকালতি করেন না। কেননা তাদের মতে, স্বামীর গনোরিয়া বা সিফিলিস রোগ থাকলে তা তার স্ত্রীকে সংক্রমিত করতে বাধ্য। ফলে স্ত্রীর জরায়ু আক্রান্ত ও তার গর্ভজাত সন্তান অন্ধ আতুর বা ক্ষতময় হয়ে বিকলাঙ্গ হতে বাধ্য। পাগলের সংমিশ্রণে যে ছেলের জন্ম হয় সে ছেলে নম্র বা ভদ্র হবে এ চিন্তা কোন সুস্থমস্তিষ্কেই আসবে না। তাই বংশ বিচার বিবাহের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, সৌন্দর্য ঃ বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'প্রথম দর্শনদারী পরে গুণবিচারী'। রূপের মোহে ভুলে না রূপকে ভালবাসে না, রূপের মর্যাদা দেয় না, এরূপ মানুষ কমই আছে। শুধু মানুষ কেন অন্যান্য সৃষ্টিও এই রূপের মোহেই আকৃষ্ট। কুরূপা, কুৎসিত ও কদর্য বস্তু মাত্রই খেলায় হেলায় পরিণত হয়। রূপ আল্লাহরই এক আশীর্বাদ। প্রজাপতির রূপে,

---

৩। তিরমিজি। সংগৃহীত মিশকাত শরীফ—তর্জমা মওলানা ফজজুল করিম। ৪র্থ খণ্ড; পৃষ্ঠা ১৪৫০

৪। সহীহ বুখারী—তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ৫/২৯৭

ময়ূরের রূপে, বুলবুলীর রূপে, টিয়াপাখির রূপে কি সবাই মুগ্ধ হয় না? এদের দেখে কি চোখ জুড়ায় না?

চাঁদের রূপে, আলোর রূপে, প্রবাল মুক্তা ও স্বর্ণের রূপে কি জীবজন্তু আকৃষ্ট হয় না। জড়-পাথরে নির্মিত তাজমহলের রূপে কি জীন-পরী ও নর-নারী মুগ্ধ হয় না? জবা, বেল, চামেলী, সূর্যমুখী, কসমস ও গোলাপের রূপে কি ভ্রমর মত্ত হয় না? জীব-জন্তু ও জড় পদার্থের যদি মূল্য থাকে নর-নারীর রূপের মূল্য যে আরও বেশি থাকবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। এ রূপেই পাগল করে মন, এ রূপেই তুচ্ছ করে ধন। এ রূপের মোহে পড়েই সাধুর ধ্যান ভাঙ্গে; ধনী পথের কাঙাল হয়, নৃপতি রাজ্যহারা হয়।

বংশগৌরব ও বিষয়-সম্পত্তি দেখে অনেকে রূপের বিচার করে না। ছেলে অথবা মেয়েকে কুরূপা পাত্রী বা কুৎসিত পাত্রের হাতে তুলে দেয় যার ফল হয় বিষময়। দাম্পত্য জীবনে আনে অশান্তি। সংসার হয় ধ্বংস। ভবিষ্যৎ জীবন হয় অন্ধকারময়। ধনের লোভে পড়ে, সহানুভূতির আশা করে অথবা গুরুজনদের নির্দেশকে পালন করে এরূপ বিবাহ প্রায়ই হয়ে থাকে। স্ত্রীকে দেখে স্বামীর চোখ জুড়ায় না বলে সুন্দরী মেয়ের পেছনে সে চুপি চুপি ঘোরে আর নিজের স্ত্রীকে চোখের বালি মনে করে। স্বামীর চেহারা ও স্বাস্থ্য ভাল না হলে স্ত্রীর মনের অবস্থাও একই রূপ হয়। এ অশান্তি এমন এক পর্যায়ে এসে পড়ে যে তারা একে অপরকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পারিবারিক জীবনের শান্তি, মনের শান্তি ও সমাজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য বিবাহের শর্ত হিসাবে সৌন্দর্যের বিচার অপরিহার্য। এ জন্যই হজরত এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন, "আমার উম্মতদিগের মধ্যে সেই রমণীই উৎকৃষ্ট যাহাদের চেহারা সুন্দর ও মোহর অল্প।"

রূপের সংজ্ঞা কি? সৌন্দর্য কাকে বলে এ নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। যে রূপে চোখ ও মন ভুলে সেটাই সৌন্দর্য। দেশাচার ভেদে ও প্রকৃতি ভেদে সৌন্দর্যের তারতম্য ঘটে। যেমন আফ্রিকার মানুষ যে সৌন্দর্য পছন্দ করে ইউরোপীয়রা তা মোটেই পছন্দ করে না। আবার ইউরোপীয়রা যাকে সুন্দর বলে আফ্রিকানরা তাকে নেহায়েৎ অসুন্দর বলে আখ্যায়িত করে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেও সৌন্দর্য বিচারে কোন মিল নেই। দেশভেদ, আচার ভেদ, কৃষ্টি-সভ্যতা ভেদ, শিক্ষাভেদ ও গঠনভেদের তারতম্য অনুযায়ীই সৌন্দর্যের মাপকাঠি তৈরি করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ

প্রাচ্যের নারীদের সৌন্দর্য বিচার করা হয় তাদের কয়েকটি জিনিসের ওপর। যেমন—(১) উজ্জ্বল বর্ণ, (২) ঘনকৃষ্ণ কেশ, (৩) মধ্যম আকৃতি, (৪) সুন্দর স্বাস্থ্য, (৫) হরিণী চোখ, (৬) ছোট পা ইত্যাদি।

প্রতীচ্যের মেয়েদের বেলায় ঃ (১) সোনালী ও কোকড়ান কেশ, (২) উজ্জ্বল বর্ণ, (৩) সুন্দর স্বাস্থ্য, (৪) ছোট চোখ, (৫) অফুরন্ত হাসি ইত্যাদি।

আমরা যেখানে যুগল ভ্রূ, উচ্চ নাসিকা পছন্দ করি, চীনারা যেখানে চ্যাপটা নাসিকা, খর্বাকৃতি দেহ পছন্দ করে। আমরা যেখানে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দাঁত পছন্দ করি, চীনারা সেখানে স্বচ্ছ দাঁতকে কদর্য বলে মনে করে। আমরা যেমন নারীর মধ্যম আকৃতির পা পছন্দ করি, চীনারা তেমনি ক্ষুদ্রাকৃতি পা পছন্দ করে। এ জন্যই তারা ছোট বেলা থেকেই মেয়েদের লোহার জুতা পরায়। ইউরোপীয় ও এশীয় লোকেরা যেমন গৌরবর্ণ পছন্দ করে, আফ্রিকানরা তেমনি কাল বর্ণ পছন্দ করে। সুতরাং কোন্‌টি সুন্দর কোন্‌টি অসুন্দর এটা বিচার করা কঠিন। এ জন্যই আমি লিখেছি—'যে রূপে মন ও আঁখি ভুলে সেটাই সৌন্দর্য।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মতে সৌন্দর্যের যে মাপকাঠি দেখান হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ—

"সুন্দরী, সুকেশী—তনু, লোমরাজী কান্তা,
সুভ্রুরু, সুশীলা, সতী, সুগতি, সুদন্তা।
মধ্যক্ষীণা ভাসা-আঁখি, পদ্মিনী, কামিনী,
শক্তিহীনা হইলেও সে শ্রেষ্ঠা রমণী।"

অসুন্দর কুলক্ষণা নারীদের তারা নিম্নভাবে করেছেন—

"টেরা-চক্ষু কিংবা হয় চঞ্চল লোচনী
দুঃশীলা অথবা হয় পিঙ্গল বরণী।
হাস্যকালে গণ্ডস্থলে কূপ হয় যার,
বন্ধ্যা সে রমণী হয় জগৎ মাঝার।"

বিভিন্ন মনীষীর দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের মাপকাঠি বিভিন্ন। এসব আলোচনা করলে বইয়ের কলেবরই বৃদ্ধি হয় না, পাঠকদেরও অধৈর্য আসে। তাই এর ওপর আর আলোচনা করছি না।

চতুর্থত ধর্ম ঃ বিশ্বের নবী, মানুষের নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ নিয়ে সমাজে মিশেছেন। সমাজের সঙ্গে তিনি ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সমাজের বিভিন্ন দিক ছিল তাঁর নখদর্পণে। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের মিলনতীর্থ মক্কায় হয়েছিল তাঁর জন্ম। বিভিন্ন কৃষ্টি-সভ্যতার মাঝেই গড়ে উঠেছিল তাঁর বিশাল মন। এ মন সংকীর্ণ হয় নি। এ মন তাঁর কলুষিত হয় নি। এ মন লোভ, মোহ ও ঐশ্বর্য দ্বারা কোনদিন ভরে ওঠে নি। যা খাঁটি, যা সুন্দর, যা মানুষের প্রয়োজন তাই তিনি দিয়ে গেছেন। এজন্যই তাঁর বিধান গ্রহণযোগ্য বলে প্রতিটি ধর্মের প্রতিটি মানুষের কাছেই অমর ও অক্ষয় হয়ে বিরাজ করবে।

বিবাহের শর্ত হিসাবে যে চারটি বিষয়ের তিনি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ধর্মের স্থান দিয়েছেন সবার ওপরে। ধার্মিকা নারী গুণ বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠা বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। কেন সুন্দরী বিত্তশালিনী ও আভিজাত্যের ওপর ধার্মিকা নারীর মর্যাদা অধিক একথা আমরা একবার বিচার করে দেখি।

আমাদের ধারণা ধার্মিকা নারীর অর্থ সতী, পর্দানশীল ও নামাজী। কিন্তু ব্যাপক অর্থে এ সব গুণ ছাড়াও আরও বহু গুণের অধিকারী বা অধিকারিণীকেই ধার্মিক বা ধার্মিকা বলা হয়।

ধর্ম আমাদের কি শিক্ষা দেয়? ধর্ম শিক্ষা দেয় ঃ—(১) তৌহিদবাদ বা আল্লাহর একত্ববাদ, (২) মানবতা, (৩) শিক্ষা, (৪) কৃষ্টি ও সভ্যতা, (৫) দয়া ও মায়া, (৬) প্রেম ও ভালবাসা (৭) ভক্তি ও বিশ্বাস, (৮) উপাসনা, (৯) সৌন্দর্য, (১০) সহিষ্ণুতা, (১১) সত্যবাদিতা, (১২) নির্ভরতা, (১৩) পবিত্রতা ইত্যাদি অর্থাৎ পরিপূর্ণ মানবজীনের জন্য যা প্রয়োজন, সমাজ ও দেশের জন্য যা দরকার, ইহলোক ও পরলোকের জন্য যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাই শিক্ষা দেয়। শিক্ষা দেয় হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ, আত্মঅহঙ্কার, কপটতা, চঞ্চলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, পাশবিকতা ও নাস্তিকতার হাত হতে নিজেকে রক্ষা করতে। সুন্দর সরল জীবন যাপন করতে।

আমরা বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী হিসাবে উপর্যুক্ত গুণ বিচার করি না। আমরা সাধারণত দেখে থাকি মেয়ে আধুনিক সভ্য সমাজে মিশতে পারবে কি না। গান-বাজনা করে

শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারবে কি না। Ready made কথা বলে সুনাম অর্জন করতে পারবে কি না। স্বামীর সংসার করতে, হাট-বাজার করতে পারবে কি না। বন্ধু-বান্ধবদের খুশি করতে গোলটেবিলে বসবার উপযুক্ত কি না, আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত কি না; চাহনী, চলার ভঙ্গি, বেশভূষার ভঙ্গি, কথা বলার কায়দা জানে কি না; মাঠে-ময়দানে ক্লাবে, রেস্তোরাঁয়, সিনেমায়, বায়স্কোপে, বক্তৃতামঞ্চে যাবার উপযুক্ত কি না ইত্যাদি ইত্যাদি।

যৌনবিজ্ঞানী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এসব গুণ বিচার করেন নি। করেছেন চারটি গুণের বিচার যার মধ্যে ধার্মিকতা সর্বশ্রেষ্ঠ।

যে নারীর অন্তরে থাকে তৌহিদবাদ সে নারী ভীত-সন্ত্রস্ত একটি নামে—সে নাম আল্লাহ্। সে ভয় করে সমাজকে, ভয় করে কদর্যকে, ভয় করে ব্যভিচারকে, ভয় করে ধর্মবিরোধী কর্মকে। তাই তারা থাকে সজাগ। শিক্ষায় পারদর্শিতা, কর্মে মনোযোগিতা, দয়ায় শ্রেষ্ঠতা, দানে অগ্রতা, ভালবাসায় অকৃত্রিমতা এ সব হয় তার স্বভাব। স্বামীকে জানে প্রাণ, তার ভাই-বোনকে করে নেয় আপন। স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুঃখী। কারো কাছে হাত পাততে এরা পায় লজ্জা। স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ও নির্ভরতা হয় সম্বল।

ধার্মিকা নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। যে নারী পবিত্রতাকে ভালবাসে সে নারী কোনদিন স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের রূপে মুগ্ধ হয় না। পবিত্রতাকে রক্ষা করতে সে পর্দার আড়ালে থাকে। পর-পুরুষের মুখ দেখতে শঙ্কিত হয়। যে নারী স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সংস্পর্শ পছন্দ করে না, সে নারী স্বামী ভিন্ন অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে না। এ জন্যই এদের প্রেম হয় গাঢ়। ভালবাসা হয় মধুর আর স্নেহ ও মায়ায় হৃদয় হয় ভরপুর।

ধার্মিকা নারী সত্যভাষিণী। মিথ্যা যেমন পাপের মা, সত্যও তেমনি পুণ্যের মা। স্বামীর কাছে যে কিছু গোপন করে না, সত্য কথা বলা যার অভ্যাস, সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে স্বামীর সংসার হতে কিছু গোপন করতেও পারে না। আধুনিক মেয়েরা যেমন স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে স্বামীর সংসার লুঠ-পাট করে নেয়, বাপ-মা ও ভাই-বোনকে সাহায্য করতে গোপনে স্বামীর সংসার হতে মালপত্র পাচার করে ধার্মিকা মেয়েরা অর্থাৎ সত্যবাদিনীরা তা হতে পারে না। এজন্য সোনার সংসার গড়ে ওঠে। শেখ সাদী (রহঃ) সত্যই বলেছেন,

"ধার্মিকা নারীর পতি হইবে যে জন
ইহ পরকালে শান্তি পাইবে সে জন
স্বামীভক্তি সতী নারী দরিদ্র পতিরে
পৃথিবীর রাজা তুল্য আনন্দিত করে।"

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য ধার্মিকা নারীর আর একটি বিশেষ গুণ। সে জানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে স্বামী তাকে পছন্দ করবে না, সংসার সুখের হবে না। এছাড়া অপবিত্রতা, অপরিচ্ছন্নতা ও কদর্যকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না এ কথা সে জানে। সে জানে রসুল (দঃ)-এর বিধান। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হজরত কেমন ভালবাসতেন, এর জন্য কেমন সুন্দর নির্দেশ দিয়েছেন এ সব ধার্মিকা নারীর জ্ঞাত থাকে। কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র, বাড়ি-ঘর এবং শরীরকে অপবিত্র রেখে নামাজ হয় না, মনে প্রফুল্লতা আসে না, আত্মার শান্তি হয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

না, এ কথা ধার্মিকা নারী ভালভাবেই জানে। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ওপর দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা নির্ভর করে। রোগজীবাণুর হাত হতে রক্ষা পায়। তাই শরীরের কমনীয়তা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষা ধর্মের অঙ্গ। নর-নারীর ওপর ইসলামের বিধান অনুযায়ী শিক্ষাকে ফরজ অর্থাৎ বাধ্য করা হয়েছে, রসুল (দঃ)-এর বাণী তার প্রমাণ দেয়। তিনি বলেছেন—

"জ্ঞান অন্বেষণ প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ।"[১]

"জ্ঞানীর নিদ্রা অশিক্ষিত ব্যক্তির ইবাদতের চেয়ে উত্তম কারণ জ্ঞান ব্যতীত এবাদত বিক্ষিপ্ত ধুলিরাশির মতো এবং সংযম ব্যতীত জ্ঞান ঝড়ের দিনে বাত্যাহত ভস্মের মতো।"[২]

"একজন শিক্ষিত ব্যক্তি শয়তানের নিকট সহস্র মুর্খ উপাসক অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।"[৩]

ধর্ম, কর্ম, সংসার, ইহকাল, পরকালের জন্য শিক্ষাই একমাত্র বাহন। এ বাহনই নর-নারীকে উন্নত হতে উন্নততর জীবন এনে দিতে পারে।

যার শিক্ষা নেই, তার ধর্ম নেই। যার ধর্ম নেই, তার জ্ঞান নেই। যার জ্ঞান নেই, তার শৃঙ্খলা নেই। যার শৃঙ্খলা নেই, তার সৌন্দর্য নেই। যার সৌন্দর্য নেই, সেই কুৎসিত, লাঞ্ছিত, অনাদৃত ও অপমানিত।

ধার্মিক পুরুষ বা ধার্মিকা নারী শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়। তাই তারা সমাজের সর্বস্তরে আদরণীয় ও বরণীয়।

প্রতিটি বিষয়ের ওপর পৃথক পৃথকভাবে এরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা করলে দেখা যায় কেন হযরত ধার্মিকা নারীকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন।

যে নারীর মনে হিংসা থাকে না, বিদ্বেষ থাকে না, ব্যভিচারের নেশা থাকে না, লোভের স্পৃহা জাগে না, বিলাসের মোহে ভোলে না সেই নারী কি সর্বোৎকৃষ্ট নয়? যৌনবিজ্ঞানী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সূক্ষ্ম বিচার কি সর্বোত্তম নয়?

বিভিন্ন ধর্মে বিবাহ প্রথা

এ বিশাল পৃথিবীর বক্ষে কত মানুষই না বাস করে। এসব মানুষের রং, চেহারা যেমন এক নয়, কৃষ্টি, সভ্যতা, আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া ও সামাজিক পদ্ধতিও তেমনি এক নয়। দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। এ পার্থক্য সামাজিক রীতি-নীতি ও বিবাহ বন্ধনের মধ্যেও অতি নিগূঢ় ভাবে দেখা যায়। এসব পদ্ধতিগুলো সাধারনত সবারই একটু জানতে ইচ্ছা হয়। কেননা এক এক দেশের ও এক এক জাতির এই বিবাহ প্রথা যেমন আনন্দদায়ক তেমনি চমকপ্রদ। তাই এর ওপর কিছুটা আলোচনা করা যাক।

১, ২ ও ৩। তিরমিজি ও ইবনে মাজা। সংগৃহীত হাদিসের আলো আজাহারউদ্দিন এম. এ.। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২, ৪০ ও ৩১।

ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানী প্রথা

প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের মধ্যে কয়েক প্রকার বিবাহ প্রথা দেখা যেত। যেমন–

(১) স্বয়ম্বর প্রথা ঃ এ প্রথায় দেখা যায় যে কন্যাকে যথেষ্ট মর্যাদা ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। পাণি-প্রার্থী বরদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। কন্যা তার পছন্দমতো বরকে বেছে নিত। এতে আপত্তি করবার কোন সুযোগ বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনদের ছিল না। ইতিহাস থেকেও এ দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পাই। রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা পৃথ্বিরাজের গলে বরমাল্য অর্পণ করে বিবাহ করেন।

(২) গান্ধর্ব প্রথা ঃ এ প্রথায় বর এবং কনে দুজনেরই স্বাধীনতা থাকত। ইচ্ছামতো একে অপরকে পছন্দ করত এবং তাদের মালা বদল করে বিবাহ হতো। অর্জুন তার ভগ্নী সুভদ্রাকে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে এভাবে বিবাহ করেছিলেন।

(৩) পৈশাচ বিবাহ ঃ এ প্রথার নাম শুনলে যে কোন জাতির লোকেরই হাসি পায়। মেয়েকে তার নিদ্রিত অবস্থায় বা মদ্যপানে অজ্ঞান করে সঙ্গম করে সতীত্ব নষ্ট করা হতো। এরপর ঐ মেয়েকে তার বাবা-মা সঙ্গমকারীর সঙ্গে বিবাহ দিতে বাধ্য হতো। এমন প্রথা পূর্বকালেই নয়, এখনও বহুস্থানে এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। ধর্মের কথা, সমাজের কথা, নিন্দা, অপমানের কথা এরা চিন্তা করে না।

(৪) রাক্ষস বিবাহ ঃ রাক্ষস যেমন তার ইচ্ছামতো জীবজন্তু ও মানুষ ধরে খায়, তেমনি পুরাকালে এক শ্রেণীর মানুষ মেয়ের বাবা, মা ও আত্মীয় স্বজনকে বিনাশ করে অথবা যুদ্ধে জয়লাভ করে মেয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করত এবং নিজেদের লালসা মেটাত। জোরপূর্বক এ বিবাহের প্রথাকেই রাক্ষস বিবাহ বলে।

যুদ্ধে জয়লাভ করে অথবা শক্তির বলে এখনও এমন কুকীর্তি ঘটে থাকে। বর্বর পাক সেনারা বাংলাদেশের নারীদের ওপর ১৯৭১ সনে এরূপ নৃসংশ ও বর্বরতার ইতিহাস দেখিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যেরা জার্মান ও জাপানি মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করে এমন রাক্ষস প্রথার নজির স্থাপন করেছে। উন্নত ও অনুন্নত দেশ বলে নয়, সভ্য ও অসভ্য জাতি বলেও নয়, ধন ও শক্তি এ প্রথার মূল কারণ।

(৫) আসুর বিবাহ ঃ এ প্রথা অন্যান্য প্রথার চাইতে অনেক উন্নত। এতে পৈশাচিকতা বা জুলমের কোন আশ্রয় নেই। আছে শুধু টাকার বিনিময়ে পছন্দমতো মেয়েকে ক্রয় করা ও তাকে বিবাহ করে ভোগ করা। যদি কোন পুরুষের টাকা দিয়ে মেয়েকে কিনবার সামর্থ্য না থাকত তাহলে মেয়ের বাবার নিকট সে চাকরি গ্রহণ করত এবং কিছুদিন চাকরি করার পর ঐ টাকার বিনিময়ে মেয়েকে বিবাহ করত। বাইবেলের বর্ণনা হতে জানা যায়, হজরত মুসাকেও এরূপ ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। এ প্রথাকে কন্যাপণ প্রথাও বলা হয়। এতে কন্যার একটা আদর ও মূল্য থাকত। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও অন্যান্য জাতির মধ্যে এ প্রথা আজও আছে। ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে নারীর রূপ ও গুণের তারতম্য অনুযায়ী বিশ হতে চল্লিশ পাউন্ড স্থির করা হতো। কাফ্রিদের মধ্যে একটি মেয়ের পণ ধার্য করা হতো দল হতে তিরিশটি গাভী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৬) বিনিময় বিবাহ ঃ আসুর বিবাহে যেমন অর্থের বিনিময়ে মেয়েকে ক্রয় করা হতো, বিনিময় বিবাহে মা, বোন বা কন্যার বিনিময়ে স্ত্রী গ্রহণ করা হতো। অস্ট্রেলিয়াতে এ প্রথার প্রচলন ছিল।

(৭) পরীক্ষামূলক প্রথা ঃ এ প্রথার ইতিহাস অনেকেই হয়তো জানেন না। আমি নিজেও জানতাম না। জেনেও বিশ্বাস করতে মন চায় না। তবুও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমাজের বিবাহ প্রথা পড়তে গিয়েই এ অদ্ভুত প্রথার কথা জানলাম। এ প্রথার কথা পড়ে হাসি পেল। তাই এ প্রথাকে পরীক্ষামূলক প্রথার নাম করে লিখতে বসলাম।

ব্যালিয়ারিক দ্বীপের অধিবাসিগণ যখন কোন ছেলের সঙ্গে কোন মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করে তখন মেয়েকে দেখাশুনার পর বরপক্ষের বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়েরা কন্যার সঙ্গে সহবাস করতে থাকে। সহবাসে যদি তারা খুশি হয় তবে সর্বশেষে বরকে সহবাস করতে সম্মতি দেওয়া হয়। বর মেয়ের সহবাস ভঙ্গিতে যদি খুশি হয় তবে মেয়েকে বিবাহ করে।

মেনেগাম্বিয়াতে আবার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা কিছুটা মার্জিত। ব্যালিয়ারিক দ্বীপের অধিবাসীদের মতো এমন নিষ্ঠুর নয়। দলের যে সর্দার থাকে, সে-ই কেবল মেয়েকে ভোগ করবার অধিকারী। তার পছন্দের ওপরই নির্ভর করে ছেলেমেয়েদের বিবাহ। দলপতি যদি সহবাসে তৃপ্তিলাভ করে তবে বেশ জাঁকজমক ও ঘটা করে বিবাহ হয়।

(৮) প্রেম নিবেদন প্রথা ঃ সভ্য ও অসভ্য দুটি সমাজের মধ্যেই এ প্রথা আছে। ছেলে এবং মেয়ে একত্রে মেলামেশা করে যে প্রেম গড়ে ওঠে সে প্রেমের পরিণতিতেই হয় বিবাহ। এটা প্রথা হিসাবে সব দেশে চালু না থাকলেও বাংলাদেশ ও ভারতের কিছু অধিবাসী, যাদেরকে আমরা অসভ্য সাঁওতাল বলি তাদের মাঝেই এ প্রেম প্রথা বিদ্যমান। ছেলে যখন বিবাহের উপযুক্ত হয় তখন ওদের মধ্য হতেই কোন মেয়েকে পছন্দ করে বৌদিদি, ঠাকুর মা, ভগ্নিপতি এদের মারফত প্রেম-উপহার মেয়ের নিকট পাঠায়। অথবা কোন গান বা নাচের আসরে ছেলে যে মেয়েকে পছন্দ করে তার হাতে একটা ফল বা ফুল দিয়ে প্রেম অভিনয় করে। এরপর প্রেমালাপে পরস্পর আকৃষ্ট হওয়া দেখলে গ্রামের মাতব্বরকে এ কথা বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষের নিকট জানিয়ে থাকে। মাতব্বর মেয়ের সম্মতি পেলে ছেলেকে মেয়ের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিতে আদেশ করে। অনেক সময় আবার ছেলে মেয়ে প্রেমে পড়ে বাড়ি হতে দূরে পালিয়ে যায়। তখন এদের বাবা, মা বা আত্মীয়েরা খুঁজে বের করে ছেলেটিকে ভীষণভাবে প্রহার করে। এরপর ক্ষমা করে সর্দার বিবাহের অনুমতি দেয়। প্রেমের বন্ধনকে ছিঁড়ে দেয় না। অসভ্য হলেও সাঁওতালরা রাক্ষস বিবাহ বা পরীক্ষামূলক বিবাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথা অবলম্বন করে না।

বিবাহের প্রথা লিখে শেষ করা যাবে না। এক এক দেশে এক এক প্রথা বিদ্যমান। চীনাদের প্রথার সঙ্গে জাপানীদের মিল নেই। জাপানীদের সঙ্গে তিব্বতী, ভারতীয়, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী কারো মিল নেই। অথচ অতি পাশাপাশি এ দেশগুলো অবস্থিত। একই দেশে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার প্রথা দেখা যায়। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ বিচার করা কঠিন। কেননা, প্রত্যেকেই নিজের প্রথাকে উত্তম বলে জানে। এখন চলুন আমরা ইসলামী প্রথা নিয়ে আলোচনা করি।

ইসলামী প্রথা ঃ ইসলামে বিবাহ প্রথা অতি সহজ। দেশ-কাল-পাত্রভেদেও বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। যে প্রথা রসুল (দঃ) দিয়েছেন, যেরূপ প্রথা আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় সে প্রথাই সমাজের জন্য বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ প্রথায় ভালর সঙ্গে মিল আছে, মন্দের সঙ্গে মিল নেই। অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়ে কচি প্রাণ ভোলাবার যেমন সুযোগ নেই—জোরজুলুম, অত্যাচার বা পৈশাচিক প্রথার মাধ্যমে বাধ্য করবারও তেমনি কোন নির্দেশ নেই।

রাক্ষসের উদর হতে নারীকে এ প্রথা যেমন রক্ষা করেছে, ভোগ-বিলাসী, কামুক ও স্বার্থবাদী সর্দারের কামলিপ্সা হতেও নারীর সম্ভ্রম তেমনি রক্ষা করেছে। আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা উপর্যুপরি সঙ্গমের নিষ্ঠুরতা হতে নারীর অঙ্গকে বিবাহের পূর্বে যেমন পবিত্র রাখা হয়েছে, তেমনি ছেলেদের অবাধ অধিকার ও মালাবদল প্রথাকেও নিন্দা করা হয়েছে। ইসলামের প্রথা সভ্য মানুষের প্রথা। এ প্রথা সুষ্ঠু সামাজিক প্রথা। এ প্রথা রাষ্ট্রের নির্মিত বৃহত্তর কল্যাণের প্রথা। চলুন, আমরা দেখি ও বিচার করি ইসলামের এ অপূর্ব প্রথা কি?

ছেলে এবং মেয়ে যদি বয়স্কা হয়, তবে তাদের উভয়ের সম্মতি প্রয়োজন। এ সম্মতি পরস্পর দেখাশুনার মাধ্যমেও হতে পারে, গুরুজন বা আত্মীয়-স্বজনদের মতামতের ওপর নির্ভর করেও হতে পারে। হজরতের বাণী হতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে কেহ কোন রমণীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিলে যদি তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় তবে সে তাহার ভাবী স্ত্রীর চেহারা ও মুখশ্রী দর্শন করিবে। যাহাকে যাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয় সে তাহাকে দেখুক।"[১]

হজরত (দঃ) বলেছেন—"তুমি যাহাকে বিবাহ করিতে চাও, তাহার ঐ অঙ্গ তুমি দেখিতে পার যে অঙ্গ তোমাকে বিবাহের প্রতি আরও বাসনা উদ্রেক করে।"

হজরত জাবের (রাঃ) বলেন—"একবার আমি এক রমণীকে বিবাহ করার মানসে গোপনে দেখি। আমি এমন অবস্থায় দেখিলাম যাহাতে তাহাকে বিবাহ করার বাসনা আমার মধ্যে আরও বলবত্ত হইয়া উঠিল।"[১]

মগির-বিন শায়রা বলেন—"আমি একটি রমণীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিলে হজরত বলিলেন—'তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ?'

আমি বলিলাম, 'না'! তিনি বলিলেন, "যাও তাহাকে দেখিয়া আইস। সম্ভবত তোমাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হইবে।"[২]

কঠোর ও অসামাজিক প্রথা হজরত বিধিবদ্ধ করেন নি। বিবাহের পূর্বে যদি ছেলেমেয়ে পরস্পর দেখাশুনা না করে, তাহলে ভবিষ্যতে কোন অমঙ্গল ঘটলে তার জন্য বাবা, মা ও আত্মীয়-স্বজনকেই দায়ী হতে হয়। সংসারেও আসে এক চরম বিশৃঙ্খলা। যাকে নিয়ে

১। আবু দাউদ—সংগৃহীত হাঃ আলো, পৃষ্ঠা ১৬।

১। হাদিস সংগৃহীত—গুনিয়াতুত্তালেবীন, ১ম খণ্ড, কৃত বড়পীর হজরত আঃ কাদের জিলানী—তর্জমা মওলানা মুঃ মেহেরুল্লাহ। পৃষ্ঠা ৩৪।

২। তিরমিজি, মিশকাত—ইঃ মাজা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সারাটি জীবন কাটাতে হয়, তার চরিত্র ও চেহারা উত্তমরূপে জানা বিশেষ প্রয়োজন। এমন প্রথা হজরত দেন নি—যে দেখার ভান করে তাকে নিয়ে পালাতে হবে বা মদ্যপানে মেয়েকে অজ্ঞান করে তার ওপর ব্যভিচার করে পছন্দ করতে হবে (যা অনেক সমাজেই করে থাকে)।

শুধু ছেলের পছন্দেই বিবাহ হবে, মেয়েদের কোন পছন্দ লাগবে না—এমন একতরফা বিচারও হজরত করেন নি। পুরুষের যেমন ভাল মন্দের বিচার আছে, তার যেমন রুচিজ্ঞান আছে, কাল-ফর্সার প্রভেদ আছে, তেমনি মেয়েদেরও আছে। তাদের সে ইচ্ছাকেও চাপা দিয়ে রাখা মঙ্গলজনক নয়। পুরুষ যেমন একজন সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও নিখুঁত মেয়ে পছন্দ করে, মেয়েরাও তেমনি সবল, সুস্থ, অমায়িক ও বুদ্ধিমান ছেলে পছন্দ করে। হজরত এ জন্য তাদের পছন্দের ওপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন। নিম্নের উদ্ধৃতি এর প্রমাণ দেয়।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন—'বিধবাকে বিবাহ দেওয়া হইবে না তাহার বিনা মতে এবং কুমারীকে বিবাহ দেওয়া হইবে না তাহার বিনা অনুমতিতে।' সাহাবীরা বলিলেন—'হে রসুলুল্লাহ! কিরূপে হইবে কুমারীর অনুমতি?' তিনি বলিলেন, 'তাহার চুপ থাকা।'[৩]

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) শুধু পুরুষদের জন্য জন্মলাভ করেন নি। করেছিলেন নারী-পুরুষ সমগ্র সৃষ্টির মঙ্গলার্থে। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ, মানবজাতির কল্যাণ ও সৃষ্ট বস্তুর কল্যাণরূপেই হয়েছিল তাঁর আবির্ভাব। এ জন্যই আল্লাহ্ পাক বলেছেন—

"ওয়ামা আরছালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আলামিন।" অর্থাৎ 'সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ ব্যতীত তোমাকে প্রেরণ করা হয় নি।

সত্যই আমরা আজ তা দেখতে পাচ্ছি। নারীর অধিকার ছিল না। নারীর মর্যাদা ছিল না। গরু, ছাগল, কুকুর, শৃগালের যে স্বাধীনতা ছিল সেটুকুও নারীর ছিল না। অত্যাচারের ভয়ে, ধন-সম্পদের লোভে, বাধ্য-বাধকতার চাপে, সমাজের নিষ্ঠুর উৎপীড়নে অনেকেই বাধ্য হয়ে নিজ কন্যাকে রাজা-বাদশার ভোগের বস্তুরূপে তুলে দিত, দস্যুর হাতে সমর্পণ করত, ধনাঢ্য কুৎসিত যুবকের নিষ্ঠুর বাহুতে ঠেলে দিত। এখনও এরূপ প্রথা অনেক দেশেই দেখা যায়। নারীর ইচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দের ওপর কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

এটা শুধু কুপ্রথাই নয়—নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী প্রথা। বৈজ্ঞানিক নবী (দঃ) কেমন সুন্দর বাণী দিয়ে গেলেন; নারীর মর্যাদা, নারীর সম্মান ও নারীর ইচ্ছা ও অনিচ্ছার প্রতি কেমন গুরুত্ব আরোপ করলেন। বিধবাদের বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন যে, তাদের মত ছাড়া বিবাহ দেওয়া চলবে না। বিধবা মেয়েরা স্বামীর ঘর করেছে, সাংসারিক জালে আবদ্ধ হয়েছে, জ্ঞানবুদ্ধিতে পরিপক্ব হয়েছে, ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ বিচার করার ক্ষমতা অর্জন করেছে, পুরুষকে জানতে শিখেছে, প্রেম-প্রীতি কিছু আস্বাদন করেছে, তাই তাদের মতামতই যথেষ্ট। পিতা, মাতা, গুরুজন বা বন্ধু-বান্ধবীর মতামত নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কুমারী মেয়েরা যেহেতু অজ্ঞ, লাজুক, মনের নিভৃত কোণের ইচ্ছা প্রকাশে অসমর্থ, তাই তার মন বিচার করে বিবাহবন্ধন ঠিক করাই বুদ্ধির পরিচয়। এ কুমারী মেয়েদের বিবাহ প্রস্তাবে 'মৌনতাই

৩। সঃ বুখারী হাঃ নং ৬৬০। আবদুর রহমান খাঁ। বিবাহ পরিচ্ছেদ ২০।

স্বীকৃতির লক্ষণ'—মনে করে কার্যসমাধা করতে হবে অর্থাৎ বিবাহের প্রস্তাবে কুমারী মেয়ের নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ।

হজরতও একথাই বলেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন—

"আমি বলিলাম, হে রসুলুল্লাহ কুমারী তো লজ্জা করে।

তিনি বলিলেন, তাহার মৌনতাই তাহার সম্মতি।"[১]

নাবালিকা বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের সম্মতির প্রয়োজন নেই। মেয়ের পক্ষে তার পিতা, পিতামহ, বড়ভাই, চাচা বা ঘনিষ্ঠতম অভিভাবকের মতামতই যথেষ্ট।

বর ও কন্যাপক্ষের মধ্যে বিবাহের কথাবার্তা সম্পন্ন হবার পর এক শুভদিনে বিবাহকার্য সম্পন্ন হওয়া উচিত। ইসলামী মতে, বিবাহ কার্যে ৫টি শর্ত আছে। যেমন ঃ—(১) অভিভাবক—যিনি মেয়ের পক্ষে সম্মতি প্রদান করে কন্যা দান করেন। (২) মেয়ের সম্মতি গ্রহণ। (৩) সত্যপরায়ণ, সম্মানী ও বোধগম্য বিশিষ্ট কমপক্ষে দুজন সাক্ষী দ্বারা কন্যার সম্মতি নিজ কানে শ্রবণ করে বিবাহ মজলিশে সাক্ষ্য দান করা। এ সাক্ষী বর ও কনে পক্ষের মধ্য হতে হবে। নিরপেক্ষ ব্যক্তি হলেও চলবে। (৪) ইজাব অর্থাৎ বিবাহ প্রস্তাব যা মেয়ে বা ছেলের নিকট স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হয়। (৫) কবুল বা সম্মতির বাক্য। যখন ছেলে মেয়ের বিবাহ প্রস্তাব ওলি বা উকিল সাক্ষীর সম্মুখে করে তখন মেয়ে এবং ছেলে 'কবুল করিলাম', 'গ্রহণ করিলাম' বা 'মেনে নিলাম' এরূপ বাক্য বলে।

ইজাব কবুলের পূর্বে খোৎবা পাঠ করা সুন্নত।[১] এরপর অভিভাবক ছেলের দিকে লক্ষ্য করে বলবে—'আমি আমার মেয়ে, বোন, ভাগ্নি ... অমুককে এত টাকা মহরানায় তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম।'

বর তখন বলবে—'বিসমিল্লাহে ওয়াল্ হামদু লিল্লাহে' অর্থাৎ আমি এই বিবাহ এত টাকা মহরানায় কবুল করলাম।

আনন্দ উৎসব ঃ বিবাহ আল্লাহর বিধান। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অপূর্ব এক নিদর্শন। জীবনের চরম ও পরম এক আনন্দের দিন, যৌবনের নতুন জোয়ারের এক নতুন পদধ্বনি। এ আনন্দের দিনে স্বভাবতই মন চায় আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা হতে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাই এ উৎসব করে থাকে। শুধু বর কনের আনন্দই নয়—বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, ধনী-গরিব, প্রতিবেশী সবার জন্যই এটা একটা মহা উৎসব, মহা আনন্দ। শুধু মানুষ কেন, জীবজন্তুর মাঝেও যেন পড়ে যায় মহা ধুম, মহা উল্লাস। গরু, ঘোড়া, হাতি, মহিষ, চিল, শকুন, কুকুর, শৃগাল, ডায়া, পিপীলিকা এরাও যেন অংশীদার হয় এ আনন্দ উৎসবে। তাই কাজের জন্য, খাবার জন্য, চিৎকার ধ্বনীর জন্য এরা থাকে সদাপ্রস্তুত, ব্যস্ত, সন্ত্রস্ত। এজন্যই সবার কাছেই হয়ে ওঠে বিবাহের দিন এক আনন্দ মুখর পুলকবার্তার পবিত্র শুভ সময়।

বিবাহ মানব জীবনের এক আশীর্বাদ। তাই বিবাহ উৎসবও আনন্দের মাঝেই হওয়া

১। সহি বোখারী—হাঃ ২১/৬৬১।

১। খোৎবা পাঠ—আল্লাহ্ ও রসুলের উপদেশ বাণী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচিত। তবে সাধ্যের বাইরে চলে যায়, এমন ধরনের উৎসব করে বর অথবা কন্যা পক্ষের বাবা, মাকে কষ্ট করতে হয়, ধনসম্পত্তি বিক্রি করতে হয়, অথবা ভবিষ্যতের সম্বল উজাড় করে দেউলিয়া হতে হয়, এরূপ হওয়া উচিত নয়। সাধ্যানুযায়ী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবদের ভোজে আপ্যায়িত করা, তাদের দোওয়া আশীর্বাদ নেওয়া, জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশে বিবাহ মজলিশে এক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা নিষেধ নয়।

আমাদের নবী (দঃ) বিবাহের আনন্দ উৎসবকে নিষেধ করেন নি। নিম্নের ঘটনা হতে এ তত্ত্ব মেলে—

'রবি' বিন্‌তে মাউ-উয বলেন—"যে রাতে আমার বিবাহ হয় তার পরদিন হজরত রসুলে আকরাম (দঃ) আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন। একদল অপ্রাপ্ত বয়স্কা দাসী 'দফ' বাজিয়ে 'সোমা' আবৃত্তি করছিল। হজরত (দঃ)-কে দেখে কবিতায় তাঁরা প্রশংসা আরম্ভ করে দিল। হজরত বললেন—'তোমরা পূর্বে যা আবৃত্তি করেছিলে তাই কর।'[১]

'দফ' অর্থ একতালা বাদ্যযন্ত্র। এ বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে সে যুগে বিবাহ অনুষ্ঠানের সংবাদ সবাইকে পৌঁছিয়ে দেওয়া হতো। হজরতের বাণী হতে বোঝা যায় যে, তিনি 'দফ' বাজান ও আনন্দ সুরে কবিতা আবৃত্তি করা নিষেধ করেন নি। হানাফী মতে অবশ্য 'দফ' বাজান জায়েজ নয়।

আনন্দের সঙ্গে মজলিশে পানভোজন করার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং এজন্য নির্দেশও দিয়ে গেছেন। নিম্নের হাদিসটি এর প্রমাণ দেয়।

'ওলিমার দাওয়াত হক যদিও তুমি একটিমাত্র বকরী যবেহ কর।"[২]

হজরত নিজে যখন উম্মুল মোমেনিন সোফিয়াকে বিবাহ করেন তখন কেবল মাত্র যবের ছাতু এবং খোরমা দ্বারা আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভোজন করান। শুভ কার্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, উপস্থিত ব্যক্তিদের খুশি করা এবং আনন্দ বর্ধনই এর একমাত্র কারণ। যারা উপস্থিত সময়ে কিছুই দিতে পারেন না তাদের প্রতিও নির্দেশ—তিনদিন অথবা সাত দিনের মধ্যে যা কিছু জোটে তাই দিয়ে লোকদের খাওয়ান উচিত।

একটি কথা অবশ্য স্মরণীয় যে, এই বিবাহ ভোজ উৎসবে যেন ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই আমন্ত্রিত হয়। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদেরও লক্ষ্য থাকতে হবে যেন ভোজের উদ্দেশ্যে শুধু ধনীর বিয়েতেই না যায়। গরিবের বিয়েতেও সম আনন্দ নিয়েই যোগদান করতে হবে। এটা শুধু মানবতার জন্যই নয়, ধর্মেরও বিধান। হজরতের বাণী এ কথার সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন—

'বিবাহ ভোজের মধ্যে সেইগুলিই নিকৃষ্ট যাহাতে দরিদ্রদিগকে বঞ্চিত করিয়া শুধু ধনীদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে সে নিশ্চয় খোদা ও তাঁহার রসুলের অবাধ্য হয়।'[৩]

১। কিমিয়ায়ে শাআদাত ইমাম গাজ্জালী। তর্জমা—মাওলানা নুরুর রহমান। ব্যবহার খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২।

২। গুনিয়াতুত্তালেবীন—হগরত বড়পীড় আবদুল কাদের জিলানী। তর্জমা নুরুল আলম রইসী এম. এফ বি. এ. অনার্স, এম এ। ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩।

৩। শায়খান—সংগৃহীত হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড। আজহার উদ্দিন এম.এ.। পৃষ্ঠা ১৫।

যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে, ধন-জন আছে, আনন্দ-উৎসব করার ক্ষমতা আছে তাদের কোন বাধা-নিষেধ নেই। গরিব মিসকীনদের পেটপুরে খাওয়ান, দান-খয়রাত করে তাদের খুশি করা, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে বিবাহ-উৎসব ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী সম্পন্ন করাতে শুধু আনন্দই নয়, বর-কনের জন্য একটা আশীর্বাদও বটে।

এই আনন্দ উৎসবকে উপলক্ষ করে আবার অনেক অঘটন ঘটে এবং পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি হয়। অনেকে গরিব প্রতিবেশী ও গরিব আত্মীয়দের বাদ দিয়ে শুধু বিত্তশালী ও আধুনিক রুচিসম্মত বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে থাকে। এতে শত্রুতারও যেমন সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ ও রসুলও তেমনি অসন্তুষ্ট হন। এ জন্যই রসুল (দঃ) হয়তো বলেছেন—'তাহাই উত্তম বিবাহ যাহাতে অল্প যন্ত্রণা এবং অল্প ব্যয় হয়।'[১]

বিবাহে আনন্দ উৎসব নিষিদ্ধ নয়; ধর্মের প্রতিকূল নয়। আমাদের হজরতও নিষেধ করেন নি। নিম্নের উদ্ধৃতি এর সাক্ষ্য বহন করে।

হজরত আয়েশা (রাঃ) হাতে বর্ণিত আছে—তিনি একজন আনসারী পুরুষের সহিত একটি (অনাথ) বালিকার বিবাহ দিলেন। অতঃপর নবী (দঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আয়েশা তোমার সামনে আমোদ-প্রমোদ হইয়াছিল কি? আনসারীরাও আমোদ-প্রমোদ-ভালবাসে।'[২]

পণ প্রথা ঃ নারী ও পুরুষ আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি। এ সৃষ্টির মাঝেই গড়ে ওঠে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। বিবাহ এ দুটি সৃষ্টির মাঝে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই বয়ে আনে। এ সম্বন্ধ সৃষ্টিতে তাই এমন কোন বাধা থাকা উচিত নয় যা আনন্দের পরিবর্তে বয়ে আনে অভিশাপ, সুখের পরিবর্তে দুঃখ, উদারতার পরিবর্তে কঠোরতা। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুসংস্কার, দুর্নীতি, লোভ-লালসার ন্যায় পাপ ঢুকে সমাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। যে ছেলের জন্ম দিয়েছে সে যেন লাট সাহেব, জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যবান এক মহাপুরুষ। আর যে ছেলের পরিবর্তে মেয়ের জন্ম দিয়েছে সে যেন এক অপরাধী, কাঠগড়ার আসামী, পুরোহিতের খানসামা। মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে তাই ছেলেকে পাল্লায় ওজন করে সমপরিমাণ সোনা, রূপো ঘটি, বাটি, খাট, পালং, তোষক, বালিশ তৈরি রাখতে হবে। এই যে এক দুর্নীতি যা হিন্দু সমাজ থেকে ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি ঘরে ঘরে এবং বিষাক্ত করে তুলেছে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। এই কঠোর পণপ্রথা সমাজে প্রবেশ করার দরুন মেয়ের পিতামাতা ইচ্ছামতো তার মেয়েকে রূপ, গুণ, শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও সৎপাত্রস্থ করতে পারে না। হয়তো বা গরমিলের ভয়ে বিবাহ না দিয়েই ঘরে রাখে অথবা দায়িত্ব ও দায় এড়াতে মেয়েকে যে কোন পাত্রের হাতেই সঁপে দেয়। ফলে স্বামী দিয়ে ঐ মেয়ের মন ভরে না, আত্মীয়তা সুন্দর হয় না। ছেলে বাবা-মায়ের চাপে অথবা লোভে মেয়ের বাবার রক্ত চুষে খায়। এ রক্ত যখন হজম হয় না তখন পেট হয় দূষিত, মস্তিষ্ক হয় বিকৃত। কেননা ছেলের চোখ যায় পরমা সুন্দরী, শিক্ষিতা ও ভদ্র বংশজাত এক মেয়ের ওপর। এ জন্যই পণপ্রথা ইসলামে নিন্দনীয়।

১। মিশকাত—বিবাহ পরিচ্ছেদ।

২। হাদিস।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলাম নারীর মর্যাদা দিয়েছে। বিবাহের সময় ছেলেকে কিছু দেবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যদি কেউ ছেলেকে কোন কিছু উপহার স্বরূপ দিতে চায় সেটা পৃথক কথা। কিন্তু মেয়েকে দিতেই হবে সেটা যত ছোট বা নগণ্যই হোক না কেন। এছাড়া একটা মোহর ধার্য করা হয়। এ মোহর বিবাহের সময় নগদে, অলঙ্কারাদিতে বা গরু, ছাগল ইত্যাদি দিয়ে পরিশোধ করতে হয়। যদি কারণবশত বাকি থাকে তবে পরবর্তী সময়ে ছেলেকে সেটা পরিশোধ করতে হবে অথবা স্ত্রীর নিকট হতে মাফ নিতে হবে। এ মোহর আদায় না করলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না, অবৈধ বলে গণ্য হবে। অবৈধ বিবাহের অর্থ ব্যভিচার। হজরত কঠোর ভাষায় এ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন—কোন ব্যক্তি স্ত্রীর মোহর আদায় না করিলে কেয়ামতের দিন তাহাকে এমন ভাবে উঠান হইবে যে সে যেন আজীবন তাহার স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচার করিয়াছে।"[১]

এ বিষয়ে রসুলের আর একটি বাণী নিম্নরূপ ঃ সহল-বিন সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, 'একটি স্ত্রীলোক নিজেকে নবী (সঃ) এর নিকট আর্জি পেশ করিল। এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, হে রসুলুল্লাহ! উহাকে আমার সহিত বিবাহ দেন। তিনি বলিলেন—তোমার কি আছে? সে বলিল—'কিছু না'; যাও, কিছু চাহিয়া লও যদি উহা হয় একটি লোহার আংটি। সে পুনরায় আসিয়া বলিল, 'কসম খোদার কিছুই পাইলাম না, একটি লোহার আংটিও না; কিন্তু আমার এ লুঙ্গির অর্ধেক সে পাইবে। সহল বলিয়াছেন তাহার চাদর ছিল না। নবী (সঃ) বলিলেন, তোমার লুঙ্গি দিয়া সে কি করিবে? যদি তুমি পর উহা উহার কোন অংশ থাকিবে না তোমার গায়ে। তখন ঐ লোকটি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল এবং বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া চলিল। তখন রসুলুল্লাহ (সঃ) তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'কুরআনের কোন সূরা মনে আছে তোমার'? সে বলিল, আমার মনে আছে, অমুক অমুক সূরা। সে একে একে নাম করিল উহাদের। তখন রসুলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে মালিক করিয়া দিলাম ঐ স্ত্রীলোকটির তোমার কুরআনের জ্ঞানের কারণে।'[২]

এমন কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আমরা মেয়ের বাবার নিকট হতে যৌতুক পাবার আশায় বিয়ে করি। এ কুসংস্কার গোটা সমাজকে আজ প্রায় ধ্বংস করতে চলেছে। হিন্দু সমাজের তো কথাই নেই। মুসলিম সমাজে এ কুপ্রথা ঢুকে ইসলামের সৌন্দর্য নষ্ট করছে। এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ দরকার। শুধু সমাজের পক্ষ থেকেই নয়, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও রসুল (দঃ)-এর এই বাণীকে সম্মুখে রেখে আইন প্রণয়ন করা উচিত। একই মায়ের গর্ভ হতে ছেলে ও মেয়ের জন্ম হয়। ছেলের আদর থাকবে, মর্যাদা থাকবে, আর সেই মার গর্ভের মেয়ের মর্যাদা থাকবে না এটা কিছুতেই হতে পারে না, কোন ধর্মেই এ কুপ্রথার প্রশ্রয় দেয় নি। তাই প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদেরই এ প্রথা বর্জন করা উচিত।

মোহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। যাদের সামর্থ্য আছে তাদের পক্ষে বেশি অঙ্কের

১। শুনিয়াতুত্তালেবীন—হজরত বড়পীর আঃ কাদের জিলানী।
১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩। তর্জমা—মুন্সী মেহেরুল্লাহ।
২। তজরীদুল বুখারী—তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। বিবাহ পরিচ্ছেদ। হাঃ নং ১৮/৬৫৮

মহর দেবার তেমন বাধা নেই, তেমনি সামর্থ্যহীন লোকদের ন্যূনতম মহর দেবারও কোন বাধা নেই। তবে এর পরিমাণ কম হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

হজরত বলেছেন, 'স্ত্রীলোকদের মধ্যে সেই স্ত্রীলোকই উত্তম যাহার দেনমোহর অল্প অথচ তাহার রূপ ও গুণ অধিক।'[১]

রসুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণ স্ত্রীলোকের মহর ১০ দেরহাম নির্ধারণ করেছেন এবং তার কন্যাদের মোহর ৪৯০ দেরহামের অধিক নির্ধারণ করেন নি।

এ সম্বন্ধে কোরআন বলেছে, 'এবং নারীগণকে তাহাদের দেয় মোহর প্রদান কর, কিন্তু যদি তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে উহার কিয়দংশ প্রদান করে, তবে বিবেচনা মতো তৃপ্তির সহিত ভোগ কর।'[২]

বিবাহের বিধি-নিষেধ

কোরআনের নির্দেশ ঃ "তোমাদের জন্য অবৈধ করা হইল—তোমাদের মাতৃগণ ও তোমাদের কন্যাগণ ও তোমাদের ভাগ্নিগণ এবং তোমাদের ফুফুগণ ও তোমাদের খালাগণ এবং তোমাদের ভ্রাতৃ-কন্যাগণ ও ভগ্নী-কন্যাগণ এবং তোমাদের সেই মাতৃগণ যাহারা তোমাদিগকে স্তন্য দান করিয়াছে ও তোমাদের দুগ্ধ ভগ্নিগণ এবং তোমাদের স্ত্রীদিগের মাতৃগণ এবং তোমরা যাহাদের অভ্যন্তরে উপনীত হইয়াছ সেই স্ত্রীদিগের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিত; কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে উপনীতা না হইয়া থাক, তবে তোমাদের জন্য অপরাধ নাই; এবং যাহারা তোমার ঔরসজাত সেই পুত্রগণের পত্নিগণ; এবং যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে তদ্ব্যতীত দুই ভগিনীকে একত্রিত করা; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়।"[৩]

"এবং যাহারা বিগত হইয়া গিয়াছে তদ্ব্যতীত তোমাদের পিতৃগণ নারীকুলের মধ্যে যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না; নিশ্চয়ই ইহা অশ্লীল ও অরুচিকর এবং নিকৃষ্টতর পন্থা।"[১]

যে যুগে হজরতের আবির্ভাব ঘটে সে যুগে এবং তার পূর্বে সারা পৃথিবীতে সমস্ত জাতির মধ্যেই ছিল কুপ্রথা, অধর্ম ও অরুচিকর ব্যবস্থা। আরবে তখন এমন এক বিকৃত প্রথা ছিল যে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র তার পরিত্যক্তা সমস্ত স্ত্রীদের অধিকারী হতো এবং তাদের সঙ্গে স্ত্রীবৎ আচার-ব্যবহার করত। এমন অশ্লীল এবং কুপ্রথা রহিত করেই কোরআন উপর্যুক্ত বাণী ঘোষণা করে। এ বাণী দ্বারা আল্লাহ্ পাক সাবধান করেছিলেন যে পিতার পরিণীতা নারী পুত্রের জন্য হারাম।

১। হাদিস, সংগৃহীত, হাদিসের আলো। কৃত, পূর্বে বর্ণিত।
২। সূরা নেসা, আয়াত ৪।
৩। সূরা নেসা, আয়াত ২৩।
১। সূরা নেসা, আয়াত ২২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরআনের উপর্যুক্ত বাণীর ওপর একটি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, পিতা কর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী ছাড়া যে সব নারী পিতা রক্ষিতা হিসাবে অথবা অবৈধ প্রণয়ী হিসাবে ব্যবহার করেছে তারা পুত্রের জন্য অবৈধ নয়। সুবিখ্যাত ইমাম শাফিয়ী বলেন, যেহেতু উক্ত আয়াতে যখন 'বিবাহ' শব্দটি পরিষ্কাররূপে বর্ণিত আছে তখন পিতার বৈধ বিবাহিতা নারীগণ ব্যতীত অবৈধ উপভুক্তা নারীগণ পুত্রের জন্য অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু জগদ্বিখ্যাত ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) বলেন, বিবাহিতা হউক আর অবিবাহিতা হউক কিংবা ব্যভিচার ব্যবসা জীবনীই হউক, পিতা যে সকল রমণীকে বৈধ বা অবৈধ ভাবে স্পর্শ বা উপভোগ করিয়াছে তাহারা সকলেই পুত্রের জন্য হারাম। ইমাম আজম এই অভিমতের উপর এত অীধক জোর দিয়াছেন যে পিতা যদি পুত্রবধুকেও অবৈধভাবে স্পর্শ করে তথাপি তিনি উক্ত স্ত্রীকে পুত্রের জন্য অবৈধ করিয়াছেন।'[২]

অবৈধ নারী ঃ ১ম—মাতৃগণ অর্থাৎ মাতামহী, পিতামহী প্রভৃতি যত উর্ধ্বতমা হউক। ২য়—কন্যাগণ অর্থাৎ কন্যা, কন্যার কন্যা, পুত্রের কন্যা প্রভৃতি যত নিম্নদিকে হউক। ৩য়—ভগ্নিগণ অর্থাৎ সহোদরা বৈমাত্রেয় ও বৈ-পৈত্রিক ভগ্নিগণ। ৪র্থ—আপন ভাগ্নী, ভাতিজী ও যত নিচে হোক। ৫ম—ফুফুগণ অর্থাৎ পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপৈত্রিক ভগ্নিগণ। ৬ষ্ঠ—খালাগণ অর্থাৎ মাতার সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপৈত্রিক ভগ্নিগণ। ৭ম—স্ত্রীর মাতৃগণ, অর্থাৎ শাশুড়ি, দাদী শাশুড়ি ও নানী শাশুড়ি প্রভৃতি উর্ধ্বতমাগণ। ৮ম—যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছে সেই স্ত্রীর পক্ষের সর্বপ্রকার কন্যা, দৌহিত্র ও পৌত্রি প্রভৃতি নিম্নদিকে। ৯ম—পুত্রবধু, পৌত্রিবধু ও দৌহিত্রবধু প্রভৃতি নিম্নদিকে। ১০ম—দুগ্ধমাতা এবং তার মাতা, শাশুড়ি, ভগ্নি, ননদিনী, কন্যা, পৌত্রি ও দৌহিত্রী প্রভৃতি উর্ধ্ব ও নিম্ন দিকে এবং দুগ্ধ কন্যা ও দুগ্ধ পুত্রবধু প্রভৃতি। ১১শ—কোন বয়ঃপ্রাপ্তা রমণীর সঙ্গে ব্যভিচার করলে ওপরের স্ত্রীর সম্বন্ধের নিয়ম অনুযায়ী তার মাতা, মাতামহী, পিতামহী প্রভৃতি উর্ধ্বতমা এবং কন্যা, পৌত্রি, দৌহিত্রী প্রভৃতি নিম্নবর্তিনীগণ। ১২শ—যদি কেউ কোন যুবতী অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তা রমণীকে আসক্তির সঙ্গে স্পর্শ করে কিংবা তার আবৃত অঙ্গের অভ্যন্তরে কামভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় ঐ রমণীর মাতা, মাতামহী, পিতামহী এবং কন্যা, পৌত্রি ও দৌহিত্রী প্রভৃতি। ১৩শ—বিধর্মী, অংশীবাদিনী ও ধর্মত্যাগিণী নারীগণ। ১৪শ—পরস্ত্রী; যে বৈধভাবে অন্য পুরুষের অধীন।[১]

ইসলামের এ বিধিনিষেধ বিজ্ঞানসম্মত। কেন ওপরে বর্ণিত মেয়েদেরকে বিবাহ করা চলে না, এতে মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক দিক থেকে কি অবনতি আসতে পারে বৈজ্ঞানিক যুগে তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ নিয়ে ইনশাল্লাহ্ পরে আলোচনা করব। এখন একবার দেখে নিই যে, যে বিধিনিষেধকে আমরা ঘৃণা করছি তার প্রচলন সত্যি ছিল কি না। এখনও আছে কি না। কোন্ ধর্ম, জাতি ও দেশে তা বিদ্যমান ছিল ও আজও আছে।

২। সংগৃহীত, কোরআনের তর্জমা—আলী হাসান।

১। সংগৃহীত কোরআনের তর্জমা—আলী হাসান। পৃষ্ঠা ২৫৫—৫৬। ৪র্থ পারা।

গ্রীক ও হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। ব্রহ্মা তাঁর নিজ কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করেছিলেন। মিশরীয় দেবতা আমন তাঁর মাতাকে, স্ক্যান্ডেনেভিয়ার দেবতা ওডিন নিজ কন্যা ফ্রিগাকে, রোমীয় দেবতা জুপিটার তাঁর সহোদরী ভগ্নি জুনোকে বিবাহ করেছিলেন।

সুইজারল্যান্ড, এথেন্স, মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশে যে এরূপ বিবাহ হতো ইতিহাস আজও তার সাক্ষ্য দেয়। মিশরের ফেরাউন রাজারা আপন ভগ্নি ও সতাল ভগ্নিদের বিবাহ করতেন। টলেমীরা এদের অনুসরণ করত। ভূস্বামীদের মধ্যে জমির ভাগ এড়ানোর উদ্দেশ্যে ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ হতো। ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর সতাল ভগ্নিকে বিবাহ করেছিলেন। মিশরের বিখ্যাত রাণী ক্লিয়োপেট্রা ভ্রাতা-ভগ্নি বিবাহের সন্তান ছিলেন।

এক এক দেশে এক এক প্রথা বিদ্যমান। মানুষের চেহারা, কণ্ঠস্বরের মাঝে যেখানে মিল নেই, সেখানে চিন্তাধারার মাঝে মিল থাকবে তা কল্পনা করাও অপরাধ। আমরা আপন মা, ভগ্নি, খালা, শাশুড়ির সঙ্গে বিবাহের কথা শুনলে চমকে যাই। শুধু হাসিই পায় না, নিতান্তই নির্বোধ ও ধর্মদ্রোহী বলে মনে করি। অথচ যাদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত তারা তা মনে করে না। সিংহলের ওয়েড্ডা সম্প্রদায় আপন ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহকে ধর্ম ও পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। জানি না তারা হয়তো বা আদম পুত্র হাবিল কাবিলের কথাই চিন্তা করে সহোদরা ভগ্নিদের বিবাহ করেছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মহাবংশে' দেখা যায় লাড় দেশের রাজা মীহবান্দ নিজ সহোদরা ভগ্নি মিহসী বিলিকে বিবাহ করেন।

ইসলাম ধর্ম প্রচার হবার পর থেকে মিশর ও পারস্য হতে এ প্রথার বিলোপ সাধন হয়। তবুও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে ছাড়া আজও বিবাহ হয় না। আমাদের দেশেও অনেক খানদানী বংশে এ প্রথা বিদ্যমান আছে। রাজা ওক্কারের চার পুত্র তাঁর চার কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরা কপিলাবস্তু নগরে বসবাস করেন। এরূপ বিবাহ সমর্থন বা শক্য হয়েছিলো বলেই তাদের এ বংশকে শাক্য বংশ বলা হয়![১] নিজ ফুফু, খালা, সহোদরা ভগ্নি, এমনকি দুধভগ্নিকে যে বিবাহ করা নিষেধ, হজরত (দঃ)-এর বাণী হতে তা বোঝা যায়। নিম্নে প্রদত্ত হাদিসটি তার প্রমাণ দেয়—

জাবির (রাঃ) বলেন—"রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন ইহা যে কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ হয় তার ফুফু বা খালার উপরে।"[২]

উম্মে হাবিবা বিন্‌তে আবু সুফিয়ান বলেন—আমি বলিলাম, হে রসুলুল্লাহ! আমার ভগ্নি আবু সুফিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি উহা পছন্দ কর কি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আমি একা নহি। এবং যাহারা আমার সুখের ভাগী হইতে পারে তাহাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি নিজের ভগ্নিকে। নবী (দঃ) বলিলেন, উহা হালাল নহে আমার জন্য। আমি বলিলাম, তবে যে আমরা বলাবলি শুনি আপনি আবু সালমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চান। তিনি বলিলেন, উম্মে সালমার কন্যাকে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি

১। সংগৃহীত যৌনবিজ্ঞান—আবুল হাসানাত; পৃষ্ঠা ৪৪৬—৪৭।

২। তজরীদুল বুখারী। তর্জমা—আলহাজ আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ১৫/৬৫৩, পৃষ্ঠা ২৯১

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিলেন, "সে যদি আমার গৃহে পালিত নাও হইত সে আমার জন্য হালাল হইত না। কেননা সে আমার দুধভগ্নি। সুয়াইব স্তন দিয়াছেন আমাকে ও আবু সালমাকে। অতঃপর তুমি আমার জন্য কখনও প্রস্তাব করিও না তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিদিগকে।"[৩]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত—"নবী (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কেন হামজা (রাঃ)-এর কন্যাকে বিবাহ করেন না? তিনি বলিলেন, সে তো দুধের সম্পর্কে আমার ভগ্নি।"[৪]

এবারে আমরা দেখি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় হজরতের বিধি-নিষেধকে বিশ্লেষণ করে এর সুফল প্রমাণ করি।

একই মাতৃগর্ভজাত ভাই ও বোনের মধ্যে সমজাতীয় গুণ অথবা দোষ থাকে। যদি গুণের আধিক্য থাকে তবে তাদের ঔরসজাত সন্তান গুণী হবে এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু যদি দোষের আধিক্য বেশি থাকে তবে গর্ভজাত সন্তানের দোষ আরও Multiply হয়। এতে বংশ নিপাত হবার সম্ভাবনা। এছাড়া দেখা যায় যে, সহোদর ভাই-ভগিনী দ্বারা যে সন্তানের জন্ম হয় তারা দুর্বল মস্তিষ্ক, ক্ষীণ স্বাস্থ্য ও একই বর্ণবিশিষ্ট হয়। ডাক্তার ফেরেল বলেছেন, এই শ্রেণীর যৌন-মিলনে শতকরা ২৫টি সন্তান মাতৃগর্ভেই মরা যায়।"[৫] **একই গ্রুপ-এর রক্ত এর কারণ।**

যদিও এর ওপর গবেষণার যথেষ্ট কিছু রয়েছে তবুও এ প্রথাকে আমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি না। রসুল (দঃ) যে বিধান দিয়েছেন তা বিজ্ঞানসম্মত এটা স্বীকার করতেই হবে। কেননা শুধু একটা বিষয় চিন্তা করলেই দেখা যায় যৌন-মিলনের সবচেয়ে বেশি আনন্দ আনে প্রেমাকর্ষণ। এ প্রেমাকর্ষণ নতুনত্বের মাঝে যে ভাবে গাঢ় হয় পুরাতনের মাঝে তা হয় না। হতেও পারে না। সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে লজ্জা, জড়তা, পুরাতনের ছাপ থাকায় আসক্তির অভাব ঘটে। আসক্তির অভাব হলে আনন্দ ও স্ফূর্তি আসে না। আনন্দ ও স্ফূর্তির মাঝে মিলন না ঘটলে অশান্তি আসে। ফলে গর্ভজাত সন্তান রোগাটে, বদমেজাজি, উর্বর মস্তিষ্কবিহীন হতে বাধ্য। নতুন স্ত্রী, নতুন আত্মীয়, নতুন জায়গা ও নতুন রূপে আঁখি ভোলে। নতুন দৃশ্যে মন ভোলে। এ কথা কবি, লেখক ও সাহিত্যিকের কথা নয়—এ কথা প্রতিটি নরনারীর একান্ত প্রাণের কথা।

অদল-বদল বিবাহ ঃ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত -"নবী (সঃ) নিষেধ করিয়াছেন অদল-বদল বিবাহ।"[২]

আমাদের দেশে বিশেষ করে মুসলিম সমাজে এ প্রথা দেখা যায়। অথচ আমরা কোনদিন রসুল (দঃ)-এর এ গুরুত্বপূর্ণ বাণীটি দেখি নি বা বিচার করি নি। এ বাণীর তাৎপর্য যে কত অধিক তা শুধু ভুক্তভোগী ভাই-বোনেরাই জানেন, যাঁরা এ ফাঁদে পড়ে অশান্তির জীবন যাপন করেছেন।

৩। তজরীদুল বুখারী। তর্জমা—আলহাজ আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ১৩/৬৫৩, পৃষ্ঠা ২৮৯-৯০।
৪। তজরীদুল বুখারী। তর্জমা—আলহাজ আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ১১/৬৫২, পৃষ্ঠা ২৮৮।
৫। সংগৃহীত, যৌনবিজ্ঞান—আবদুল হাসানাত। পৃষ্ঠা ৪৪৭।
২। তজরীদুল বুখারী-আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ১৬/৬৫৬।

অনেক সময় দেখা যায় যে দু-পক্ষেই একটি করে ছেলে ও একটি করে মেয়ে আছে। বিবাহ দেবার সমস্যায় অথবা সামাজিক চাপে বা দু-পক্ষই দায় এড়ানোর চিন্তায় একজনের ছেলে অন্যজনের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়ে থাকে। প্রথম সম্পর্ক স্থাপন হওয়ার কিছুদিন পরই দু-পক্ষের মাতাপিতা ছেলে অথবা মেয়েকে ভাল মনে করে অথবা একজনের ছেলে আর একজনের মেয়ের সঙ্গে দেখাশুনা ও আলাপ-পরিচয়ে প্রেমে পড়ে। এরূপ অবস্থার মাঝেও অদল-বদল বিবাহ হয়ে থাকে। দুটো মেয়ে বা দুটো ছেলেই অর্থাৎ চারটি ছেলেমেয়েই যে একই স্বভাবের হবে তা চিন্তা করা যায় না। একজনের ছেলে হয়তো বদমেজাজি, সে তার স্ত্রীকে অত্যাচার করে। এই অত্যাচারের কাহিনী অপর পক্ষে পৌছানো মাত্রই তার বাবা, মা, ভাই, বোন অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে তাদের ছেলের দ্বারা অথবা নিজেরাই প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করে। তখন ঐ পক্ষের মেয়েটির জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। একটি ছেলের চরিত্র খারাপ হওয়ার দরুন তিনটি জীবনে অশান্তি নেমে আসে। তদ্রূপ একটি মেয়ের চরিত্র খারাপ হলেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এ সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে অশান্তি, অত্যাচার শুরু হয় তার তুলনা নেই। দু-দেশের দু-রাজার মধ্যে যেমন যুদ্ধ শুরু হয় তেমনি দু-পক্ষের আত্মীয়ের মধ্যেও এরূপ মানসিক যুদ্ধ চলতে থাকে। এ জন্যই এ ব্যবস্থা প্রীতিজনক নয়, কল্যাণজনক নয় ও সুখেরও নয়।

হজরতের এ বাণী এরূপ বিবাহ সম্বন্ধের পূর্বে স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ভালোর সঙ্গে ভাল এবং মন্দের সঙ্গে মন্দ বিবাহ।

বিবাহের আর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আমরা দেখতে পাই কোরআনে। সেখানে বলা হয়েছে, "অপবিত্রা নারীগণ অপবিত্র পুরুষদিগের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষগণ অপবিত্রা নারীদিগের জন্য, এবং পবিত্রা নারীগণ পবিত্র পুরুষদিগের জন্য এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্রা নারীদিগের জন্য।"[১]

"ব্যভিচারী অবশ্যই ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনী ব্যতীত বিবাহ করিবে না এবং ব্যভিচারিণী অবশ্যই ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদী ব্যতীত বিবাহ করিবে না, এবং ইহা বিশ্বাসিগণের প্রতি অবৈধ করা হইয়াছে।"[২]

সুখকর ও মধুকর জীবন যাপন করার জন্য এমন সুন্দর উপদেশ আর হয় না। এ উপদেশ কোন চিন্তাশীল মনীষীর নয়, স্বয়ং আল্লাহর। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এ উপদেশ প্রযোজ্য। যারা ব্যভিচারে অভ্যস্ত, ধর্ম মানে না, সমাজের পরওয়া করে না, মান-ইজ্জতের ভয় করে না, তাদের জন্য যেমন সুন্দর ব্যবস্থা, যারা ধর্মভীরু, আল্লাহকে বিশ্বাস করে, পরকালের বিচারকে ভয় করে, সমাজের শাসন মানে, আত্মা নির্মল রাখতে চায়, ভবিষ্যৎ বংশধরদের কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে চায় তাদের জন্যও আল্লাহর এ নির্দেশ তেমনি সুন্দর ও ফলবতী।

১। কোরআন ঃ সূরা নূর, আয়াত ২৬।
২। কোরআন ঃ সূরা নূর, আয়াত ৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যভিচারী কোন পুরুষ ব্যভিচারিণী কোন নারীকে গ্রহণ করলে বিভেদ, বিচ্ছেদ, কলহ ও দোষগুণ ধরবার কোন উপায় থাকে না। কেননা স্বামী যদি ব্যভিচারীর অপরাধে স্ত্রীকে গালাগালি দেয়, তবে স্ত্রীরও ততটুকু গালাগালি দেবার সুযোগ থাকবেই। কেউ কাউকে ভাল বলার উপায় নেই। ব্যভিচার যদি দু-জনেরই পছন্দ হয় তবে দু-জনের জন্যই মঙ্গল। Algebra-তে আমরা দেখি Minus ও Minus-এ Multiply করলে-এর Result হয় Plus। এ ফরমূলাতে দেখা যায় যে ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীর সঙ্গেই মিল খায়। সুসভ্য দেশ আমেরিকা ও ইংলন্ডে এ জন্যই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর পার্থক্য করা হয় না। ব্যভিচার করা তাদের জায়েজ। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ব্যভিচার করার সনদ দেওয়া হয়। আল্লাহ্ পাক ভালভাবেই মানুষের মনের কথা জানেন। তাই এ ব্যবস্থাই দিয়েছেন।

Plus ও Minus-এর Result যেমন Minus হয়, তেমনি ভালর সঙ্গে মন্দের মিলন হলে এর ফল হয় বিষময় অর্থাৎ Minus। তাই পবিত্র পুরুষ অথবা পবিত্রা নারীর সঙ্গে অপবিত্রা নারীর বা অপবিত্র পুরুষের বিবাহের ব্যবস্থা আল্লাহ্ দেন নি।

Plus ও Plus-এর গুণফলের Result হয় Plus। এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। তাই ভালর সঙ্গে ভালর সম্বন্ধ হলে অর্থাৎ পবিত্র পুরুষের সঙ্গে পবিত্রা নারীর বিবাহ হলে ফলাফল সুখকর ও আনন্দায়ক না হয়ে পারে না। কেননা পবিত্র পুরুষ, স্ত্রীর সৌন্দর্য বা অন্য গুণে গুণান্বিত না হলেও আল্লাহর ভয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না। পবিত্রা নারীর বেলাতেও ঠিক সেই কথাই প্রযোজ্য। কোরআনের এ বাণী অনুসরণ করলে দাম্পত্য-জীবন মধুময় হতে বাধ্য।

কোন মুমেন পুরুষ অথবা নারী ব্যভিচারিণী বা ব্যভিচারীকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিবাহ করতে পারে না। ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীদের বিবাহের আর একটি শর্ত আছে, যা কোরআন নির্দেশ করেছে। ব্যভিচারী পুরুষ মুসলমান, হিন্দু, খ্রীষ্টান যে কোন জাতিরই হোক না কেন ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করতে হবে। ব্যভিচারী মুসলমান হলে সে অংশীবাদিনীকে বিবাহ করতে পারে। অনুরূপভাবে মুসলিম নারী ব্যভিচারিণী হলে তাকে কোন মুমেন মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চলে না। অংশীবাদীর সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে।

এ ব্যবস্থার আর একটি গূঢ়তত্ত্ব আমরা দেখতে পাই। ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর মিলন অংশীবাদিনী বা অংশীবাদীর সঙ্গে দেবার কারণ এই যে এ দু'টো শ্রেণীই সবচেয়ে নিকৃষ্ট। অংশীবাদী বা অংশীবাদিনীদের কোন স্থান পরকালে নেই। ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীদের আল্লাহর নিকট ক্ষমা থাকলেও যারা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে না তারা অংশীবাদীদের পর্যায়েই পড়ে। পরকালের চিন্তা যখন এরা কেউ করে না তখন লাগামহীন ঘোড়ার মতো এদের ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি? দুনিয়ার বুকে কিছু সুখ এরা লুটে তৃপ্ত হোক। আল্লাহর এ সুন্দর ব্যবস্থা মুমেনদের রক্ষা করবে, সমাজকে সুষ্ঠু করবে, বিশৃঙ্খা ও অন্যায়ের হাত থেকে শান্তিকামীরা বাঁচবে।

বহু বিবাহ

পুরুষ চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা শক্তিশালী, বির্যবান, ক্ষমতালোভী। এদের প্রাধান্য আল্লাহ্ পাক নিজেই দিয়েছেন। যৌবনের উন্মত্ততায় এরা সব ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। চায় নারী। একটি নয়, দু'টি নয়। যাকে যখন যে অবস্থায় চোখে ভাল লাগে, প্রাণ তাকেই চায়। এ জন্যই এক নারীতে পুরুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। পুরুষের মনের খোরাক এক নারী দিতে পারে না। তাই পুরুষ চায় বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রং-বেরঙের নারী পেতে। সৃষ্টির পর থেকেই তাই পুরুষ যদৃচ্ছা নারী ভোগ করে তৃপ্ত হতো। ইতিহাস খুঁজলে এর প্রমাণ মেলে।

নিগ্রো নেতা টাভারের একশ' স্ত্রী ছিল। বেনিন রাজার এক হাজার এবং উগান্ডার রাজার এক হাজারেরও বেশি পত্নী ছিল। নিগ্রোরাজ লোয়াঙ্গোর সাত হাজার মহিষী ছিল বলে শোনা যায়। ফিজি দ্বীপের রাজারা এখনও একশ' পত্নী রাখেন। প্রাচীন ভারতের হিন্দু ব্রাহ্মণগণ এত বেশি বিবাহ করতেন যে, তার হিসাব রাখা কঠিন হতো। স্ত্রীদের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হবার সুযোগ হতো না। আইনত এখনও তাদের মধ্যে বহু বিবাহের কোন বাধা নেই।

নবী-পয়গম্বর ও মুসলিম বাদশাদের মধ্যেও বহু বিবাহের প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে। হজরত দাউদ (আঃ)-এর একশ' স্ত্রী ছিল বলে শোনা যায়। হজরত মুসা, হজরত ইব্রাহিম ও হজরত সোলায়মান (আঃ)-এরও বহু পত্নী ছিল। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল এর সাক্ষ্য বহন করে—

শলোমনের পাপে পতন ও তার ফল

১১। "শলোমন রাজা ফরোনের (ফেরাউন) কন্যা ব্যতিরেকে আরও অনেক বিদেশীয়া রমণীকে অর্থাৎ মোয়াবীয়া, অম্মোনীয়া, ইদোমীয়া, সদোনীয়া ও হিত্তিয়া রমণীকে প্রেম করিতেন। যে জাতিগণের বিষয়ে সদাপ্রভু ইস্রাইল-সন্তানগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা তাহাদের কাছে যাইও না, এবং তাহাদিগকে আপনাদের কাছে আসিতে দিও না, কেননা তাহারা অবশ্য তোমাদের হৃদয়কে আপনাদের দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিবে, শলোমন তাহাদেরই প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। সাত শত রমণী তাঁহার পত্নী ও তিনশত তাহার উপপত্নী ছিল; তাঁহার সেই স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে বিপথগামী করিল। ফলে এইরূপ ঘটিল, শলোমনের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার স্ত্রীরা তাঁহার হৃদয়কে অন্য দেবগণের অনুগমনে বিপথগামী করিল; তাঁহার পিতা দাউদের অন্তঃকরণ যেমন ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ তেমনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল না। কিন্তু শলোমন সীদনীয়দের দেবী অষ্টরতের ও অম্মোনীয়দের ঘৃণার্হ বস্তু মিলকমের অনুগামী হইলেন। এইরূপে শলোমন সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিলেন; আপন পিতা দাউদের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে সদাপ্রভুর অনুগামী হইলেন না।"

[বাইবেল ঃ জবুর, ১ রাজাবলি। ১১/১-৬]

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ যুগেও এমন নিদর্শন যে দেখা যায় না তা নয়। বাদশাদের মধ্যে পত্নীর সংখ্যা চারটিতে সীমাবদ্ধ কমই দেখা যায়। এছাড়া উপপত্নী ও দাসী নর্তকীর তো হিসাবই নেই। একশ' পত্নীর স্বামী অনেক বাদশাই এ যুগে ছিলেন ও আছেন। শুধু রাজা, বাদশা, জমিদার ও জোতদারের দোষ দিয়ে লাভ কি। অনেক রসিক পুরুষ আমাদের পাশাপাশি এখনও আছেন যিনি তার পরমায়ুর দ্বিগুণ সংখ্যক পত্নী নিয়ে সংসার করছেন। শুনলে হয়তো বিশ্বাস হবে না, দেখুন দুষ্ট সাংবাদিকরা কি ঘটনা তুলে ধরেছেন।

বিবাহের মহানায়ক

তেহরান, ৫ই জুলাই (রয়টার) ঃ

"তিন ১৬৮ বারের মতো দ্বার-পরিগ্রহের আয়োজন করিতেছেন। বিবাহের এই "মহানায়কের" নাম ইয়াহিয়া আলী আকবর বেগ নূরী। বয়স মাত্র ৮৩, বাড়ি ইরানে। তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতার গোপন কথা হইল তিনি দৈনিক এক কিলোগ্রাম করিয়া কাঁচা পিঁয়াজ ভক্ষণ করেন।" ফারসী ভাষার সংবাদপত্র "এত্তেলা"-তে আজ এ খবর ছাপা হয়।

জনাব নূরী উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বলেন—'তিনি এ পর্যন্ত কয়টি সন্তানের জন্ম দিয়াছেন উহা বলিতে পারেন না।

[ইত্তেফাক, ঢাকা, মঙ্গলবার, জুলাই ৬, ১৯৭৬]

যারা বলে সর্বক্ষেত্রে, সর্ব অবস্থায় এবং সর্ব আবহাওয়া ও পরিবেশেই একটা মাত্র নারী শুধু বিবাহ করা উচিত, তারা জ্ঞান-বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে আহম্মকের স্বর্গে বাস করে। এ স্বর্গের অধিবাসীরা নিজ নিজ জীবনের খতিয়ান নিলে এবং নির্ভুলভাবে দক্ষ অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা হিসাব করালে দেখতে পাবে যে যৌন-ক্ষুধা মেটানোর জন্য নিজের বয়সের কতগুণ নারীর সতীত্ব নাশ করে সাধু সেজেছে এবং বড় বড় বুলি দিয়ে ইসলামের বহু বিবাহকে নিন্দা করেছে।

পুরুষ যেমন বহু স্ত্রী বিবাহ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, মেয়েদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। তবু ইতিহাসের পাতায় এর কিছু প্রমাণ মেলে। হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায় যে, দ্রৌপদির পাঁচটি স্বামী ছিল। তিব্বতের ও সিংহলের মেয়েরা এখনও বহু স্বামীর পাণিগ্রহণ করে। এ ছাড়া দক্ষিণ ভারত, মিশর প্রভৃতি দেশে সব ভাই মিলে একটি নারীকে বিবাহ করে। নারীর স্বল্পতা ও দেশাচারভেদই এর কারণ।

ইউরোপীয়রা যদিও এক বিবাহের পক্ষপাতী তবুও এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকে না। যাকে যখন যার ভাল লাগে তার সঙ্গেই প্রেম গড়ে তোলে ও যৌন-কদাচার করে। সমাজের আইনকে তারা এ ব্যাপারে বিশেষ পরওয়া করে না। একটি মেয়ের বহু ছেলের সঙ্গে সঙ্গম করা দোষণীয় তো নয়ই বরং আত্মতৃপ্তির এক সুন্দর পন্থা বলেই তারা মনে করে।

কারণ ঃ বহু বিবাহের বহু কারণ থাকতে পারে।

১ম—কামুক পুরুষের স্বভাবজাত চরিত্র। এক নারীতে মন ভরে না।

২য়—পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। কোন কোন দেশের আবহাওয়া এমন যে, পুরুষ অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু মেয়েরা তদনুরূপ নয়।

৩য়—পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করে বাপ-দাদার নাম অক্ষুণ্ন রাখা।

৪র্থ—সাংসারিক ও আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল।

৫ম—বংশবৃদ্ধি ও প্রতিপত্তিশালী হবার বাসনা।

৬ষ্ঠ—রাজ্য ও ধন-সম্পত্তি পরকে না দেবার কল্পনা।

৭ম—অসহায়া বিধবাকে সাহায্য করা, ধনাঢ্য নারীর ধন-সম্পত্তি ভোগ করার লালসা ইত্যাদি।

প্রয়োজন ও ফলাফল ঃ যে দেশে নারীর সংখ্যা বেশি ও পুরুষের সংখ্যা কম সে দেশে বহু বিবাহ থাকতেই হয়, নইলে বহু নারীর জীবন অকেজো ও পঙ্গু হয়ে যায়। অনেক নারী বন্ধ্যা থাকে। তাদের পেটে সন্তান জন্মে না। এ ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহ প্রয়োজন। স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত কারণে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণে স্বামীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এমন ক্ষেত্রেও স্ত্রীর বর্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণের বিধান প্রায় জাতিই দিয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রেও বহুবিবাহ প্রয়োজন। তবে বহু বিবাহ সুখের চেয়ে দুঃখই বেশি টেনে আনে। পুরুষ যেমন চায় না তার স্ত্রীকে ভাগ করে অন্য লোক উপভোগ করুক, কোন মেয়েও তেমনি চায় না যে তার স্বামী অন্য মেয়েকে বিবাহ করে ভালবাসা বণ্টন করুক।

একা স্ত্রীকে ভোগ করার যেমন আনন্দ, একা স্বামীকে ভোগ করারও ঠিক তেমনি আনন্দ। তাই একাধিক স্ত্রী এক সংসারে থাকলে ঝগড়া, বিবাদ, হিংসা, বিদ্বেষ যে সব সময় লেগে থাকবে এতে কোন ভুল নেই। সাময়িক লোভে, কাম-প্রবৃত্তিকে উপশম করতে গিয়ে জীবনে নেমে আসে এক অভিশাপ। এ জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া একাধিক পত্নী রাখা শান্তির প্রতিকূল। ভারত, বাংলাদেশ, পারস্য প্রভৃতি দেশের মুসলমানগণ শতকরা ৯৮ জন এক-পত্নীক।

বহু বিবাহ অশান্তি ও দরিদ্রতা নিয়ে আসে। আমাদের নবী (দঃ) বহু বিবাহের ফলাফল জানতেন। তাই বহু বিবাহ একদম নিষিদ্ধ না করে চারটিতে সীমাবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ চারটি স্ত্রী একই সময়ে জীবিত থাকা অবস্থায় কোন মুসলমান এর সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। এ আইন আজও বলবৎ আছে এবং মুসলমানগণ এ আইনকেই অনুসরণ করে চলছে।

যেখানে পূর্বপুরুষ হতে অসংখ্য স্ত্রী, পালিতা দাসী ও নর্তকী দ্বারা পুরুষগণ আত্মতৃপ্তি লাভ করত সেখানে এক পত্নীতে আবদ্ধ হয়ে সংসার করবার মতো নিষ্ঠুর আদেশ হজরত দিতে পারেন না। দিলেও সে আদেশ তখন কেউ মনেপ্রাণে গ্রহণ করত না। যদিওবা করত তবুও চলত অলক্ষ্যে ব্যভিচার যা রোধ করা মোটেই সম্ভব হতো না। এছাড়া প্রয়োজনের তাগিদে যখন একের অধিক বিবাহ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ত, তখন এক-পত্নীক নিয়মকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। বর্তমানে হিন্দু সমাজে এর কুফল সম্যক দেখা যায়। অনেক মেয়ে চিরজীবন কুমারী থাকতে বাধ্য হয় অথবা চরিত্র হারিয়ে যৌন-ক্ষুধা মেটাতে সচেষ্ট হয়। খ্রীষ্টান জাতিরও ঐ একই অবস্থা। ধর্ম নেতা পাদ্রীগণ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পক্ষপাতী নন। অথচ খ্রীষ্টান-সমাজে ব্যভিচারের যে তাণ্ডবলীলা চলে তা অন্য জাতির মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না।

ন্যায়-নীতি ও পবিত্রতাই ইসলামের সৌন্দর্য। মানুষের জন্য যা প্রয়োজন, সমাজের জন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, হজরত সে ব্যবস্থা ও সে বিধিই আমাদের জন্য দিয়েছেন। যা প্রয়োজনের বাইরে, বিলাসিতার খাতিরে যা দৈনন্দিন জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে, জাতিতে-জাতিতে যা শত্রুতার সৃষ্টি করে তার ব্যবস্থা হজরত দেন নি। মানবসমাজ থেকে কুপ্রথা, অত্যাচার ও অবিচার দূর করাই ছিল হজরতের ব্রত।

নারীর জীবন নিয়ে পুরুষ ছিনিমিনি খেলত। বহু বিবাহ করে নারীদের যৌন-তৃষ্ণা মেটান তো দূরের কথা, কামুক ও স্বার্থবাদী পুরুষ তাদের খোরপোশের ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে অপারগ হতো। দাসী ও নর্তকীদের গর্ভে যে সব সন্তান জন্মলাভ করত সেগুলোকে নিজ সন্তান বলেও পরিচয় দিত না। কোটি কোটি জীবনে এখানেও আসত এক অভিশাপ। এজন্যই তিনি বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করে চারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যত কামুক পুরুষই হোক চারটি নারীকে একসঙ্গে ব্যবহার করলে তার মন অন্য নারীতে আকৃষ্ট হয় না বা বেশ্যালয়ে যেতে পারে না। চারটি নারীর মনের খোরাক জোটাতেই তার মন আবদ্ধ থাকে।

ইসলাম চারটি নারীকে একসঙ্গে বিবাহ করার বিধান দিয়েছে, তবে এর ওপর একটি পূর্ব শর্ত আরোপ করেছে। যদি কেউ বহু বিবাহ করে তার স্ত্রীদের সমানভাবে সন্তুষ্ট করতে না পারে, সমানভাবে সহবাস, সমভাবে জিনিসপত্র ও সমভাবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না করতেপারে তবে তার পক্ষে এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ইসলামের বিধান একাধারে যেমন সুন্দর ও সহজ, তেমনি কঠোর ও নীতিবাদ। যার বিবাহ করার ক্ষমতা নেই, যার পৌরুষের অভাব তাকে বিবাহের বিধান দেয় নি। হজরতের বাণী এর সাক্ষ্য প্রদান করে—"হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহাদের বিবাহ করা কর্তব্য। কারণ উহা দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং গুপ্তস্থানকে রক্ষা করে এবং যে ব্যক্তি অসমর্থ তাহার পক্ষে রোজা রাখা কর্তব্য—কারণ উহা তাহাকে সংযমী করিবে।"[১]

একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে অর্থাৎ সংসার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেখানে বিশেষ দরকার সেখানে পালিতা দাসী বা নিঃসহায়া নারীকে বিবাহ করতে বলা হয়েছে। কোরআনের নিম্নোক্ত বাণী তা প্রমাণ করে।

"এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, পিতৃহীনগণের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে নারীগণের মধ্য হইতে তোমাদের মনোমত দুটি তিনটি ও চারটিকে বিবাহ কর। কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ন্যায়বিচার করিতে পারিবে না তবে মাত্র একটি অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার অধিকারী। ইহা অবিচার না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।"[২]

১। হাদিস শায়খান। সংগৃহীত হাদিসের আলো। কৃত—পূর্বে বর্ণিত। বিবাহ পরিচ্ছেদ।

২। কোরআন ঃ সূরা নেসা, আয়াত ৩। সূরা নেসার প্রকৃত আয়াতটি এই ঃ ওয়া এন্ খেফ্তুম আল্লা তুকছেতু ফিল ইয়াতামা ফান্কিহু মা'তারা লাকুম মিন্না নেসায়ে মাস্না ওয়া ছুলাছা ওয়রা রুবায়া। ফা এন্ খেফতুম আল্লা তাদিলু ফাওয়াহিদাতান আওমা মালাকাত আইমানুকুম। জালেকা আদ্না আল্লা তাওলু।" [৪ ঃ ৩]

ওপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াতটির মধ্যাংশে বলা হয়েছে, 'মাসনা ওয়া ছালাছা ওয়া রুবায়া'—যার অর্থ দুটি ও তিনটি ও চারটি। এই শব্দ কয়টি নিয়ে বিভিন্ন তর্জমাকারীদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত আমরা দেখতে পাই। অনেকেই বলে থাকেন—দুটি, তিনটি ও চারটি এর যোগফল দাড়ায় ৯। অর্থাৎ ৯টি পর্যন্ত বিবাহ করা চলে।

হজরতের বহু বিবাহ ও তার কারণ

বিরাট একটি প্রশ্ন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি ও অন্যান্য জাতির মাথায় দোল খায়। মুসলমানগণ যাঁরা জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও প্রকৃত বিশ্বাসী তাঁরা হজরতের চরিত্রকে নিখুঁত ভাবে পর্যালোচনা করেছেন এবং দেখেছেন যে বৃহত্তর মঙ্গল ও জাতীয় স্বার্থেই তিনি বহু বিবাহ করেছেন। অন্যথায় এ সব বিবাহের তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। যাঁরা বলে থাকেন যে হজরত কামস্পৃহা চরিতার্থেই এসব বিবাহ করেছেন তাঁদের এ সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকু থাকা একান্তই প্রয়োজন যে, বিবি খাদিজা বেঁচে থাকা অবস্থায় হজরত দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। বিবি খাদিজার যখন মৃত্যু হয়, তখন হজরতের বয়স পঞ্চাশ বছর। মাত্র ২৫ (পঁচিশ) বছর বয়সের সুন্দর সুশ্রী যুবক চল্লিশ বছর বয়স্কা বিধবা রমণীকে বিবাহ করেন। ধনাঢ্যা, সুন্দরী ও অভিজাত তরুণী মেয়ের অভাব ছিল না—যারা হজরতের পাণিগ্রহণে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। তবু কেন সুদীর্ঘ ২৫টি বছর ভরা-যৌবন নিয়ে খাদিজার সঙ্গে খুশি মনে সংসার করেছেন? সংযমের এমন মহান ইতিহাস কয়জন মনীষী দেখিয়েছেন—যে যুগে বহু বিবাহ প্রথা একটা ছোঁয়াচে রোগের মতো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল? বৃদ্ধ প্রায় ৫০ বছরের একজন মহামানব কেনইবা আবার সাত বছর বয়স্কা আয়েশাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন? এক নাবালিকা মেয়ে হজরতের মনের খোরাক জোটানোর জন্য কি যথেষ্ট ছিল? কাম-প্রবৃত্তির দংশনে যদি হজরত পীড়িত হতেন, তবে কি সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী ষোড়শী যুবতীর জন্য লালায়িত হতেন না? তাই কি হয়েছিলেন? কন্যা, নাতিনীর চেয়ে যার বয়স কম সেই অবুঝ এক নাবালিকা কি তার সহধর্মিণী হবার উপযুক্তা? এসব বিচার কি কেউ কোনদিন করেছেন? কেউ কি কোন সময় ভেবে দেখেছেন যে কেন এক বৃদ্ধা নারীকেই বা বিবাহ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন? এ সব বিবাহের পেছনে কি তাঁর যৌন-প্রবৃত্তিই প্রধান কারণ ছিল? হিংসুক মনের বিদ্বেষসুলভ আচরণকারী ব্যতীত হজরতের বহু বিবাহকে কেউ কোনদিন অনর্থক বা

আবার এক শ্রেণীর বিশ্লেষণকারীর মত, দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার অর্থাৎ ২ + ২ + ৩ + ৩ + ৪ + ৪ = ১৮। অর্থাৎ ১৮টি পর্যন্ত বিবাহ চলে।

কোরআনে দুটি অথবা তিনটি অথবা চারটি না বলে দুটি, তিনটি ও চারটি বিবাহ কর বলা হয়েছে। কেন 'ওয়' যোগে কয়েকটি শব্দ একত্রিত করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে অক্ষম। আর অক্ষম বলেই যিনি বোঝেন তাঁকে অনুসরণ করা উচিত। এ বাণী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ওপর অবতীর্ণ হবার পর আরবে যে জমাট বাঁধা পূর্ণ অন্ধকার বিরাজ করছিল তার অবসান ঘটল। এক বিবাহের দুর্ভেদ্য প্রাচীর যেমন অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল বহু বিবাহের অদম্য স্রোতও তেমনি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নির্দিষ্ট একটি সীমায় অবরুদ্ধ হয়ে রইল। আর সে সীমা নির্ধারণ করে দিলেন মানবজাতির বন্ধু হজরত মুহাম্মদ (দঃ) মাত্র চারটিতে। এটাই শেষ সীমা। দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বিস্তৃত এক সোনালী রেখা। তাই অবুঝেরা এখানে বুঝে নিন ও সীমাবদ্ধ হোন—চারটি স্ত্রীতে যদি একান্তই সখ হয়। ৯টি বা ১৮টিতে নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যৌন-লিপ্সাহেতু বলে প্রচার করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, একমাত্র এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, নিঠুর, কঠোর, প্রেমহীন, দয়াহীন, মায়াহীন ও আকর্ষণহীন হৃদয় তাঁর ছিল না। নারীর ভালবাসা, প্রেমের বন্ধন, মায়ার ডোর ও যৌবনের সৌন্দর্য তাঁর মনে ও দেহে সবার চাইতেই বেশি ছিল। তাই সংসার ভালবাসতেন, নারীর সাহচর্য পছন্দ করতেন, আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি মাহাত্ম্য যৌন-আকর্ষণের মাধ্যমেই ভোগ করে তাঁর কাছে মাথা নত করে শুকুর আদায় করতেন। শত শত নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে তাদের মানসিক কষ্ট দেন নি। তাদের ওপর জুলুম অত্যাচার করে পূর্বের ক্ষমতাশীল রাজা-বাদশার মতো নিষ্ঠুর আচরণও দেখান নি। পত্নীদের মধ্যে কেউ ভুলে অথবা নির্ভুলে হজরতের ওপর বিরাগভাজন হন নি। একটি স্ত্রীও যদি তাঁকে ত্যাগ করে অন্যের দ্বারস্থ হতেন তবে বলা যেত যে বহু বিবাহ তাঁর সার্থক হয় নি। বহু বিবাহের মাধ্যমেও যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়, বিভিন্ন গোত্রের, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন মানসিক পরিবেশে সৃষ্ট নারী নিয়েও যে উদার মনোভাবের ভিত্তিতে সংসার গড়া যায়—বিভিন্ন চরিত্রের নারীর মাধ্যমেও যে প্রেম-প্রীতির বীজ বপন করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায় হজরত তার এক অপূর্ব নিদর্শন।

এবার চলুন আমরা দেখি হজরত কোন্ সময় কোন্ ধরনের নারীকে বিবাহ করেছিলেন।

পত্নীদের নাম		কুমারী না বিধবা	হজরতের বয়স
১।	খাদিজা	বিধবা	২৫ বছর
২।	সওদা	"	৫১ "
৩।	আয়েশা	কুমারী	৫২ "
৪।	হাফসা	বিধবা	৫৪ "
৫।	জয়নব বিন্‌তে খোজাইমা	"	৫৫ "
৬।	উম্মে সালমা	"	৫৫ "
৭।	জয়নব (যায়েদের পরিত্যক্তা স্ত্রী)	"	৫৬ "
৮।	জওয়ায়েরা (বনি মোত্তালিব গোত্র)	"	৫৬ "
৯।	রায়হানা (ইহুদিনী)	"	৫৭ "
১০।	মেরী (খ্রীষ্টান)	"	৫৭ "
১১।	সফিয়া (ইহুদিনী)	"	৫৭ "
১২।	উম্মে হাবিবা	"	৫৮ "
১৩।	মায়মুনা	"	৫৯ "

(১) খাদিজাকে বিবাহের কারণ ঃ

হজরতের জীবন-চরিত যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা জানেন যে, ভদ্র বংশজাত দরিদ্র এ অনাথ যুবক ধনাঢ্যা রমণী, বিধবা খাদিজার সংসার চালনার ভার নেন। তাঁর চরিত্রের মহান বৈশিষ্ট্যে বিবি খাদিজা অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে একমাত্র মুহাম্মদ (দঃ)-ই এ বিশাল ধন-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম। মুহাম্মদ (দঃ)-এর হাতে সংসার তুলে দিতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

প্রথম বারের ব্যবসাতেই হজরত প্রচুর অর্থ লাভ করেন এবং বিবি খাদিজাকে পাই-ক্রান্তি পর্যন্ত নির্ভুল হিসাব দেন। হজরতের অমায়িক ব্যবহার, সরলতা, সত্যবাদিতা, খোদাভক্তি ও দেহের রূপলাবণ্য বিবি খাদিজাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। তিনি হয়তো বুঝেছিলেন যে, এ যুবক সাধারণ যুবক নন। তাঁর দৃষ্টিতে হয়তো এটাই ধরা পড়েছিল যে বেহেশ্‌তের এক আলোক মশাল একদিন সারা বিশ্বকে আলোকিত করে তাঁর গৃহকে ধন্য করবে ও তাঁকে আজীবন অমর করে রাখবে।

হজরত নিজেও তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হয়তো এটাই দেখেছিলেন যে বিধবা এক প্রৌঢ়া নারীকে নিয়ে জীবন শুরু না করলে হয়তো ভবিষ্যতে আল্লাহর প্রেমে বাধা আসতে পারে। ধনের অভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হয়তো তাঁর মহান ব্যক্তিত্বে আঘাত আসতে পারে। ভরা-যৌবনা নারীর প্রেমে পড়ে বিশ্বপ্রেমে ভাঙন ধরতে পারে। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর উন্মাদনার সোনার যৌবন সঁপে দিলেন খাদিজার বুকে।

সর্বপ্রথম যিনি হজরতকে আল্লাহর নবী বলে বিশ্বাস করলেন তিনিই হলেন মা খাদিজা (আল্লাহ্ তাঁর ওপর শান্তি বর্ষণ করুন)। অভয় বাণী শুনিয়ে যিনি আশ্বস্ত করলেন হজরতের প্রাণকে, যিনি প্রেরণা দিলেন সুখে-দুঃখে ছায়ার ন্যায়, যিনি এ বিশ্বনবীর সঙ্গিনী হলেন তিনি বিধবা নারী খাদিজা। ইসলামের বিজয়কেতন দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবার তরে যিনি ধনদৌলত হজরতের পায়ে সঁপে দিলেন তিনি আর কেউ নন এই বিধবা ধনাঢ্যা নারী। এ অভিপ্রায় আল্লাহরই এক মহান অভিপ্রায়। তাই বিবি খাদিজাকে নিয়ে তাঁর জীবন হয়েছিল সুন্দর ও সুখের। এ সুন্দরের ছোঁয়াই পরিশেষে লাগল বিশ্বমানবের হৃদয়তন্ত্রে।

(২) হজরত আয়েশার সাথে বিবাহের কারণ ঃ

একথা সবাই জানেন যে নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হজরত খাদিজা ও পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হজরত আবুবকর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস হজরতকে যেমনভাবে চিনেছিলেন, ইসলামের জন্য যেমন ধনদৌলত উজাড় করে দিয়েছিলেন, এমনি করে আর কেউ দিতে পারেন নি। হজরতকে একান্ত আপন করে, আত্মীয়তার বন্ধনে কাছে টেনে নিয়ে বিশ্বমানবের অন্তরে যুগ যুগ ধরে ঠাঁই পাবেন এটাই ছিল তাঁর পরম কাম্য। তাই নাবালিকা মেয়ে আয়েশার পাণিগ্রহণ করতে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন হজরতের পায়ে। দূরদর্শী হজরত এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। যে আবুবকর হজরতকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুর ভয়ে গৃহত্যাগ করলেন, পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় যিনি নাগিনীর ছোবল খেয়েও হজরতকে বুকে জড়িয়ে রাখলেন, দুর্গমগিরি পাড়ি দিয়ে যিনি হজরতকে সঙ্গে নিয়ে মদিনা পৌছালেন, রাতে-দিনে, সুখে-দুঃখে যিনি হজরতের সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অনুগামী হয়ে ইসলাম প্রচার করলেন—তাঁর অনুরোধ হজরত কিভাবে উপেক্ষা করেন? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, মানবতা ও মহা উদারতার খাতিরেই তিনি নাবালিকা আয়শাকে বিবাহ করতে বাধ্য হলেন। এ বিবাহের প্রয়োজন ছিল। ইসলামকে জীবিত রাখার জন্য ঐ সময় হজরত আয়েশার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আবুবকর যেমন করে নবীজীকে চিনেছিলেন, হজরত আয়েশা তার চেয়েও অনেক বেশি করে চিনেছিলেন। হজরতের অন্তর-বাহির ও দেহ-মন আয়েশার নিকট যেমন পরিচিত ছিল অন্য কারো কাছেই ততটুকু ছিল না। পরবর্তী যুগে আমরা হজরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়েশার নিকট নবীজীর যে পরিচয় পেয়েছি তা অন্য কোন সাহাবার নিকট হতেই পাই নি। অসাধারণ স্মরণশক্তি সম্পন্না এই মহতী নারী কয়েক লক্ষ হাদিস জানতেন যা আমাদের জন্য ছিল অতীব প্রয়োজন। এ বিবাহ হজরতের দূরদৃষ্টি ও মহানুভবতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

(৩) হাফসাকে বিবাহের কারণ ঃ

ইসলামের গৌরবমুকুট হজরত ওমরের কন্যা ছিলেন হাফসা। প্রথমে তাঁর বিবাহ হয়েছিল খোনাইস ইবনে হোযাইফার সঙ্গে। বদর যুদ্ধে খোনাইস গুরুতররূপে আহত হয়ে শহিদ হন। হজরত হাফসা নিঃসন্তান ছিলেন। প্রিয়তমা কন্যাকে নিয়ে হজরত ওমর অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ সময় হজরত ওসমানের স্ত্রী জীবিত না থাকায় তিনি ইচ্ছা করেই হজরত ওসমানের নিকট তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তাব পাঠালেন; কিন্তু ওমরের প্রস্তাবে হজরত ওসমান সাড়া দিলেন না। কেননা হাফসা অত্যন্ত তেজস্বিনী ও মুখরা ছিলেন। এতে তিনি দুঃখিত হয়ে হজরত আবুবকরের নিকট আবার প্রস্তাব পাঠালেন তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে। হজরত আবুবকরও এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। হজরত ওমর অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে তাঁর মর্মবেদনার কথা রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট পেশ করলেন এবং তাঁকে মর্মবেদনার কথা রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট পেশ করলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন হাফসাকে গ্রহণ করতে। হজরত এ প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং হাফসাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন।

(৪) ও (৫) সওদা ও মায়মুনাকে বিবাহের কারণ ঃ

হজরত সওদা ও মায়মুনা ছিলেন বিখ্যাত মুসলিম খলিফা হজরত ওসমানের ভগ্নি ও বীরবর খালেদের খালা। তাঁদের বিশেষ অনুরোধক্রমে হজরত রাজি হলেন তাঁদের পত্নীরূপে গ্রহণ করতে। গোত্রে-গোত্রে মিলন ও হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে একসূত্রে সবাইকে গেঁথে দেবার এক পরিকল্পনা নিয়েই তিনি হজরত আবুবকরের কন্যা, ওমরের কন্যা, ওসমানের ভগ্নি ও বীরবর খালেদের খালাকে আপন পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজ কন্যা ফাতিমাকে হজরত আলীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সর্বযুগের সর্বদেশের জ্ঞানী ব্যক্তিরাই একবাক্যে স্বীকার করতে রাজি। ইসলামের যে স্বর্ণযুগ হজরতের পরে রচিত হয়েছিল তা এসব মহামনীষীদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, চরিত্র, অসাধারণ ধৈর্যশক্তি ও মহামিলনের কারণেই এদের মধ্যে যদি আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে না উঠত তাহলে আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন যে হজরতের পরে তাদের মধ্যে কি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো, আর ইসলামেরই বা কি পরিণতি হতো!

(৬) উম্মে হাবিবার সঙ্গে বিবাহের কারণ ঃ

উম্মে হাবিবা ছিলেন আবু সুফিয়ানের কন্যা। প্রথমে তাঁর বিবাহ হয় ওবায়েদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ইসলাম গ্রহণ করে হাবসাতে গমন করেন। আবিসিনিয়াতে ক্রমে ওবায়েদুল্লাহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পরে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন; কিন্তু অটল বিশ্বাসিনী উম্মে হাবিবা ইসলাম ধর্মেই থেকে যান। স্বামী অন্য ধর্মে দীক্ষিত হলে ইসলামের বিধান অনুযায়ী বিবাহবন্ধন ছুটে যায়। এ সময় উম্মে হাবিবা চরম দুর্দিনের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। এ করুণ অবস্থার কথা শুনে হজরতের প্রাণ কেঁদে ওঠে।

তিন সহ্য করতে না পেরে ওমর ইবনে উমাইয়া মুয়াবীকে নাসাকীর নিকট পাঠালেন এই বলে যে উম্মে হাবিবাকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করবেন। নাসাকী তাঁর বাঁদী আবরাহাকে উক্ত প্রস্তাবসহ উম্মে হাবিবার নিকট পাঠালেন। অসহায়া বিধবা উম্মে হাবিবা এ প্রস্তাব শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন এবং নিজ হাতের সোনার বালা ও আংটি খুলে বাঁদীকে উপহার দিলেন। নাসাকী উম্মে হাবিবার কথা শুনে বিবাহের আয়োজন করলেন। চারশ' স্বর্ণমুদ্রা মহরানা হিসাবে ধার্য হলো যা পরিশোধ করলেন নাসাকী নিজেই। স্বামী পরিত্যক্তা উম্মে হাবিবা শুধুমাত্র তাঁর ঈমানের বলেই হজরতের হৃদয় জয় করলেন।

এ বিবাহে যে কি মঙ্গল হয়েছিল ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদ পণ্ডিত মাত্রই তা জানেন। মহাবীর আবু সুফিয়ান হজরতের মহানুভবতা, উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার কাছে মাথা নত করে শত্রু ধ্বংসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তাঁর হাতে কত অবিশ্বাসী ও মুনাফেকের যে পতন ঘটল তার ইয়ত্তা নেই। শের আলী, মহাবীর খালেদ ও মহাযোদ্ধা আবু সুফিয়ানকে করায়ত্ত করে হজরত শুধু রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই পরিচয় দিলেন না, সারা বিশ্বে ইসলামের অপূর্ব মহিমা ঘোষণা করে মক্কা বিজয়ের পথ সুগম করলেন।

(৭) জয়নবকে বিবাহের কারণ ঃ

জয়নবের প্রথম বিবাহ হয়েছিল হজরতের পালিত পুত্র যায়েদের সঙ্গে। বিবাহের পর থেকেই তিনি যায়েদকে ভালবাসতে পারেন নি। সব সময় ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। তাদের সংসার হয়ে উঠল অশান্তিময়। যায়েদ শেষে বাধ্য হয়ে জয়নবকে পরিত্যাগ করলেন। জয়নবের বিবাহের কোন বন্দোবস্ত করা গেল না। কেননা সবাই জানত জয়নবের স্বভাব চরিত্রের কথা। এদিকে জয়নবকে নিয়ে হজরত পড়লেন এক বিপদে। যায়েদকে যেমন পালিত পুত্র হিসাবে প্রতিপালন করেছিলেন, জয়নবকেও বাঁদীরূপে তিনি প্রতিপালন করেছিলেন। অসহায়া এতিম ও বিধবাদের প্রতি তাঁর করুণার শেষ ছিল না। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পরিবেশে তাঁকে বাধ্য হয়ে অনেকেরই পাণিগ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু জয়নবকে তিনি কি করে বিবাহ করেন। একে তো আপন বাঁদী তার ওপর আবার পালিত পুত্রের পরিত্যক্তা স্ত্রী।

ঐ সময় আরবে কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। ধর্ম-ভাই, ধর্ম-বোন, ধর্ম-বাবা ও ধর্ম-মা সম্বন্ধ স্থাপন করে আত্মীয়তা গড়ে তুলত। রক্ত-সম্বন্ধের মতোই ঐ সম্বন্ধকে তারা পবিত্র মনে করত। তাই বিবাহ ব্যাপারেও এ সম্বন্ধকে অটুট রেখে এক অনর্থ কাণ্ড ঘটাত। এ কুসংস্কারের জালে পড়ে অনেকেই ইচ্ছামতো বিবাহ করতে পারত না। হজরত দেখলেন যুগে যুগে এবং দেশ-দেশান্তরে এ প্রথা বিদ্যমান আছে এবং থাকবে। এর অবসান একান্তই দরকার।

আপন পালিত পুত্রের স্ত্রী জয়নবকে যদিও কুসংস্কার ভেদ করে বিবাহ করা চলে তবুও এক জটিল বাধা যেন সম্মুখে এসে জট্‌লা বেধে বসল। জনসম্মুখে তাকে নিন্দনীয় হতে হবে একথাই হয়তো তাঁর মনে দোলা দিচ্ছিল। আল্লাহ্ পাক সব জ্ঞাত। মানুষের মনের মাঝে তিনি বিচরণ করেন। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা যেমন তাঁর আছে তেমনি একে সংস্কার করার মতো ক্ষমতাও আছে। ভয়, ভীতি ও উচ্ছ্বাসে যেমন ভরে দিতে পারেন তেমনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

আনন্দ, উল্লাস ও প্রশান্তিতেও ভরে দিতে পারেন এ মন। হজরতের দ্বিধা ও সংকোচ তাঁর মনে রাখবেন কেন? তাই আল্লাহ্ অভয় বাণী ঘোষণা করলেন—

"তুমি অন্তরে যে কথা গোপন করিতেছ, আল্লাহ্ তাঁহা প্রকাশ করিয়া দিবেন। এই ব্যাপারে তুমি মানুষকে ভয় করিতেছ। কিন্তু একমাত্র আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে সমীচীন।" (৩৩ ঃ ৫)

জয়নবের এমন কোন আশ্রয় ছিল না যে বিবাহ না হলে তার বাঁচবার অন্য কোন উপায় থাকে। দয়াশীল হজরত দেখলেন যে, এ মেয়েকে তিনি স্বয়ং বিবাহ না করলে আর কেউ তাকে বিবাহ করবে না। এছাড়া দুনিয়ার বুকে তাকে এমন এক নিদর্শন রেখে যেতে হবে যে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যেন অনাথা, এতিম ও দুঃস্থা বিধবা মেয়েদের ঘৃণার চোখে না দেখে। তাই তিনি নিন্দা ও অনাদরের মাথায় কুঠারাঘাত করে জয়নবকে বিবাহ করলেন ও আল্লাহর নির্দেশ পালন করলেন।

যে যুগে পালিত পুত্র ও নিজ ঔরসজাত পুত্র একই মর্যাদার অধিকারী হতো, যে যুগের কুসংস্কার মহাসত্যকেও নির্বিঘ্নে চাপা দিয়ে রাখত, সে যুগে শুধু সত্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে হজরত এমন কঠিন ব্রত অবলম্বন করেন এবং নিষ্ঠুর ভাবে চিরাচরিত কুসংস্কারের মস্তক চূর্ণ করে জয়নবকে বিবাহ করবেন—এ ধারণা কেউ করতে পারে নি। অজানা, অচেনা ও অসম্ভবকে তিনি যে দুর্জয় সাহস নিয়ে জানা, চেনা ও সম্ভাবনার দ্বারে পৌছাবেন তা সত্যি অদ্ভুত, সত্যি মনোরম।

(৮) জওয়ায়েরার সঙ্গে বিবাহের কারণ ঃ

বনি মোস্তালেব যুদ্ধে হজরত জওয়ায়েরা মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তাঁর পিতা ছিলেন আরবের খ্যাতনামা একজন সর্দার। স্বামী এবং পিতা হারেস দুজনেই যুদ্ধে নিহত হন। বন্দীদের যখন দাসদাসী হিসাবে সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় তখন হজরত জওয়ায়েরা হজরত সাবেতের ভাগে পড়েন। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নারী দাসী বৃত্তি করবে এ কল্পনা করতেও যেন তাঁর হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল। এ সময় আরবে প্রথা ছিল—মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হতো। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না নারী হজরত জওয়ায়েরা হজরত সাবেতকে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাঁকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। হজরত সাবেত এ প্রস্তাবে রাজি হলেন। কিন্তু মুক্তিপণের অর্থ তিনি কার কাছে পাবেন? চুক্তিপত্র সম্পন্ন করে তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট গমন করলেন এবং এই বলে নিবেদন করলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ আমি একজন কালেমা পাঠকারিণী মুসলিম নারী। আমার নাম জওয়ায়েরা। গোত্রপতি হারেস আমার পিতা। আমি যে ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি তা আপনার অজানা নয়। সাবেত ইবনে কায়েসের ভাগে আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমি তাঁর সাথে উনিশ আওয়াক্কিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে মুক্ত হবার শর্ত করে নিয়েছি। কিন্তু এই অর্থ প্রদান করার মতো কোন সামর্থ্য আমার নেই। সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর করে আমি এই বন্দোবস্ত করে এসেছি। আপনার নিকট সেই প্রার্থনা নিয়েই হাজির হয়েছি।"[১]

১। সিরাতুন্নবী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১২।

রসুলুল্লাহ (দঃ) জওয়ায়েরার এ প্রার্থনা উপেক্ষা করতে পারলেন না। বন্দিনী একটা নারীর অসহ্য বেদনা তাঁর বুকে শেলের মতো বিঁধে গেল। প্রেমের পরশে নয়, স্বার্থের খাতিরে নয়, রূপের মোহে নয়, ধনদৌলতের আশাতেও নয়, বন্দিনী, কুশলিনী এ নারীকে মর্যাদা দিতেই তিনি মুক্তিপণ পরিশোধ করলেন এবং তাঁর অনুরোধক্রমেই পত্নীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

বিশ্বের আশীর্বাদক, নারীজাতির ত্রাণকর্তা, সুখ-দুঃখের অংশীদার, ধর্মের অবতার, মানবের পরম বন্ধু এ বিশ্বপ্রেমিক হজরত মুহাম্মদ (দঃ)। কার সাথে তাঁর তুলনা চলে? কোন্ হিংসুক পাষণ্ড তাঁর এ মহান চরিত্রে আঘাত দিয়ে সুখ পেতে চায়? দেখুন, হজরতের এ উদারতার ফলে মুসলিম গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল কি না, বিজাতির মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কি না, বন্দীরা মুক্তি পেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল কি না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন জওয়ায়েরাকে বিবাহ করেছিলেন তখন সাহাবীরা সমস্ত যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দিলেন। সাহাবীরা বললেন, 'যে বংশে হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বিবাহ করেছেন, সে বংশের লোক আর দাস থাকতে পারে না।'[২]

(৯) সফিয়ার সঙ্গে বিবাহের কারণ ঃ

যে কারণে হজরত জওয়ায়েরাকে বিবাহ করেছিলেন ঠিক অনুরূপ কারণেই তিনি ইহুদিনী নারী সফিয়াকে বিবাহ করেছিলেন। সফিয়ার মর্যাদা রক্ষাই ছিল এ বিবাহের প্রধান কারণ। এছাড়া রাজনৈতিক কারণও এর মূলে নিহিত ছিল।

হজরত সফিয়া ছিলেন নাজির গোত্রের দলপতি কবীর পুত্র কিনানার স্ত্রী। স্বামীসহ যুদ্ধে তাঁর বংশের সবাই নিহত হয়। বিশিষ্ট রূপ ও মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন এ বিধবা মহিলা। যুদ্ধে তিনি বন্দিনীরূপে মুসলমানদের হাতে আসেন।

একদা দাহরিয়া কাসরি এ বাঁদীর জন্য হজরতের নিকট প্রার্থনা করলেন। হজরত সফিয়াকে তাঁর জন্য মনোনীত করলেন। অনেকের মতে, হজরত সফিয়া এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ হতে এ তথ্য আমরা জানতে পারি।

মুহাদ্দিস মায়াবী বলেছেন, "যেহেতু তিনি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারিণী এবং ইহুদিদের দলপতির কন্যা ছিলেন, এ কারণে অন্য কারো অধিকারে যাওয়া তাঁর পক্ষে অপমানজনক ছিল।" [১] সফিয়ার মতো একজন বিশিষ্টা নারীকে সাধারণ এক যোদ্ধার হাতে তুলে দেওয়াতে অনেক সাহাবীও আপত্তি জানিয়েছিলেন। একজন হজরতকে বললেন—"হে আল্লাহর নবী, হুয়াই-তনয়া সফিয়াকে পইয়ার হস্তে সোপর্দ করলেন অথচ তিনি বুরাইয়া ও নাজির গোত্রের নেতৃস্থানীয়া। আপনি ব্যতীত অপর কেউই তার পক্ষে শোভনীয় নহে।

[সঃ মুসলিম, ২য় খণ্ড]

অনেকের মতে, আবতাবের পুত্র হুয়াই-তনয়া সফিয়ার রূপ বর্ণনা করলে সাহাবীরা তা সহ্য করতে পারলেন না, তাঁরা নবীজীকে এ কথা বললেন এবং সফিয়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ

২। সিরাতুন্নবী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৬।
১। আবু দাউদ—সিরাতুন্নবী, ২য় খণ্ড।

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে তাঁর মর্যাদা রক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। হজরত দেখলেন, সফিয়াকে তিনি গ্রহণ না করলে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাবার সম্ভাবনা—কেননা সফিয়াকে পাবার আশা সবাই করেছিল। এছাড়া জাত-শত্রু ইহুদিদের বশে আনবার এটা একটা ওষুধ। বিভিন্ন দিক দিয়ে বিবেচনা করেই তিনি সফিয়াকে বিবাহ করতে বাধ্য হলেন। খায়বার যুদ্ধে শস্যের অংশ সমান দু'ভাগে ভাগ করে দেওয়া দেখে, হজরতের ন্যায়বিচার ও বদান্যতা দেখে, যুদ্ধবন্দিনীদের ওপর করুণার হৃদয় দেখে, জনৈক ইহুদি পণ্ডিত বলেছিলেন, "এরূপ সুবিচারের কারণেই আকাশ ও পৃথিবী স্ব স্ব স্থানে স্থির রয়েছে।"

[সিরাতুন্নবী ঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৭]

(১০) রায়হানাকে বিবাহের কারণ ঃ

হজরত রায়হানা ছিলেন ইহুদি মহিলা। বনি কোরাইয়ার বন্দিনীদের মধ্যে অন্যতম।

রায়হানা সম্বন্ধে খ্রীস্টানেরা জঘন্য মতবাদ প্রচার করে হজরতের চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যারা রায়হানার বিবৃতি নিয়েছে তারা একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, হজরত রায়হানাকে মুক্তি দিয়ে তাঁরই অনুরোধক্রমে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নইলে একজন ইহুদি রমণীকে কোন প্রকৃতির বশে বিবাহ করার কোন কারণই ছিল না। কেননা, তাঁর চেয়ে সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, অল্পবয়স্কা ও মর্যাদাসম্পন্না পত্নী হজরতের ছিল। খ্রীষ্টানদের অবাঞ্ছিত কথার প্রতিবাদ করতেই তাই রায়হানা নিজেই বলেছেন—"হজরত (দঃ) আমাকে মুক্ত করিয়া দেন এবং পরে বিবাহ করেন।"

[ইবনে সাদ ওয়াকেফী হতে বর্ণিত]

হজরতের সাথে রায়হানার বিবাহ সম্বন্ধে ভিন্ন মতবাদও আছে। ইবনে ইসাহাক, ওয়াকেফী ও ইমাম যোহরীর মতে, হজরত রায়হানাকে বিবাহ করেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেন—"রায়হানাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি গৃহে ফিরিয়া মর্যাদার সাথে সংসার করেন।" [হাফেজ ইবনে মানদা তাবকাতে সাহাবা]

শেষোক্ত মন্তব্যটি ঠিক নয়। হজরতের সঙ্গে রায়হানার বিবাহ হয়েছিল এটাই সত্য। ঐতিহাসিকেরা সেটাই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। রায়হানাকে বিবাহ করে হজরতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় নি। বরং অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মর্যাদাশীলা নারীর মান-ইজ্জত রক্ষা করে হজরত ইহুদি জাতিকেও আপন করে নিতে চেষ্টা করেছেন। জাতিতে-জাতিতে বৈষম্যের অবসান ঘটিয়েছেন, ইহুদিদের বশে এনে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন এবং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের এক অপূর্ব নিদর্শন দেখিয়েছেন। অন্য ধর্মের কোন মহামণীষীই বিভিন্ন বিজাতিকে বিবাহ করে সমসূত্রে গেঁথে এমন অপূর্ব ইতিহাস রচনা করেন নি। যাঁরা হয়তো করেছেন, তাঁরা হয়তোবা নিজ প্রবৃত্তির বশেই করেছেন, বৃহত্তর মানব স্বার্থে করেন নি। সারা বিশ্বের মানুষকে নিয়ে এক পরিবার গঠন করাই যে হজরতের উদ্দেশ্য ছিল, তার প্রমাণ খ্রীষ্টান-বিধবা নারী মেরীকে বিবাহ করা। দেখুন তার কি কারণ ছিল।

(১১) মেরীর সঙ্গে বিবাহের কারণ ঃ

হজরতের বয়স যখন ৫৭ বছর তখন তিনি এ খ্রীষ্টান বিধবা নারী মেরীকে বিবাহ করেন। মেরী ইচ্ছাকৃতভাবেই হজরতের পাণি প্রার্থনা করেন। এ খ্রীষ্টান নারী মেরীকে বিবাহ করেই তিনি খ্রীষ্টানদের জয় করেন। হজরতের এ উদারতায় ইসলামের চিরশত্রু ইহুদি ও

খ্রীষ্টানগণ দলে দলে মুসলমান হয়। এ বিবাহে হজরতের অন্য কোন স্বার্থ ছিল না। ছিল ইসলামের জন্য এক জ্বলন্ত ইতিহাস রচনা করা। যা যুগ যুগ ধরে বিশ্বের মানবগোষ্ঠী স্মরণ করবে। তিনি সত্যই যে বিশ্বনবী ছিলেন, সমগ্র বিশ্বের মানব সম্প্রদায় যে একান্নভুক্ত পরিবার, এটা প্রমাণ করতেই তিনি এসব বিজাতীয় ছেলেমেয়েদের আপন কোলে অতি সোহাগ ও আদরভরে তুলে নিয়েছেন।

মেরীকে তিনি পেয়েছিলেন যৌতুক হিসাবে মিশরের রোমান শাসনকর্তা সুকাউকিসের নিকট হতে। হজরত যখন দিকে দিকে ইসলামের অভয়বাণী নিয়ে দূত পাঠালেন, তখন রোমান শাসনকর্তা বাদ পড়লেন না। সুকাউকিস যদিও প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন নি, তবুও ইসলাম প্রবর্তক হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে আল্লাহর নবী এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে একটুও কার্পণ্য করেন নি। এজন্য সত্যি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। কেমন সুন্দরভাবে তিনি হজরতের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, তার কাছে আত্মনিবেদন করে কৃতার্থ হয়েছেন, 'মেরী-উপহার' তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুধু একটি সুন্দরী নারী দিয়েই নয়, এমন উপঢৌকন দিয়ে দূতকে বিদায় দিলেন যে ঐ যুগে এমন সম্মান আর কোন দূতের ভাগ্যেই হয় নি।

'মেরী-শিরী' দু'জন অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া উচ্চমর্যাদা সম্পন্না খ্রীষ্টান মহিলা ও দুষ্প্রাপ্য একটি শ্বেত অশ্ব হজরতকে তিনি পাঠালেন। মহাজ্ঞানী হজরত তাঁর এ উপহার প্রত্যাখ্যান করেন নি। সুকাউকিসের পত্রোত্তর ও উপঢৌকন সানন্দে গ্রহণ করলেন। ইতিপূর্বে হজরত বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধর্মের ও গোত্রের নারীদের বিবাহ করেছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্টান নারীকে গ্রহণ করার সুযোগ পান নি। এবার তিনি মেরীকে বিবাহ করে বৃহৎ খ্রীষ্টান জাতির সঙ্গেও রক্তের সম্পর্ক স্থাপনের এক সুযোগ লাভ করলেন। বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সার্বজনীন প্রীতি ও প্রেমের এক অপূর্ব নিদর্শন রেখে দিতেই তিনি তাই শিরীকে কবি হাসানের সঙ্গে বিবাহ দিলেন এবং নিজে মেরীকে বিবাহ করলেন। উদারতার এমন নিদর্শন বিশ্ব ইতিহাসের বুকে আর নেই।

(১২) দ্বিতীয়া জয়নবকে বিবাহের কারণ ঃ

ইসলামের যখন মহাবিজয় সূচিত হয়েছে, দিকে দিকে যখন ইসলামের সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়েছে, তখন বীর মুজাহিদ শহিদ, জ্ঞানী, গুণী ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদদের সঙ্গে হজরতের উদার মনোভাব ও আত্মীয়তার বন্ধন যে নিতান্তই প্রয়োজন ছিল সেকথা কোন চিন্তাশীল মনীষীই অস্বীকার করতে পারেন না। তাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হজরত ইসলামকে চিরজাগ্রত করতে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন, সন্তুষ্ট করেছেন। এমনকি বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়; যুদ্ধে শাহাদতপ্রাপ্ত বীরদের বিধবা নারীদের কেন্দ্র করে পূর্বে যেমন War babies অর্থাৎ জারজ সন্তানদের সৃষ্টি হতো তার হাত থেকে জাতিকে বাঁচাতে এবং বিধবা ও অসহায়া রমণীদের বিবাহ করতে মুসলমানদের উৎসাহ দিতেই তিনি যেসব মহানুভবতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তারই অন্যতম ওহোদ যুদ্ধে শাহাদত-প্রাপ্ত মহাবীর আবদুল্লাহর বিধবা স্ত্রী জয়নবকে বিবাহ করেন।

এ নির্দেশ আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছেন; কোরআন এর সাক্ষী—

pdf By Syed Mostafa Sakib

"হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমার জন্য তোমার ঐ সকল পত্নীকে বৈধ করিয়াছি, তুমি যাহাদিগকে 'মহর' প্রদান করিয়াছ এবং আল্লাহ্ যাহাদিগকে যুদ্ধ-বন্দিনীরূপে তোমার নিকট আনয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী হইয়াছে এবং তোমার পিতৃব্য কন্যাগণ ও তোমার ফুফুর কন্যাগণ যাহারা তোমার সহিত দেশ ত্যাগ করিয়াছেন এবং বিশ্বাসিনী স্ত্রীলোক, যে নবীর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে—যদি নবী তাহাকে বিশুদ্ধভাবে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে। ইহা বিশ্বাসিগণের পরিবর্তে শুধু তোমারই জন্য, নিশ্চয় আমি তাহাদের পত্নীগণ ও তাহাদের দক্ষিণহস্ত যাহাদের অধিকারী তাহাদের সম্বন্ধে যাহা নির্ধারণ করিয়াছি তাহা অবগত আছি। যাহাতে তোমার পক্ষে কোন সংকোচ না থাকে এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়।" [সুরা আযহাব, আয়াত ৫০]

হজরত বিধবাকে বিবাহ করেছেন, কুমারীকেও বিবাহ করেছেন। শুধু বিধবা পত্নী নিয়ে যদি তিনি জীবন কাটাতেন তা হলে যুবতী ও কুমারী নারীদের মনের ভাব বুঝতেন না, তাদের নিয়ে কিভাবে সংসার করা যায়, কিভাবে তাদের খোরাক দিতে হয়, কিরূপ ব্যবহারে তারা খুশি থাকে এসব তত্ত্ব দিতে পারতেন না—যদি কুমারী আয়েশাকে বিবাহ না করতেন। হজরতের সঙ্গে কুমারী আয়েশার জীবনকাল সামান্য হলেও তিনি দুনিয়ার সধবা নারীর জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন তা আমরা পেতাম না।

বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, স্বজাতি ও বিজাতীয় নারী-সমাজের মাঝে যেরূপ পার্থক্য, কার কি পরিবেশ, কিরূপ মনের অবস্থা এটা বুঝতে হলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অভিজ্ঞতাবিহীন জ্ঞান বাস্তব নয়, নিখুঁত নয়, কার্যকরী নয়। আধুনিক যৌনবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন নরনারীর মনের কথা কেড়ে নিয়ে যৌন-তত্ত্ব দিয়ে থাকেন। এ তত্ত্ব সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়, নিখুঁত নয়। কেননা পুরুষেরা মনের কথা বললেও নারীরা কিছুতেই তাদের গোপন কথা ও দুর্বলতার কথা পুরুষের কাছে প্রকাশ করে না। নির্লজ্জা নারীরা করলেও একান্ত গোপন কথাগুলো মনের মাঝেই আটকে রাখে। তাই শতকরা অন্তত দশভাগ চাপাই থাকে। হজরত তাঁর বাস্তব জীবনে যৌনবিজ্ঞানী না হয়ে যে সব তত্ত্ব আমাদের দিয়েছেন তাঁর তুলনা বিরল। এ তত্ত্ব ইতিপূর্বে কেউ দিতে পারেন নি। যৌনবিজ্ঞানে তাঁর বাণী এত অধিক যে লিখে শেষ করার ক্ষমতা কারো নেই।

হজরতের এ বিধবা বিবাহগুলো হতে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে যুগ যুগের অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও নিন্দিত বিধবাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি। নারীর মান, নারীর প্রেম ও নারীর মর্যাদা দানও ছিল আর একটি কারণ।

মেরী, রায়হানা, সফিয়া প্রভৃতি খ্রীষ্টান ও ইহুদি নারীদের বিবাহ করে হজরত শুধু জাতিতে-জাতিতে প্রেমের বন্ধনই শেখালেন না, অন্যান্য জাতির প্রতি যে ঘৃণা বা অস্পৃশ্যতার মনোভাব বিরাজমান ছিল তারও অবসান ঘটালেন। তিনি জানতেন যে, সুদূর ভবিষ্যতে যখন বিজাতীয়রা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হবে তখন তাঁর এ মহান উদারনীতি বিশেষভাবে কার্যকরী হবে। সাগ্রহে মুসলমানগণ অন্যান্য জাতির মধ্যে, যাদের ওপর আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করবে। সারা বিশ্বে যখন

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে তখন পর্বতসম এ বিবাহ বন্ধনের বাধা যেন আর না থাকে এ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর ছিল। তাই প্রত্যক্ষভাবেই তিনি মানুষকে দেখালেন সধবা, বিধবা, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় নারীদের বিবাহ করে। যাদের ওপর আল্লাহর কেতাব নাজেল হয়েছে তাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন চলে—ইসলামের এ নীতিকে তিনি মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন।

নারীদের সে যুগে মর্যাদা ছিল না। গোত্রে-গোত্রে যখন হানাহানি, স্বজাতি বিজাতির মাঝে যখন খুনাখুনি তখন হজরত মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিলেন মহাসাম্যের এক মহামিলন নীতি। এ মিলন নীতির মাঝেই ঠাঁই পেল অনাথা, বিধবা, ইহুদি, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য জাতির নির্যাতিতা নারীগণ। শান্তির বাণী ছড়িয়ে দেওয়া যাঁর উদ্দেশ্য—হিংসা, বিদ্বেষ ও কলহের মূল উৎপাটন করা যাঁর কামনা—তিনি কি বৃদ্ধা, অনাথা, বিধবা, সধবা, স্বজাতি ও বিজাতির পার্থক্য করতে পারেন? তিনি যে মানুষের নবী, তিনি যে সর্বদেশের তথা বিশ্বের নবী। আল্লাহর কোরআন একথারই সাক্ষ্য দেয়। "ওয়া আরছালনাকা লেন্নাছে রাসুলান।" অর্থাৎ 'তোমাকে সমগ্র মানুষের রসুল রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। (৪ ঃ ৭৯)

হজরতের বহু বিবাহের কারণগুলো আমরা দেখলাম। তাঁর বহু বিবাহের প্রয়োজন ছিল শুধু আমাদের খাতিরে, তাঁর জন্য নয়। সমাজে সমাজে, গোত্রে-গোত্রে, সাদা কালোর মাঝে এক মহামিলনের মহা-পরিকল্পনাই ছিল এ মহামানবের চিন্তাধারায়। তাঁর কোন বিবাহের ফল কুফল হয়নি। অত্যাচার, অবিচার, হিংসা-বিদ্বেষ, নিন্দা, অপবাদের কোন সুযোগ পায় নি। পেয়েছে শান্তির এক অপূর্ব ছোঁয়া; বেহেশ্‌তের এক সুনির্মল বাতাস। ভাইয়ে ভাইয়ে বুক মেলানোর এক অনাবিল আনন্দ। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক, পারসিক, জৈন, বৌদ্ধ সবাই ঠাঁই পেল তাঁর পবিত্র বুকে। আল্লাহর নবী, মানুষের নবী, সাম্যের নবী মিলনের নবী, প্রেমের নবী, সারা বিশ্বের নবী এজন্যই তো বলেছেন—'আমি সমগ্র বিশ্বের নবীরূপে প্রেরিত হইয়াছি।'

চলুন, হিংসা-বিদ্বেষের কবর দিয়ে মানুষরূপে নিজেদের পরিচয় দিই। আর এ মানুষের নবী হজরতের প্রতি প্রাণঢালা শ্রদ্ধা নিবেদন করে সমস্বরে বলি—

"আচ্ছালাতো আচ্ছালামো আলাইকা ইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)"

দাম্পত্য জীবন

"নারীগণ তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও নারীদের পোশাক।"

[কোরআন ঃ সূরা বাকারাহ, আয়াত ২ ঃ ১৮৭]

বিবাহের পর থেকে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী যে জীবন অতিবাহিত করে সেই জীবনকেই দাম্পত্য জীবন বলে। দাম্পত্য জীবন বলতে আমরা স্বামী-স্ত্রীর একত্র জীবনকেই বুঝে থাকি। দম্পতির আভিধানিক অর্থও স্বামী স্ত্রী। বাংলা ব্যাকরণে দম্পতি শব্দকে সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় জায়া + পতি = দম্পতি। জায়া অর্থ—স্ত্রী, ভার্যা, বৌ ইত্যাদি। পতির

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূল শব্দ 'পত'। 'পত' অর্থ—প্রভু, মালিক বা স্বামী। তাহলে দম্পতির ভাবগত অর্থ স্ত্রীর প্রভু বা মালিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর মালিক ও পুরুষের মালিক অর্থেই দম্পতি শব্দের অর্থ হওয়া উচিত। শুধু স্ত্রীর মালিক অর্থে ভাব সম্পূর্ণ হয় না এবং এর মূল অর্থ অপ্রকাশিত থাকে। ওপরে উদ্ধৃত কোরআনের বাণী হতেও আমরা সেই অর্থই বুঝি। স্ত্রীর ওপর স্বামীর যেমন হক আছে, অধিকার আছে, প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষমতা আছে; তেমনি স্বামীর ওপরও স্ত্রীর হক আছে, অধিকার আছে ও ন্যায়সঙ্গত দাবি আছে। একে অপরের পরিপূরক। একজনকে উপেক্ষা করলে, একজনের অধিকার খর্ব করলে একজনকে ছোট করে রাখলে 'দম্পতি' হয় না। 'জায়া + পতি'—এ দুটো পৃথক শব্দ মিলে যেখানে এক শব্দ দম্পতি করা হয় তখন বুঝতে হবে যে 'জায়ার' যেমন মূল্য 'পতির'-ও তেমনি মূল্য। 'জায়া' শব্দ হতে এর যে কোন একটা অঙ্গ ভেঙে দিলে অর্থাৎ যে কোন অক্ষর হতে শুধু আকার (া) টুকু ভেঙে দিলে যেমন 'জায়া' থাকে না এবং সন্ধি করলে দম্পতি হয় না, তেমনি 'পতি' শব্দ হতে শুধু 'ই' (ি)-কার বিচ্ছিন্ন করলও পতি শব্দ হয় না এবং 'জায়া + পতি' সন্ধিতে দম্পতি হয় না। এখান থেকে তাহলে আমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি যে আইনগত, প্রকৃতিগত ও মূলগত অর্থে দুটি অংশই নিখুঁতভাবে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে হয়।

নবী-পয়গম্বরদের বাণীও এ কথারই সাক্ষ্য দেয়—

আমাদের নবী করিম (সঃ) বলেছেন, "নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী"।[১]

হজরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, "কিন্তু সৃষ্টির আদি হইতে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছেন। 'এই কারণ মানুষ্য আপন পিতা-মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে আর সে দুইজন একাঙ্গ হইবে'। সুতরাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ।"[২]

এবারে আমরা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আর একটু আলোচনা করছি।

হাইড্রোজেন + অক্সিজেন = পানি

$[H_2^- + O^+ = H_2O]$

হাইড্রোজেন নেগেটিভ বস্তু আর অক্সিজেন পজেটিভ বস্তু। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু অভেদ্য প্রাণ নিয়ে যখন মেলে তখনি মাত্র এক অণু অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জলকণার সৃষ্টি হয়। কার মূল্য কম আর কার মূল্য বেশি রসায়ন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা তা দেখতে পাই না। তাই অক্সিজেন পজিটিভ বলেই যে আর মান বেশি হবে আর হাইড্রোজেন নিগেটিভ বলে এর মান কম হবে তা মোটেই বলা চলে না।

সৃষ্টি পদ্ধতিতে, সম্প্রসারণ নীতিতে, প্রেমের বন্ধনে দুটোর দান এক সমান। এই দুই বিপরীতধর্মী সৃষ্টি নর ও নারীর একত্র জীবনই দাম্পত্য জীবন।

১। তিরমিজি।

২। বাইবেল—মার্ক ১০ নং (৬-৮)।

দাম্পত্য জীবনের সুখ ও দুঃখ

"এবং তাঁহার অন্যতম নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদিগ হইতেই তোমাদের জন্য সহধর্মিণী সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহাদিগ হইতে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।" (৩০ ঃ ২১)

করুণাময় আল্লাহর এক অপার আশীর্বাদ যে তিনি দুটি ভিন্নধর্মী নর ও নারী সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে প্রেম, আকর্ষণ ও মায়া দিয়ে জড়িয়ে রেখেছেন। কি অদ্ভুত এ লীলা! কি অদ্ভুত এ সৃষ্টির কৌশল! সৃষ্টির এ মহাকৌশল, এ মহাতত্ত্ব আমরা সাধারণ মানুষ বুঝতে অক্ষম। চিন্তাশীল সম্প্রদায় অর্থাৎ জ্ঞানী, বিজ্ঞানীরা এর কিছুটা অনুধাবন করতে পারেন।

নারী ও পুরুষের মধ্যে এক আকর্ষণ সর্বদা বিদ্যমান। এ আকর্ষণের মূল কারণ পুরুষের শুক্রকীট নারীর ডিম্বকোষে বা জরায়ুর দিকে সজোরে ধাবমান হওয়া। পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখেছেন যে শুক্রকীট শুক্ররসের মধ্যে ভেসে বেড়ায় এবং এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। নর বা নারী দেহের যে কোন অংশ এসব শুক্রকীটের পাশে আনলে এদের গতিবিধির কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু নারীর ডিম্বকোষ এর পাশে রাখলেই শুক্রকীটগুলো চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হয়। নারী বা পুরুষ এজন্যই পাশাপাশি আসলে স্বাভাবিক ভাবেই একটা আকর্ষণ জন্মে। আল্লাহর বাণী গভীরভাবে চিন্তা করলে ও বিশ্লেষণ করলে জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা এজন্যই তাঁকে পাবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

নারীতে-নারীতে অথবা পুরুষে-পুরুষে দাম্পত্য জীবন হয় না। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে, ভালবাসা জন্মাতে পারে, কিন্তু যৌন-মিলনের মাঝে যে সুখ, আকর্ষণ, প্রেম ও মায়া নিহিত তা মেলে না। নারী পুরুষের জন্য যেমন জীবন দান করতে পারে, পুরুষও তেমনি নারীর জন্য জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। এ প্রীতির বন্ধন কোন মূল্যবান বস্তুর বিনিময়েই মেলে না; এটা আল্লাহর এক অফুরন্ত দান।

বিবাহের পর যে দাম্পত্য জীবন আসে তা সুখের এবং অসুখের দুটোই হতে পারে। যদি সুখের হয় তবে বলতে হয় যে এ পৃথিবী তার কাছে বেহেশ্‌ত আর যদি অসুখের হয় তবে দোজখও যেন এর কাছে হার মানে। জীবনের উত্থান এবং পতন এ দাম্পত্য জীবনের ওপরই নির্ভর করে। তাই প্রতিটি নর-নারীর উচিত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের এ কয়েকটি দিন আরাম-আয়েস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রেম-প্রীতির মাঝে অতিবাহিত করে আল্লাহর প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী আবাস গড়ে তোলা।

যৌন-সুখের মাঝে পরম তৃপ্তি পাওয়াই শুধু দাম্পত্য জীবনের কাম্য নয়। কাম-বাসনা চরিতার্থ করাই দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য নয়। দাম্পত্য-জীবনের এক মহান দায়িত্ব আছে যা পালন করলে জীবন হয় পরিপূর্ণ, সমাজ হয় সুশৃঙ্খল, দেশ ও জাতি হয় উপকৃত আর সৃষ্টিকর্তা হন পরম খুশি। ইসলামও এ কথারই সাক্ষ্য দান করে।

"সঙ্গমের সময় স্ত্রীর মুখে চুমা দেওয়া অতি উত্তম কার্য। ইহাতে আল্লাহ্ উভয়ের আমলনামায় ৭০টি করিয়া নেকী লিখিয়া দেন ও ৭০টি করিয়া পাপ তাহাদের আমলনামা হইতে কমাইয়া দেন।"[১] [এরশাদুত্তালেবীন]

১। সংগৃহীত—মকছুদুল মোমেনীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যেমন কঠোর কর্তব্য, স্ত্রীর জন্যও স্বামীর তেমনি কর্তব্য রয়েছে। উভয়ে এ কর্তব্য পালন না করলে কি করে দাম্পত্য জীবন সুখের হয়? আল্লাহ্ পুরুষকে নারীর পোশাক এবং নারীকে পুরুষের পোশাক বলে অভিহিত করেছেন। নর অথবা নারীকে পোশাক পরিচ্ছদের মাধ্যমে যেমন সুন্দরভাবে সাজান যায় পোশাক যেমন তাদের রূপ ও শ্রীবৃদ্ধি করে, তেমনি নর নারীর ভূষণ হয়ে রূপ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পোশাক যেমন নর-নারীকে সবল ও সুস্থ রাখে, মনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করে, শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীকে হিমশীতল হতে রক্ষা করে তেমনি নর ও নারী একে অপরের পরিপূরক হয়ে এক সহজ, সুন্দর ও মনোরম জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলে। সামাজিকতা, ধর্ম ও কর্মের জন্য যেমন পোশাক একান্ত প্রয়োজন, তেমনি নারীর জন্য নর ও নরের জন্য নারীরও সমাজ, ধর্ম ও কর্মের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এ জন্যই তাদের যুগলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। একজনের বক্ষের হাড় থেকে অন্যজনের সৃষ্টি। তাই কেউ কারো পর নয়—কেউ কারো অনাত্মীয় নয়। দু'জনেই যেন আপন—একান্তই আপন। ভাই, বোন, বাবা, মা সবাই পর হয়ে দাঁড়ায়, সবাই বিচ্ছিন্ন হতে চায়, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যে মিলন সূত্রে গাঁথা হয় তা তারা ছিন্ন করতে চায় না। প্রকৃতিরই এ এক অদ্ভুত নিয়ম। আল্লাহরই এ এক অশেষ করুণা।

কিভাবে দাম্পত্য জীবন সুখের ও সুন্দর হয় কিভাবেই বা এর অধঃপতন ঘটে তা নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করব।

নর ও নারীকে নিয়ে যেখানে দাম্পত্য জীবন সেই নর ও নারীর চরিত্র বিশ্লেষণ প্রথমে প্রয়োজন। নদীর গভীরতার হিসাব না করে কেউ যদি পাড়ি জমাতে চায়; তাহলে যেমন ডুবে যাবার সম্ভাবনা—পথ না চিনে আঁধার রাতে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে ধরলে যেমন কাদা, বিষ্ঠা ও কাঁটার ঘায়ে পা ক্ষত-বিক্ষত হয়; তেমনি নারী-চরিত্র না জেনে নারীকে নিয়ে সংসার করতে গেলে, আর পুরুষ-চরিত্র না জেনে পুরুষকে নিয়ে ঘর বাঁধতে গেলেও তেমনি বিপদে পড়তে হয়। দেখি, আমরা দু'টি চরিত্র পাশাপাশি আলোচনা করে সহজ, সুন্দর ও সোজা পথ দেখাতে পারি কি না।

বহুদিন পূর্বে যখন আমার বই লিখবার অভ্যাস ছিল না, তখন সামান্য দু' একটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতাম। এ প্রবন্ধগুলোর একটি 'পুরুষ চরিত্র' যার প্রথম অংশটুকু "পিপাসা—প্রেম সংখ্যায়" (১৯৬৫ সন) স্থান পেয়েছিল। বাকি অংশটুকু উক্ত পত্রিকা ঈদ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৬৭ সনে ছাপা হয়েছিল। ভুল ত্রুটি সংশোধন না করে অবিকল লেখাটুকু এখানে তুলে ধরলাম।

পুরুষ চরিত্র

(পিপাসা—প্রেম সংখ্যায় প্রকাশিত)

আমি আগে কোনদিন 'পিপাসা' পড়ি নি। মাঝে মাঝে 'নর-নারী' পড়তাম। আজ সৌভাগ্যক্রমে আমার বন্ধুর হাতে দেখতে পেলাম 'পিপাসা'। চেয়ে নিলাম এবং কয়েক পাতা ওলটাতেই দেখতে পেলাম 'নারী ও মন' প্রবন্ধ—লিখেছেন শ্রদ্ধেয়া মিসেস নাদিরা বারী বি. এ, বি. টি। সুশিক্ষিতা একজন মেয়ের লেখা। নিশ্চয়ই যে বিষয়বস্তু আছে এতে কোন সন্দেহ থাকল না। তাই ধৈর্য ধরে সম্পূর্ণটুকু পড়ে ফেললাম। কি পেলাম সেটা পরে বলছি। তবে এত আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে খুব কম প্রবন্ধই পড়েছি। নারীর নিকট হতে নারীর মন ও চরিত্র না পেলে আসল রূপ ধরা পড়ে না। আর মন থেকেও পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে না। প্রবন্ধে লেখিকা নারীর মনটাকে এত সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন যা পূর্বে কেউ এরূপভাবে

ফোটাতে ও সমাজের নিকট তুলে ধরতে পারেন নি। নারী হয়েও নারীর দুর্বলতা ও কার্যপ্রণালী লিখতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তাই নারী ও পুরুষ উভয়ের কাছেই যে এটা অমূল্য প্রবন্ধ ও উপদেশমূলক তত্ত্ব এতে কোন সন্দেহ নেই। নারী কি চায় পুরুষের তা জানা উচিত। আর পুরুষ কি চায় সেটাও নারীর বোঝা উচিত। তবেই নারী-পুরুষের পূর্ণাঙ্গ মিলন সম্ভব। নারী যদি পুরুষের মনের কথা বুঝতে না পারে আর পুরুষ যদি নারীর সুপ্ত কামনার উৎস খুঁজে বের করতে না পারে তাহলেই হয় বিভেদ, সমাজে আসে বিশৃঙ্খলা আর ভবিষ্যৎ বংশধরনের জন্য রেখে যায় অভিশাপ।

লেখিকা মেয়েদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে তারা কি চায়, কিভাবে তাদের যৌন-অনুভূতি আনা যায় সুন্দর পন্থায় পুরুষ—ছেলেদেরকে শিখিয়েছেন। ধন্যবাদ আপনার মতো লাখের মধ্যে একজন বিদুষী নারী থাকলেও সমাজকে অনেক এগিয়ে দিতে পারবে। তাই আপনার লেখা আরও আশা করি।

আজ আমি পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে দু' একটি কথা এর পাশাপাশি বলতে চাই। অবশ্য এগুলো আমার নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হতে সংগ্রহ করা। নারী জানে না পুরুষ চরিত্র। তারা জানে না যে পুরুষের হৃদয় কত প্রশস্ত ও কত মধুর। যারা বোঝে তারাই সংসারে আনে অনাবিল শান্তি, তাদের নিয়েই লেখা হয় প্রেমের গল্প ও উপন্যাস। তাদের জন্যই গড়ে ওঠে কাব্য ও শ্বেত মর্মর প্রস্তরের তাজমহল। উপন্যাসের কথা নয়, গল্পের কথা নয়—এ পুরুষ চরিত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা। নারীর একটু সহানুভূতি দেখলে, তাদের চোখের একটু বাঁকা চাউনি ও ঠোঁটের একটু হাসি দেখলে যে পুরুষ ছেলেরা তন্ময় হয়ে ওঠে, সেই পুরুষ ছেলেদের নিয়ে নারীরা কি সুন্দর সুখের নীড়ই না তৈরি করতে পারে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মেয়েই জানে সেই কৌশল। কাম উত্তেজনায় নারীরা পুরুষের চাইতে নাকি অনেক গুণ বেশি কিন্তু আমার মনে হয় যে পুরুষের উত্তেজনার মুহূর্তে যে ভাবের সৃষ্টি হয় সেটা নারীর সুপ্ত কামনার পঞ্চাশ গুণেরও বেশি। সেই প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তে যখন নারীর নিকট হতে পুরুষ অনুভূতিশীল সাড়া না পায় তখন পুরুষ ছেলেরা নিষ্ঠুর, কঠোর ও প্রাণহীন হতে বাধ্য হয়। পুরুষের এই উত্তেজনার মুহূর্তকে হৃদয়ঙ্গম করেই রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন—"চুলার উপর ভাতের হাড়ি রেখেও স্বামীর ডাকে সাড়া দাও।"[১]

যারা বুদ্ধিমতী, যারা চতুরা, যারা স্বামীর সহানুভূতি পেতে চায় তারা স্বামীর মনের ভাব বুঝেই নিজেকে তৈরি করে।

মেয়েদের কাম-প্রবৃত্তি জাগাতে প্রায় আধঘণ্টা হতে এক ঘণ্টা দরকার। পুরুষ নারীর মতো ধৈর্যশীল নয়। এটা সৃষ্টিরই রহস্য। পুরুষের যখন পূর্ণ উত্তেজনা হয়ে যায় তখন হয়তো তারা চুম্বন, মৃদু দংশন ও কোলাকুলিতে ১০/১৫ মিনিট অতি কষ্টে কাটাতে পারে; এতটুকু ধৈর্য ধরাও কঠিন, কেননা মনের ধৈর্য বাঁধ মানলেও যৌনাঙ্গ বাঁধ মানে না। তাদের লিঙ্গ স্ফিত হলে এমনি একটা অনুভূতি আসে যেটাকে প্রশমিত করতে হলে সহবাস ছাড়া আর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। বাহ্যিক শৃঙ্গারে আনন্দ আসলেও উত্তেজনাও বেশি হয় ও ধৈর্যের

১। প্রকৃত হাদিসটি এইরূপ—"যখন স্বামী আপন স্ত্রীকে ডাকিবে তখনই আসিয়া হাজির হইতে হইবে যদি সে তন্দুরের ওপরও থাকে।"
[সংগৃহীত—মকসুদুল মোমেনীন ও স্ত্রী শিক্ষা—কৃত গোলাম রহমান, পৃষ্ঠা ৩২৭]

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁধও টুটতে থাকে। এ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে ফেলা পুরুষের অন্যায় কিছুতেই নয়। তাই নারীকে যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব উত্তেজিত হয়ে পুরুষের সঙ্গে মিলনে প্রস্তুত হওয়াই উচিত।

পুরুষ ছেলেরা চায় মুখরোচক খাওয়া আর বুক মিলিয়ে শোওয়া, এই দু'টোর মধ্যে যে কোন একটার অভাব হলেই তাদের স্বভাবত মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। তেমনি আবার এ দু'টো নারীর নিকট হতে ঠিকমতো পেলে তাদের হৃদয় সহানুভূতি, প্রেম ও আনন্দে ভরে ওঠে। তখন তারা নিজেকে গর্বিত অনুভব করে ও অন্যান্য মেয়েদের সাথে তুলনা করে নিজের স্ত্রীকে অনেক উচ্চে স্থান দেয়। তাদের হৃদয়ে এমনি এক ভালবাসার সৃষ্টি হয় যা নারী সাধনা করেও মেলাতে পারে না। স্ত্রী রূপসী না হলেও তার গুণে স্বামী মুগ্ধ হয়ে যায়। বিশ্রী অঙ্গও তার চোখে সুশ্রী হয়ে ভাসে। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পেয়েছি এবং দেখেছি। তাই বিদুষী নারীরা সংসারের অন্যান্য কাজকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে স্বামীর জন্য সুন্দর, পরিমার্জিত খাবার তৈরি করে রাখে। চাকর-চাকরানীর হাতে তৈরি খাওয়া নিজেও পছন্দ করে না, স্বামীকেও দেয় না। কিন্তু আজকাল আধুনিক পরিবারে দেখা যায় ঠিক এর উলটো। মেয়েরা চুলার কাছে যাওয়া লজ্জাবোধ করে। স্বামীকে নিজ হাতে রেঁধে খাওয়ান তো দূরের কথা, কাছে বসে পরিবেশনটুকুও করে না। নিজের প্রিয়ার হাতের রান্না এবং একসঙ্গে বসে খাওয়া যে কত তৃপ্তিদায়ক সে কথা মেয়েরা বোঝে না। তাই আধুনিক পরিবারে অনাধুনিক পরিবারের চাইতে গরমিল অনেক বেশি। মেয়েদের প্রথম জীবনে যে উদ্দাম বাসনা ও প্রেমের কামনা থাকে তা দু'একটি সন্তান হবার পরেই ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। মাতৃত্বের ভাব এনে প্রেম ও ভালবাসার মোহটুকু কেড়ে নেয়। স্বামীকে তখন আর ভাল লাগে না, যৌন-অনুভূতি তো থাকেই না, সাধারণ আলিঙ্গন স্পর্শটুকু বিরক্তিকর মনে করে। অনেকে আবার Modern হতে চায়। তাই স্বামীর জন্য পৃথক বিছানার ব্যবস্থা করে, যা পুরুষ ছেলেরা মোটেই পছন্দ করে না। সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর রাত্রির অবসরেই তারা চায় প্রিয়াকে কাছে পেতে। তার কাছেই সুখ, দুঃখ, আবেগ, অনুভূতি জানাতে চায়। যে মেয়েরা স্বামীর আবেগে সাড়া দেয় তারাই পায় সোহাগ এবং উপর্যুপরি প্রাণ নিংড়ানো ভালবাসার চুম্বন ও মধুর আলিঙ্গন। স্বামীভক্ত চতুরা মেয়েরা এই সময়েই তাদের অকৃত্রিম ভালবাসার বীজ স্বামীর হৃদয়ে ছড়িয়ে দেয় এবং আনে প্রীতি ও শান্তি।

পুরুষ ছেলেরা যখন নারীকে পায় তখন জগৎ ভুলে যায়। আর যখন জগতের কাজে লিপ্ত হয় তখন নারীকে ভুলে যায়। এটাই তাদের স্বভাব। যখন অভেদ প্রাণ নিয়ে নারীর সঙ্গে মেশে তখন নারীর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়। ধন, দৌলত, মান, অপমান সব তুচ্ছ করে ফেরে এই নারীর পিছে। যথাসর্বস্ব নারীকে দিয়েও তার মন পেতে চায়। শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়েরা তাই তাদের দাবি মেনে নিতে স্বামীকে বাধ্য করে ভালবাসার মোহে—আর অশিক্ষিতা, বোকা মেয়েরা ঝগড়া করে, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে স্বামীকে বাধ্য করতে চেষ্টা করে; যার ফল হয় বিষময়।

পুরুষ ছেলেরা কোনদিনই মেয়েদের অধিকারে থাকতে চায় না। তারা স্বাধীনচেতা ও চিন্তাশীল। তাদের এই স্বাধীন চিন্তাধারার পথে অন্তরায় সৃষ্টির চেষ্টা করলেই হয় কলহ ও বিচ্ছেদ। আজকাল অনেক মেয়ের মুখেই শোনা যায় যে, তারা স্বামীকে কন্ট্রোল করেছে অর্থাৎ তাদের মতামত ছাড়া স্বামীরা কোন কাজই করতে পারে না। অনেক স্বামীকে কন্ট্রোল হতেও দেখি। অবশ্য এই কন্ট্রোল হবার পেছনে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত কারণও আছে।

প্রথমত, সম্মানের ভয়। কেননা স্ত্রীর কথা না মেনে চললে গালাগালি শুনতে হয়, যা অন্য লোকে শুনলে তার আত্মসম্মানের ব্যাঘাত ঘটে। দ্বিতীয়ত, অহেতুক রাগারাগি করে ছেলেমেয়েকে মারধর করে যা দেখলে প্রাণে ব্যথা লাগে। তৃতীয়ত, তার সাথে যৌন-মিলন হয় না। চতুর্থত, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বিশেষ করে শ্বশুর-শাশুড়ির পক্ষ হতে আদর এবং ওজন কমে যায়, যা পুরুষ ছেলেদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। এছাড়া আরও অনেক কারণে পর্বতসমান ব্যথা নিয়েও মুখে কৃত্রিম হাসি ভরে রাখে। কিছুদিন পর বিসুভিয়সের অগ্নির মতো যখন স্তূপীকৃত ব্যথা উদ্গীরণ হতে থাকে তখন স্ত্রীকে হয় বাড়ি ছাড়তে হয় নতুবা স্বামীর সহানুভূতি হতে বঞ্চিত হয়ে বৃথা বিলাপ করতে শোনা যায়। তাই স্বামী কন্ট্রোল প্রথায় নিজেকে যারা গৌরবান্বিত মনে করে আত্মপ্রকাশ করে, তারা শুধু নিজের সর্বনাশই ডেকে আনে না, সমাজকেও নষ্ট করে।

নারীর ভালবাসা ও প্রেরণা পুরুষকে দেয় অফুরন্ত আনন্দ ও সাহস। যে স্বামী তার স্ত্রীর ভালবাসা পায় সে যত কঠোর নির্বোধ ও প্রাণহীন হোক না কেন আস্তে আস্তে নিজেকে মার্জিত করে সমাজের নিকট মাথা উঁচু করেই দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে আবার বিদ্বান, পণ্ডিত ও সাধু ব্যক্তিও স্ত্রীর ভালবাসায় বঞ্চিত হয়ে ধরাকে কারাগার ও নিজেকে অভিশপ্ত মনে করে তার বুদ্ধি, কৌশল, পাণ্ডিত্য ও প্রেমকে জলাঞ্জলি দিয়ে অসৎ, রূঢ় ও বদমেজাজী হতে বাধ্য হয়।

পুরুষ চরিত্রের এই অস্বাভাবিক ও কল্পনাতীত পরিবর্তনের মূলেই নারী।

পুরুষের উত্তেজনায় সম্পূর্ণই নির্ভর করে নারীর ভাবভঙ্গি ও মুখের হাসির ওপর। পুরুষের উত্তেজিত হতে কোন শৃঙ্গারের আবশ্যকতা নেই। নারীর চোখের ইশারা যথেষ্ট। নারীরই মন ভোলানো আদর ও কোমল বাহুর আবেষ্টনী পুরুষের তন্ত্রে তন্ত্রে বিদ্যুৎ শক্তির ক্রিয়া করে। সুষ্ঠু মিলন পরিবেশ সৃষ্টির মূলে নারীর অভিনয় গুরুত্বপূর্ণ। সচ্চরিত্রবান ছেলেরা জীবনের প্রথম অবস্থায় নারীর সংস্পর্শে এসে বেশ ভীত হয়ে যায়, যার ফলে মানসিক উত্তেজনা চরম হলেও শারীরিক উত্তেজনা আসে না এবং সঙ্গমে অনেকেই ব্যর্থ হয়। নারীদের এই সময়ের ধৈর্য বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, স্বামীকে অকর্মণ্য মনে করে বিরূপ মনোভাব দেখালে সে বেচারা লজ্জায় এবং অপমানে আরও ভীত হয়ে ওঠে এবং মানসিক দুর্বলতা এমনিভাবে চেপে বসে, যার ফলে সত্যি সত্যিই অকর্মণ্য হয়ে ওঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে নারীর দরকার অধিক মেলামেশা ও হাসিরহস্য যেন সে মানসিক আস্থা ফিরে পায়। এছাড়া স্বামীকে এমন ভাব দেখাতে হয় যে সঙ্গমের জন্য মোটেও সে লালায়িত নয় এবং তার জন্য মনে কোন ক্ষোভও নেই। তা হলে দেখা যাবে যে অল্প সময়ের মধ্যেই পুরুষ কার্যক্ষম হয়ে উঠেছে এবং পূর্ণ তৃপ্তিতেই সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারছে। এ বাস্তব অভিজ্ঞতা অধিকাংশ পুরুষ ছেলের নিকট হতে শুনতে পাওয়া যায়। বিশেষ কোন ব্যাধি ছাড়া প্রত্যেক পুরুষই সক্ষম এবং যৌন-চেতনায় বিশেষ অনুভূতিশীল।

নারীর সহানুভূতি যেমন পুরুষের যৌন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় তদ্রূপ নারীর রূঢ়তা, প্রাণহীনতা ও ব্যর্থতাও শক্তিশালী পুরুষকে নির্জীব ও রোগাটে করে তোলে।

তাই দেখা যায় যে, পুরুষের উদ্যম, বাসনা, কর্মপ্রেরণা ও সুস্থ মানসিকতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে নারীর ওপর। নারীই পুরুষের মনের চাবি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুরুষ চরিত্র

(পিপাসা—ঈদ সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৬৭ সন)

"প্রেম সংখ্যায় 'পুরুষ চরিত্র' শেষ লাইনে লিখেছিলাম 'নারীই পুরুষের মনের চাবি'। কথাটা পড়ে অনেকে খুশি হতে পারেন নি। বিশেষ করে পুরুষ ছেলেরা। কেননা এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে পুরুষদের মর্যাদার অনেক হানি হয়। তবুও বলতে হচ্ছে যে, Central Neucleus-কে কেন্দ্র করে যেমন তার চতুর্দিকে Electron ঘোরে, নারীকে কেন্দ্র করেও তেমনি পুরুষ ছেলেদের চরিত্র ও মানসিকতা গড়ে ওঠে। কল্পনার কেন্দ্র এই নারী। বড় মায়াবিনীর জাত এই নারী। তাদের যাদুমন্ত্রে পুরুষ ছেলেরা বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, কৌশল সব হারিয়ে ফেলে। হারিয়ে ফেলে শিক্ষার মর্যাদা, ধনের অভিমান, রূপের গৌরব, শক্তির বাহাদুরী আর বংশের আভিজাত্য। নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দিতেও বাধ্য হয় এই নারীর জন্য। শুধু বাধ্যই হয় না, যত অমঙ্গলের কল্পনা গড়ে তোলে তাকে কেন্দ্র করে। আর আনে নিজের ও সমাজের জন্য অভিশাপ। নিজের ভাইকে করে পর, বাপ-মার হয় বৈরী, আর আত্মীয়-স্বজনের অন্তরে দেয় আঘাত, তার শেষ পরিণতি হয় বিভেদ, বিচ্ছেদ, কলহ ও ধ্বংস। পুরুষদের এই বিচারহীন, হীন বিবেককে লক্ষ্য করেই তাই রসুলুল্লাহ বলেছেন, "নারীর বাধ্য পুরুষের ধ্বংস অনিবার্য"।

নারীর প্রেমের সুধা পেলে যেমন পুরুষ ছেলেরা মাতোয়ারা হয়ে ওঠে তেমনি করে রোষের ভাষা শুনলে নিজেকে অভিশপ্ত বলে মনে করে। নারীর মানসিকতাই পুরুষ চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। এদের মনের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে পুরুষের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী। যেদিন কোন শিক্ষক সহধর্মিণীর নিকট হতে সদ্ব্যবহার পান, সেদিন ছাত্রদের শত অপরাধও ক্ষমা হয়ে যায়—আর যেদিন এর বিপরীত হয় সেদিন বিনা অপরাধেও ভাল ছাত্রের পিঠ বেত্রাঘাত জর্জরিত হয়ে ওঠে। যেদিন কোন বিচারক তার স্ত্রীর নিকট মধুর আপ্যায়ন ও ভাল পরিচর্যা পান, সেদিন খুনী আসামীও নির্দোষ—খালাস পায়। আর উলটো হলে সাধুর গলাতেও ফাঁসীর দড়ি ঝোলে। ডাক্তারগণ তো নিজেদের কথা নিজেরাই ভাল বোঝেন। বিবির সাথে মন কষাকষি হলে ডায়রিয়ার জন্য ডিসেন্ট্রির প্রেসক্রিপশন পড়ে অথবা গনোরিয়ার জন্য নিউমোনিয়ার লক্ষণ টেথিস্‌কোপে ধরা পড়ে। অপারেশন করতে গেলে হয় Successful কিন্তু Patient died. অফিসারদের কার্যক্রম তো আরও মর্মান্তিক আর রহস্যপূর্ণ। তাদের চাবি যদি ঠিকমতো না হয় তা হলে Body temperature অনেক বেড়ে যায়। সেদিন হয়তো কোন চেক-এ Signature-ই পড়ে না অথবা মিথ্যা চেকেই সই পড়ে। নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের রেহাই নেই। সামান্য অপরাধেই Charge sheet, Suspend অথবা একদম বরখাস্ত। বেচারাদের শেষে তল্পিতল্পা গুটিয়ে একদম সোজা পথ ধরা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এই কয়েক শ্রেণীর ভাগ্যশীলা ভার্যা যারা, তাদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন বেশ হুঁশিয়ার থাকেন চাবিটা ঠিকমতো ঘোরাতে। উলটো দিকে ঘোরালে কিন্তু বিচারের দিন আপনাদেরকেই দায়ী হতে হবে। কেননা হাজার হাজার পুরুষ ছেলের নির্যাতন ও ভাগ্যবিড়ম্বনার মূলে আপনারাই।

যৌবনের প্রারম্ভ হতেই পুরুষ ছেলেরা নারীর সঙ্গকে পছন্দ করে। শুধু পছন্দই করে না, জীবন মন দিয়েও নারীকে ভালবাসতে চায়। যৌবনের অকুতোভয় প্রাণচাঞ্চল্যে তারা উন্মাদ হয়ে ওঠে। নারীর শ্বাস, গন্ধ, শব্দ, কল্পনা সবই যেন তখন ভাল লাগে ও আলোর রূপ নিয়েই ভেসে ওঠে, যে রূপে সবকিছু পরিষ্কার ও সুন্দর হয়ে উদ্ভাসিত হয়। অন্ধকারের মলিনতা দূরীভূত হয়ে চোখের সম্মুখে সুখের নবীন আবাসই ঝলসে ওঠে।

চোদ্দ বছর পার হবার পর থেকেই পুরুষ ছেলেদের যৌন-চেতনা আসতে থাকে। একসময়ে বদ্ধঘরে বসে সময় কাটাতে মন আর চায় না। দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলা, গান, বাজনা, হাসি, রহস্য, শরীর চর্চা সবকিছুতে আস্তে আস্তে মেতে ওঠে। যতই বয়স বাড়তে থাকে ততই যেন তাদের চিন্তাধারা এককেন্দ্রিক হতে থাকে। আর সে কেন্দ্র নারী। বিভিন্ন চরিত্রের ছেলে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করবার প্রয়াস পায় আর জয় করে নিতে চায় নারীর মন। নারীই হয় তার কামনা, নারীই হয় তার সাধনা। স্বপ্নেও পায় নারী আর জাগ্রতেও দেখে নারী। দেখবার এবং পাবার যেন শেষ হয় না, শুধু বেড়েই চলে জোয়ারের স্রোতের মতো বেগে। মনের কল্পনা, মুখের হাসি, প্রেমের ভাষা ফুটিয়ে তোলে, বিজলীর ঝিলিক নিয়েই কচি নারীর প্রাণে দোলা দিতে অগ্রসর হয়। কেউ তার বসন-ভূষণে নারীর প্রাণকে আকৃষ্ট করে। কেউ বা গানের সুরে নিজের গুণের পরিচয় দিয়ে প্রিয়ার মনে জোয়ার আনে, আর কেউ বা ভাল খেলোয়াড় বা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ও নারীকে নিয়ে ভবিষ্যৎ সুখের নীড় কল্পনা করে। যার যেদিকে যতটুকু অভিজ্ঞতা থাকে তা ফুটিয়ে তুলে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। চঞ্চলতা, চপলতা, রসিকতা দিয়েও ভরে তুলতে চায় নারীর মন, পেতে চায় নারীর সান্নিধ্য। এই প্রাণকেন্দ্রিক নারীর সৃষ্টি না হলে পুরুষের এতটুকু আত্মচেতনা আসত কিনা সন্দেহ।

যাদুকরী হস্ত নিয়ে যখন যৌবন পুরুষের শরীরকে স্পর্শ করে তখন তারা উন্মাদ মাতঙ্গের মতোই ছুটাছুটি করে। সাগরের জলোচ্ছ্বাস যেমন বাঁধ মানে না তেমনি যুবক ছেলেদের মানসিক কল্পনাও বাঁধ মানে না। পিতা-মাতার শাসন, সমাজের বন্ধন সব ছিঁড়ে ফেলে অগ্রসর হতে চায় ঐ নারীর দিকে। যারা একান্তই ভদ্র ও লজ্জাশীল তারাও গোপনে অন্তত তার মানসপ্রিয়াকে স্মরণ করে হস্তমৈথুনে রত হয় ও কিছুটা আত্মতৃপ্তি লাভ করে। আর কিছু সংখ্যক ছেলে মেয়েদের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হয়ে বালক অথবা চাকরদের সঙ্গে সহমৈথুনে অভ্যস্ত হয়। এই হস্তমৈথুন ও পুংমৈথুন পুরুষ চরিত্রের সব চাইতে নিকৃষ্টতম অধ্যায়। যারা এই কু-অভ্যাস হতে নিজেকে বাঁচাতে পারে না, তাদের জীবনই উত্তরকালে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এই কু-অভ্যাসের ফলে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি কমে যায়, চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়, পাকস্থলী দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীর ক্ষীণ হয় ও লিঙ্গের অবসাদ আসে। 'নর-নারী' ও পিপাসার' প্রেসক্রিপশান অধ্যায় পড়লে সত্যি দুঃখ হয়। দুঃখ হয় ঐ যুবক ছেলেদের জন্য যারা এই কু-অভ্যাসজনিত দোষে নিজেকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধি দিচ্ছে। চোদ্দ বছর পার হতেই যারা নারীকে পাবার কল্পনায় উন্মাদ হয়ে ওঠে তারা সামান্য ৩/৪ বছর পার হতে না হতেই রূপসী যুবতী অথবা তরুণীকে দেখেই ভীত হয়ে ওঠে ও গা ঢাকা দিয়ে চলতে চেষ্টা করে। শরীরের লাবণ্য ও কমনীয়তা তো থাকেই না, পড়াশুনা ও সাংসারিক কাজ কর্মেও অকর্মণ্য হয়ে ওঠে। দেখলেই মনে হয় শ্মশান ঘাট থেকে যেন উঠে আসছে। নিজের ক্ষীণ শরীর, উত্তেজনাহীন লিঙ্গ ও কোটরগত চক্ষু নিয়ে তাই কোন নারীর সম্মুখে যেতেই লজ্জিত হয়। এই অবস্থায় পড়ে কেউ জীবনে বিয়ে করবে না বলে Declaration

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেয়। কেউবা অভাবের দোহাই দিয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, কেউবা ডাক্তারকে কাকুতি-মিনতি করে ছদ্মনাম দিয়ে চিঠি লিখে তাকে বাঁচাতে—যেন নারীর নিকট অপমানিত না হতে হয়। অনেকে যৌবনকে ভোগ করতে পারবে না বলে আঁধার রাতে গলায় দড়ি দিয়ে অপমানের হাত হতে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।

যে নারী যৌবনের কামনা, হৃদয়ের বাসনা, আত্মায় তৃষ্ণা, নয়নের দৃশ্য সেই নারীই তার চোখে আবার বিভীষিকার করাল রূপ নিয়েই ভেসে ওঠে। নারীকে বাঘের চাইতে বেশি ভয় করে, সাপের চাইতেও মারাত্মক মনে করে, আর সিংহের গর্জনের চাইতেও নারীর রোষকে ভীতিজনক ভাবে। এই মানসিক বিকারের কারণ আর কিছুই নয়। কারণ হলো অসংযম, অদূরদর্শিতা ও মানসিক চরম দুর্বলতা।

যৌবন অভাব মানে না। যৌবন কাল রূপসীর পার্থক্য করে না। যৌবন পিতা-মাতার খাতিরে সংযমী হতেও রাজি হয় না। যৌবন চায় নারীর সঙ্গে বুক মেলাতে। যৌবনের তৃষ্ণা মেটে নারীর সঙ্গে দলনে, দংশনে, চুম্বনে, কখনো যৌনাঙ্গ মিলনে। তাই যারা অভাবের দোহাই দিয়ে বিয়ে করতে বিরত থাকে, যারা অপ্সরা সুন্দরীর সন্ধান পায় না বলে নিজেকে দূরে রাখে, যারা পিতা-মাতার ঘাড়ে অযথা দোষ দিয়ে নিজেকে বাধ্য ছেলে বলে আত্মপ্রকাশ করে, আমার মনে হয় যৌবন তাদর সম্পূর্ণ দোলা দেয় না। যৌবনের চাঞ্চল্য তারা অনুভব করে না।

এই দোলা না দেওয়া ও অনুভব না করার পেছনে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। অবশ্য নাও থাকতে পারে। তবে মানসিক দুর্বলতা যে পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের জন্য আমার অনুরোধ—তারা যেন নিজের দুর্বলতাকে দূর করতে অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নিজেকে যাচাই করেন। দেখতে পাবেন, আপনাদের দুর্বলতা ততটুকু নয়, যতটুকু কল্পনা করে নিজেকে নপুংসক মনে করেন।

আমি পূর্বদিন 'পুরুষ চরিত্রে' লিখেছি যে, প্রত্যেক পুরুষই সক্ষম তবে কিছু ধৈর্যের দরকার। মনের দুর্বলতাকে দূর করতে হলে কিছুদিন অভিজ্ঞ ডাক্তার অথবা কবিরাজের ওষুধ সেবন করে মুক্ত মানসিকতায় প্রফুল্ল চিত্তে নারীর সঙ্গে অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলন দরকার। ২/৪ দিন মিলনে যখন বুঝতে পারবেন যে, আপনি সক্ষম তখন সব বিকার চলে যাবে। তখন বুঝতে পারবেন যে, আপনি যুবক এবং সক্ষম যুবক। তখন আর নিজেকে জীবন্ত সমাধি দিতে হবে না।

পুরুষ চরিত্রের ওপর দুটি প্রবন্ধই লিখেছিলাম। এরপর আর লেখবার অবকাশ পাই নি। ইচ্ছে ছিল ধারাবাহিক রূপে লিখতে থাকব কিন্তু 'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে' প্রবন্ধের ওপর যখন বিভিন্ন পত্রিকায় দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয় তখন মন ফিরে যায়। এরপর বই আকারে জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নিই এবং অন্যান্য বইগুলো লিখতে হাত বাড়াই। তাই সময় ও সুযোগের অভাব ঘটে।

'পুরুষ চরিত্র' লেখা খুব সহজ কথা নয়। কেননা কোটি কোটি মানুষের চেহারা ও গলার স্বরে যেমন মিল নেই তেমনি কোটি কোটি পুরুষের মানসিক চিন্তাধারা, বুদ্ধি, কার্যক্রম ও যৌন-চেতনাতেও তেমনি মিল নেই। কেউ ভদ্র, কেউ অভদ্র, কেউ শান্ত, কেউ উগ্র, কেউ বুদ্ধিমান কেউ বুদ্ধিহীন, কেউ কামুক, কেউবা যৌনশক্তিহীন। চোর, বদমায়েশ, খুনী, ডাকাত, লম্পট ও ব্যভিচারী হিসাবে যেমন সমাজে এদের দেখা যায় তেমনি আবার সাধু, সন্ন্যাসী, ওলি, গাউস, কুতুব, ফকির হিসাবে এ সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে।

জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, কবি, লেখক, শাসক ও সমাজসেবক হিসাবে তারা যেমন প্রকাশ পায় তেমনি মূর্খ, গোয়ার, উচ্ছৃঙ্খল ও শান্তিভঙ্গকারী হিসাবেও দেশ ও দশের সর্বনাশ করে। বিভিন্ন চোখে এদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন রূপ ধরা পড়ে। তাই এদের চরিত্রের ওপর অগ্রসর না হয়ে চলুন আমরা নারী চরিত্র দেখি।

নারী চরিত্র

"নারীদিগকে সদুপদেশ দাও, কারণ তাহারা পঞ্জর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে এবং যদি পঞ্জরের কোন অংশ বক্র হয় তবে তাহা উন্নত থাকে। যদি তুমি উহা সোজা করিতে যাও তবে ভাঙিয়া যাইবে। যদি তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর তবে উহা চিরকালই বক্র থাকিবে। অতএব নারীদিগকে উপদেশ দাও।"[১]

ওপরের উদ্ধৃত বাণীটি হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর। যৌনবিজ্ঞানীরা তাঁর এ বাণী নিয়ে বিশ্লেষণ করলে নারী সৃষ্টি রহস্য, নারীর রূপ ও নারীর চরিত্র কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। সম্পূর্ণ চরিত্র তুলে ধরা সোজা কথা নয়। মনীষীরাও এ চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হিমশিম খেয়েছেন। যে দৃষ্টিতে যিনি দেখেছেন সেই দৃষ্টিতেই নারী তার চোখে ধরা দিয়েছে। কেউ তার সম্মোহনী মূর্তিতে আত্মবিস্মৃত হয়েছে। কেউবা তার অসহ্য জ্বালায় পুড়ে ছাই হয়েছে। আর কেউবা তার মায়াভরা প্রাণ পেয়ে বেহেশ্‌তের সুখ অনুভব করছে। গিরগিটি যেমন দিনে সাত বার রং বদলায় তেমনি নারীও দিনে কতবার যে তার রূপ বদলায় তার হিসাব কেউ দিতে পারবে না। গিরিগিটিকে দেখে কেউ বলে হলুদ, কেউ বলে লাল, কেউ বলে সবুজ, কেউ বলে নীল, কেউবা আরও অনেক রং দেখে। কারো কথার সঙ্গে কারো কথার মিল নেই। অথচ সবাই কি মিথ্যাবাদী? বলতে হয় সবারই কথা সত্য। সবার কথা মিথ্যা। নারী সম্বন্ধে বিভিন্ন যৌনবিজ্ঞানী যা বলে থাকেন তা সত্য এবং মিথ্যা দুটোই তো মিশ্রিত। এই সত্য ও মিথ্যা যা কিছু যখন ধরা পড়েছে মনীষী ও যৌনবিজ্ঞানীরা তখন সেভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তাই নারীকে প্রকৃতভাবে চেনার মাঝে যেমন রয়েছে ফাঁক তেমনি রয়েছে বিরাট ফাঁকি। যাঁরা নারী চরিত্রের শুধু ভালটুকু দেখেছেন তাঁদের দেখার মাঝে যেমন ফাঁক রয়েছে তেমনি যারা কামড়ানো বিচ্ছে, ভিমরুল, বোলতা ও শয়তানের যন্ত্র বলে নারীকে আখ্যায়িত করছে তারাও পুরুষকে দিয়েছে বিরাট ফাঁকি। নারী না হলে যে দুনিয়া চলতো না, ভালবাসার জন্ম হতো না, যৌন-তৃষ্ণা মিটতো না, বংশবৃদ্ধি হতো না, এসব কথা তারা ভেবে দেখেন নি। আবার যারা মাকাল ফলের ওপরটুকু দেখে সৌন্দর্যের বিচারে সেরা আখ্যায়িত করে স্থির নেত্রে তাকিয়ে আছেন তারা ভেতরের অংশটুকু দেখেন নি। যদি দেখতেন এবং এর ফল ভক্ষণ করতেন তাহলে আপনিও হয়তো বলতে বাধ্য হতেন যে—এমন বিশ্রী ও বিস্বাদ যুক্ত ফল আর দুনিয়াতে নেই। নারীর রূপও ঠিক তাই। দুই বিপরীত চরিত্রের সমাবেশে যে নারী সৃষ্ট, চলুন সে নারীর চরিত্র নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করি ও দেখি এর মধ্যে কি পাই।

১। হাদিস সগির। সংগৃহীত হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১। **যৌন-কামনা ঃ** নারীর যৌন-তৃষ্ণা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি হলেও বোঝা যায় না। ধীরে এবং অতি ধীরে কামভাব জাগ্রত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহের প্রতিটি যৌন-চুল্লি উত্তপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের যৌন-তৃষ্ণা ধরা পড়ে না। মনের স্থিরতা পুরুষের চেয়ে এদের অনেক বেশি। তাই শারীরিক কষ্টে যেমন অধীর হয়ে পড়ে মানসিক কষ্টে ততটুকু অধীর হয় না। লজ্জা ও জড়তাই এর অন্যতম কারণ। আর এ কারণের ফলেই নারীর প্রবল যৌন-কামনা সহজে ধরা পড়ে না।

২। **দুর্বলতা ঃ** পুরুষদের ভোলান যত সহজ, নারীদের ভোলান তত কঠিন নয়। লোভ, লালসা—বিশেষ করে সৌন্দর্যের প্রশংসায় এরা একদমই ভুলে যায়। যদি কোন ছেলে কোন মেয়ের নিকট তার রূপ ও গুণের মিথ্যা প্রশংসা করে তাহলে সে ছেলে ঐ মেয়ের মন জয় করবেই, এতে ভুলের কোন অবকাশ নেই। নারীকে বিভ্রান্ত ও বিপথে নেবার এ একটি বড় অস্ত্র। যদিও উচ্চ শিক্ষিতা বা সুচতুরী নারী বুঝতে পারে যে, যে প্রশংসা করা হচ্ছে তা সত্য নয়, তবুও ভুলে যায়। তুলনামূলকভাবে পুরুষের চেয়ে নারী যে বেশি গলে যায় এটাই তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পুরুষের মন যেমন কঠিন, নারীর মন তেমন নয়। একটি চাকর দশ বছর ধরে সততার সঙ্গে কাজ করে তার মুনিবের নিকট যতটুকু প্রশংসা না পায়, একটি নারীর অধীনে অনুরূপ ভাবে কাজ করে তার চেয়ে অনেক বেশি পুরস্কার পায়। বিবি খাদিজার চোখে হজরতের সুমহান চরিত্র যত সহজে ধরা পড়েছে, ব্যবসায়ের সামান্য লাভ পেয়ে যতটুকু সন্তুষ্ট তিনি হয়েছেন, সেরূপ দৃষ্টিতে অন্য কোন পুরুষের চোখে তিনি প্রথমে পড়েন নি। কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হতে তাই হৃদয়মন উজাড় করে তিনি হজরতের কাছে আবেদন জানালেন তাঁকে চিরসঙ্গিনী করে নিতে। নারী মনের এটা এক সুমহান উদারতা। এই উদারতাই নারীকে করে মহৎ।

পুরুষের সামান্যতম আদর, সোহাগ, রসিকতা ও সহানুভূতিতে যারা একান্ত আপন হয়ে ধরা দেয় হৃদয়ের কোণে অল্প সময়েই যারা বাসা বাঁধে, তাদের চরিত্র বিকৃত ভাবে কল্পনা করার হেতু কোথায়? নারীর এ দুর্বলতা না থাকলে পুরুষের কি উপায় হতো? পুরুষের ঠকবাজী, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ও স্বার্থ-লোভের নির্মম চরিত্র হাজার হাজার নারীর জীবনে এনে দেয় কলঙ্কের অভিশাপ, তবুও তারা পুরুষকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে ও তাদের প্রাণে আনন্দ দান করে।

৩। **সহিষ্ণুতা ও আবেগপ্রবণতা ঃ** সহিষ্ণুতার দিক থেকে নারী পুরুষের চেয়ে অনেক উন্নত; সংসারের তাপ, জ্বালা, অভাব, অনটন, দারিদ্র্যতা ও ছেলে-মেয়েদের বিরক্তি নীরবে অশ্রু বর্ষণ করেও সহ্য করে যায় তবু পুরুষের মতো গলায় দড়ি দিয়ে অথবা সংসার থেকে বিদায় নিয়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেয় না। এ জন্যই দেখা যায় যে পাঁচ সাতজন ছেলেমেয়ে রেখে স্বামী মারা গেলেও স্ত্রী ঘর থেকে পালায় না বা ছেলেদের গলায় ছুরি দিয়ে বা পানিতে ফেলে নিজে বাঁচতে চায় না। ভিক্ষা করে হলেও ছেলে-মেয়েদের ভরন-পোষণ করতে জীবন উৎসর্গ করে। পেটে সন্তান আসা থেকে আরম্ভ করে মানুষ করা পর্যন্ত যে অসীম কষ্ট নারীকে সহ্য করতে হয় তা সত্যই প্রশংসনীয়। নারীর এ সহিষ্ণুতার প্রশংসা নবী পয়গম্বরও করেছেন এবং পুরস্কৃত হবার আশ্বাস বাণীও দিয়েছেন। আমাদের হজরত বলেছেন—"তোমরা কি জান না যে রমণীগণ পুরুষের চেয়ে বেশি পুরস্কার পাইবার যোগ্য, কারণ মহিমাময় আল্লাহ্ বেহেশ্‌তে পুরুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন যেহেতু তাহার স্ত্রী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল।"[১]

১। হাদিস, সংগৃহীত—হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড—কৃত আজহারউদ্দিন এম.এ। পৃষ্ঠা ১৯।

অন্যত্র বলেছেন—"যখন কোন স্ত্রীলোক তার স্বামী কর্তৃক গর্ভবতী হয় তখন হইতে প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা সে স্ত্রীলোকটি দিনে রোজা রাখার ও সমস্ত রাত্রি নফল নামাজ পড়ার সওয়াব পাইয়া থাকে। আর যখন প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্‌তের মধ্যে এমন বস্তুসমূহ গচ্ছিত রাখিয়া দেন যে তাহার সন্ধান পৃথিবী, আকাশ, বেহেশত দোজখবাসী কেহই অবগত নহে। আর যখন সন্তান প্রসব করে তখন হইতে দুগ্ধ ছাড়ান পর্যন্ত প্রতি ঢোক দুগ্ধের পরিবর্তে আল্লাহ্ তাহাকে এক একটি করিয়া নেকী দান করিয়া থাকেন এবং সেই সময়ের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইলে শহীদের দরজা প্রাপ্ত হইবে। আর যদি তাহাকে তাহার সন্তানের জন্য কোন রাত্রি জাগিতে হয়, তবে আল্লাহ্ তাহাকে ঐ রাত্রি জাগরণের পরিবর্তে সত্তরটি গোলাম আজাদ করার ছওয়াব দিয়া থাকেন।"

তৎপর তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে—"এই সওয়াবসমূহ কেবল ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকেই দেওয়া হইবে যাহারা সর্বদাই আল্লাহর হুকুম পালন করিয়া সতী-সাধ্বীর অন্তর্ভুক্তা হইতে পারিয়াছে। অবাধ্য স্ত্রীলোকদিগকে আল্লাহ্ ঐ সওয়াব দিবেন না।"[২]

আবেগ ও উচ্ছ্বাসে নারী যত উদ্বেলিত হয় পুরুষ তা হয় না। সুসংবাদে তার মনে জোয়ারের বেগে আনন্দ আসে, আবার দুঃসংবাদে মুহূর্তের মধ্যেই চোখে তার মেঘের বারি বর্ষিত হয়। হৃদয়ের আবেগ ধারণ করার শক্তি পুরুষের চেয়ে নারীর অনেক বেশি। প্রিয়জনের মৃত্যুতে নারী বছরের পর বছর কেঁদে তার ব্যথার উপশম করে কিন্তু পুরুষ সেরূপ কঠিন আঘাতে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে অথবা হার্টফেল করে।

ভয়, ভীতি, লজ্জা, বিনয় নারী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই পুরুষ ছেলেরা তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ পায়।

৪। **শক্তির পূজারিণী ঃ** নারীদেহের শক্তি পুরুষের চেয়ে অনেক গুণে কম। তাই মানসিক ও দৈহিক দিক থেকে এরা অনেক দুর্বল। তবু এরা চায় তার স্বামীর অসীম শক্তি ও সাহস। দুর্বল পুরুষকে তারা মোটেই পছন্দ করে না। ধন, মান, ইজ্জত, গাড়ি, বাড়ির মালিক স্বামীর চেয়ে বীর পুরুষ, যোদ্ধা, বল বীর্যবান, দীপ্তিভরা চোখের চাউনি, গম্ভীর স্বরের পুরুষকে একটি ক্ষীণা নারীও পছন্দ করে। শক্তির কাছে তারা হার মানে, শক্তিশালী পুরুষের বুকে মাথা গুজে আনন্দ পায়। তাই দেখা যায় অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা যুবতী কালো বীরপুরুষের প্রেমে পড়ে। এরূপ ঘটনা একটি দু'টি নয়—শত শত। আর এমন দৃষ্টান্ত শুধু বাঙালী বা ভারতবাসীর মাঝেই নয়, সুসভ্য বিদেশেও তাই দেখা যায়।

যুদ্ধের সময় দেখা যায়, বীর যোদ্ধার বাহুডোরে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মেয়েরা নিজেদের সঁপে দেয়। আমার পূর্বপুরুষের ইতিহাস শুনেছি—নীলকুঠি সাহেবের অত্যাচারে যখন নারী-পুরুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, তখন আমার প্রপিতামহ সালামত সরকারের কাছে সবাই এসে অভিযোগ জানাল এবং এর প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করল। তিনি সবাইকে বুদ্ধি দিলেন নীলের বীচি সিদ্ধ করে বুনে দিতে। চাষীরা তাই করল এবং দেখা গেল একটি বীজও অঙ্কুরিত হয় নি। এর পর অনুসন্ধান করে যখন সাহেব জানতে পারল সালামত সরকারের বুদ্ধিতে এমন হয়েছে তখন সমস্ত ক্রোধ তাঁর ওপর পড়ল। সাহেব ধুনট থানায় (বগুড়া) তাকে ডেকে পাঠালেন। বাকযুদ্ধে তাঁকে হারাতে না পেরে

২। হাদিস, সংগৃহীত—মকসুদুল মোমেনীন ও স্ত্রীশিক্ষা। পৃষ্ঠা ৩৩১-৩২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাইফেল উঁচু করে যখন মারতে উদ্যত হলেন সালামত সরকার তখন বীরবিক্রমে তার ওপর সবাইকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মুহূর্তের মধ্যে ইংরেজ সাহেবকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। তখন ইংরেজের দেশ আর তাদের শাসন। এ অবস্থায় একজন ইংরেজ সাহেবকে এমনিভাবে মেরে ফেলা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

শৌর্যে বীর্যে ভরা এমন এক বাঙালী বীরপুরুষের সাহস দেখে মেমসাহেব নিজেকে হারিয়ে ফেলল। আত্মসমর্পণ করল তারই কাছে। শুধু তাই নয়—এ মহাপুরুষের পায়ে পড়ে অনুরোধ জানালো তাকে বিয়ে করতে। ফিরে গেল না নিজের দেশে, বিয়ে করল না নিজ জাতিকে।

ইংরেজ মেয়েরাও যে শক্তির পূজারিণী এ মেমসাহেব তাই প্রমাণ করল। যতদিন সে বেঁচেছিল ততদিন এ বীরপুরুষেরই সেবা করেছে। এ মেমসাহেবের গর্ভজাত সন্তানেরা আজও বেঁচে আছে।

বিদেশী নারীর এরূপ আর একটি গল্পের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। গল্পটি লিখেছেন বিদেশী লেখক মিঃ অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর—A Gloriutive Tragedy পুস্তকে।

এক সচ্চরিত্রবান যুবক এক সুন্দরী সুশিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর থেকেই তিনি তাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি ধনী ব্যবসায়ী, তাই তার মনস্তুষ্টির জন্য যখন যা পছন্দ করতেন স্ত্রীকে দিতেন। স্ত্রীও খুশি থাকতেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দুজনের বাধ্য ছিল। একবার তাঁরা বেড়াতে গেলেন ফ্লোরেন্স শহরে। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর মেয়েটি রাজকুমারের সান্নিধ্যে আসে। এবং ধীরে ধীরে তার প্রেমে পড়ে। একদিন স্বামীর চোখে এ গোপন প্রেম ধরা পড়ল। সে রাজকুমারকে মল্লযুদ্ধে অপূর্ব শক্তি ও বীরত্ব দেখিয়ে হারিয়ে দিল এবং শেষে হত্যা করল। স্বামীর এ অসাধারণ কৌশল ও শক্তি দেখে দৌড়ে গিয়ে স্বামীর কোলে মাথা রেখে আনন্দের আবেশে বলল—"I did not know that you are such a strong man"

দুর্বল সবলের খোঁজ করে। সবলকে সম্বল করেই দুর্বল আত্মপ্রকাশ করে ও গৌরবান্বিত হয়। এই নিয়ম শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবজন্তু ও তরুলতার মধ্যেও এমন নিদর্শন দেখা যায়। আলোকলতা, কুঞ্জলতা, লাউ, কুমড়া, বেনে বউ প্রভৃতি সবল বৃক্ষ অথবা শক্ত বাঁশের মাচায় আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে ফল-ফুলে সুশোভিত হয়ে নিজের রূপ ও গুণের বিকাশ করে। এ আশ্রয় যদি এরা না পেত তাহলে যেমন নিজ দুর্বলতার পাপেই মৃত্যু বরণ করত, ঠিক তেমনি নারীজাতি সবল পুরুষের বাহুপাশে না এলে কপাল ঠুকরে ঠুকরে কাঁদত আর অকালে মৃত্যু বরণ করে দুর্বলতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতো।

শক্তিশালী পুরুষের সেবায় নারী আনন্দ পায়, তাদের বলবীর্য হিম্মত দেখে গর্বিত হয়। যত দুর্বলই হোক না কেন, সে চায় তার স্বামী সবার চেয়ে শক্তিশালী হোক। সবাই তার শক্তির কাছে হার মানুক। পুরুষের কাপুরুষতা, ভীরুতা, দীনতা, শক্তিহীনতা তারা পছন্দ করে না।

নারী শক্তি চায়, শক্তিকে পছন্দ করে, শক্তির পূজা করতেই সে আনন্দ পায়। এক কথায় বলতে হয় নারী শক্তির পূজারিণী।

৫। **মায়াবিনী ঃ** শুধু এদেশের নারীরাই নয়, বিশ্বের প্রতিটি দেশের নারীজাতি মাত্রই বড় মায়াবিনী। এদের মায়া, মোহ, ছলা-কলা ও অভিনয়ের কাছে পুরুষ জাতি পরাস্ত। তাদের চেহারা, চাল-চলন, কথার ভঙ্গি, সুমিষ্ট গলার স্বর, আড় নয়নের চাউনিতে পুরুষ জাতি মাত্রই পাগল হয়ে ওঠে। প্রেম ও ভালবাসার আবেগে এরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলে। মায়াবিনী সেজে এরা চায় পুরুষকে আত্মভোলা করে তুলতে। পুরুষের প্রেমকে কেন্দ্রীভূত করে তারই দিকে সর্বদা আটকে রাখে। তাই কাজে, কর্মে, ব্যবহার ও চাল-চলনে স্বামীকে একথাই বুঝিয়ে দেয় যে আমিই তোমার আপন—আর কেউ নয়। নারীর এ ছলনা বৃথা যায় না। বিবাহের কিছুদিন পরই সরল সুবোধ বাপ-মার একান্ত আদরের ছেলেটিও পর হয়ে যায়। ভাই-বোন আর ভাল লাগে না। মায়ের আদরও আর পছন্দ হয় না। ছলনাময়ী মায়াজালের অভিনেত্রী নারী সমাজ সত্যি আল্লাহর অদ্ভুত এক সৃষ্টি। এরা না থাকলে হৃদয়ের প্রেম আঁধারে হাবু-ডুবু খেত, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যেত অথবা মরীচিকা হয়ে মরুর বুকে চিরদিন হাহাকার করত।

৬। **বিশ্বাসিনী ঃ** অতি অল্প কথায় নারীকে যেমন বিশ্বাস করানো যায়—প্রেমের সামান্য ইঙ্গিতে এদের যেমন ভোলান যায় তেমন পুরুষদের যায় না। নারী-হৃদয় পুরুষের চেয়ে অনেক কোমল। কোন নারীকে যদি বলা যায় "আমি আপনাকে ভালবাসি বা শ্রদ্ধা করি", প্রমাণ ছাড়াই নারী তা বিশ্বাস করে। এদের নিকট টাকা পয়সা বা সোনা-দানা বিশ্বাস করে গচ্ছিত রাখলে জীবন দিয়েও তা রক্ষা করে। পুরুষের বেলায় প্রায়ই দেখা যায় এর ব্যতিক্রম। পুরুষ গচ্ছিত মাল বিশ্বাসী হয়ে নির্বিবাদে ফিরিয়ে দেয় এরূপ দৃষ্টান্ত থাকলেও নারীর তুলনায় এর শতকরা হার বড় কম। নারীরা প্রেমের ক্ষেত্র ছাড়া প্রতারণা কম জানে।

প্রেমের ক্ষেত্রেও যেটুকু প্রতারণা তারা করে তা শুধু নিজের সম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষার্থেই করে থাকে। কেননা পুরুষেরা এদের দেহ ভোগ করার জন্য যখন উন্মাদ হয়ে পড়ে, মান-অপমানের খেয়াল করে না, তখন নারী নানা কলাকৌশলে নিজেকে বাঁচাতে ছেলেদের প্রতারিত করে। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। আমি নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত স্বভাবকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো লিখছি। পুরুষ নারীদেহ ভোগ করার পর আস্তে আস্তে ভালবাসতে শুরু করে আর নারী পুরুষকে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করার পর ভালবাসতে থাকে ও পরে দেহদান করে। নারী যাকে বিশ্বাস করে তাকে প্রাণ থেকেই বিশ্বাস করে। যাকে ভালবাসে তাকে প্রাণ দিয়েই ভালবাসে। এ ভালবাসা তারা ছিন্ন করতে চায় না। পুরুষের ভালবাসা যেমন ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর, নারীর ভালবাসা পক্ষান্তরে তেমনি স্থায়ী ও স্থির। পুরুষ ভালবেসে ভোগ করে ও ভুলে যায়, নারী ভালবেসে ভুলে যায় না। প্রেমিকের স্মৃতি নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয় নারীর এ চরিত্র সত্যই প্রশংসনীয়।

৭। **বিদ্বেষিণী ঃ** নারী তার ভালবাসা কাউকে ভাগ করে দিতে রাজি নয়। সে চায় একচ্ছত্রভাবে তার ভালবাসা স্বামীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক। এজন্যই স্বামীর ওপর তাদের দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ থাকে। অনেক সময় অহেতুক সন্দেহে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে ও সংসারে অশান্তি ঘটায়। চাকরানী স্বামীর পরিচর্যা করুক, কোন যুবতী মেয়ে তার সঙ্গে কথা বলুক, কোন আত্মীয় বা প্রতিবেশী নারী তার সঙ্গে মিশুক এটা তারা মোটেই সহ্য করতে পারে না। ফেরেশ্‌তা তুল্য স্বভাবের পুরুষকেও সন্দেহ করে বসে ও আপন ইচ্ছামতো বকাবকি করে। এর ফলে কত সোনার সংসার যে ধ্বংস হয়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই। সন্দেহের এ বীজ জন্মগতভাবেই যেন তার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়। ফরাসী, আরবী, পাঞ্জাবী,

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাঠানী, বাঙালী, ভারতীয়, জাপানী, জার্মান, ইংরেজ, আফ্রিকান বলে কথা নেই। সাদা-কালো, শিক্ষিতা-অশিক্ষিতার মধ্যেও কোন তারতম্য নেই। এ বিষয়ে সবাই যেন এক ছাঁচে ঢালা। কোন দেশের কোন পুরুষই হলফ করে বলতে পারবে না যে তার স্ত্রী এ বিষয়ে তাকে সন্দেহ করে বকাবকি বা ঝামেলা করে নি।

মেয়েরা চাকর দেখতে পারে, চাকরানী দেখতে পারে না। দেবর দেখতে পারে ননদ দেখতে পারে না, শ্বশুর দেখতে পারে শাশুড়ি দেখতে পারে না। ভাই দেখতে পারে, বোন দেখতে পারে না। একপাল পুরুষ দেখতে পারে একটা সতীন দেখতে পারে না।

কথাগুলো পড়ে সবাই হাসবেন জানি, তবুও কি এটা সত্য নয়? কত আদর সোহাগ করে মা ছেলেকে মানুষ করে। একটা লাল টুকটুকে বউ দেখার জন্য স্বামীকে রাতদিন খোঁচাতে থাকে। বউ ঘরে আসলে কি স্ফূর্তি। কত জনকেই না ডেকে ডেকে দেখায় আর গর্ব করে যে ঘরে বউ এসেছে। কোন কাজে হাত দিতে দেয় না। কাজ করতে গেলে হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে বলে—আমি কি কাজ করতে তোমাকে এনেছি? শুধু তোমার শ্বশুরের একটু সেবা কর। আস্তে আস্তে আদর যেন উঠতে থাকে। যখনই দেখে তার ছেলে বউয়ের খুব ভক্ত হয়ে যাচ্ছে তখন থেকেই আড় নয়নে তাকায় আর নানা কাজের ফরমায়েশ দেয়। বউ এখন আর ভাত খাবার সময় পায় না। কোথায়বা শ্বশুর-শাশুরির সেবা করে, শুয়ে বসে খায়, স্বামীর সঙ্গে গোপনে একটু হাসবে, আলাপ করবে সেও করতে পারে না। বউয়ের এ দুর্নাম ও দুর্নাম—নানা দুর্নাম করে শ্বশুরের কান ঝালাপালা করে তোলে। ছেলেকে অবশ্য বেশি কিছু বলার সাহস পায় না, তাহলে যদি ছেলে আবার বিগড়ে যায়। এর ওপর যদি বা দেখে যে ছেলে গোপনে দু-একটি সখের জিনিস বউকে দিয়েছে তাহলে তো আর কথাই নেই। বলবে, এ সোনার সংসার ধ্বংস হয়ে গেল। এদিকে বউও শাশুরি-ননদের ওপর বিগড়ে যেতে থাকে। এ কথা ও কথা, এক গাদা দুর্নাম স্বামীর কানে ঢালতে থাকে। স্বামী বেচারা কোন্ দিকে যায়? এদিকে মা, ওদিকে বউ। কোনটি কম নয়। মাকে কিছু বললে ভাত পায় না, বউকে বললে তো একদম বাপের বাড়ি। কিছুদিন এভাবে পার হবার পর অশিক্ষিত ছেলেরা পৃথক হয়ে যায়, আর শিক্ষিত ছেলেরা চাকরির খোঁজে পাগল হয়ে ওঠে। এম. এ. পাস ছেলে একটা কেরানির চাকরি পেলেও যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। খুব কম সংসারে দেখা যায় বউ এবং শাশুড়ি একত্রে সুখের সংসার গড়ে তোলে। পারিবারিক বিচ্ছেদ, কলহ ও হিংসার একমাত্র কারণই হলো এরা হিংসাপরায়ণা। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বলতে হয় সমজাতিতে Repulsion অর্থাৎ বিকর্ষণ। নারীতে নারীতে কোনদিন আকর্ষণ জন্মে না, মিল হয় না।

পুরুষছেলেরা যেমন দশটি বিয়ে করলেও সবাইকে ভালবাসতে পারে, সবার মন জুগিয়ে চলতে পারে—নারী তা পারে না। এরা স্বামীকে বাঘ ভাল্লুকের মুখে তুলে দিতে যতটুকু ভয় না পায় সতীনের হাতে তুলে দিতে তার চেয়ে বেশি ভয় পায়। সতীনের বাপ, মা, ভাই, বোন এমন কি তার প্রিয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তান যা সতীনের পেট থেকে জন্মে তারাও যেন চির শত্রু। সতীনে সতীনে ঝগড়া হয়ে যে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে তা দেখলে নারী জাতির ওপর আর মায়া থাকে না। এই কয়েকদিন আগে আমারই বাড়ির পাশে এমন এক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেল যা দেখে হাজার হাজার মানুষ স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। সতীনের ওপর রাগ করে জনৈকা মহিলা নিজ ঔরসজাত তিনটি সন্তানকে বিষ পান করিয়ে শেষে নিজে বিষ পান করে প্রাণত্যাগ করল।

৮। **বিলাসিনী ঃ** প্রকৃতি হতেই নারী বিলাসপ্রিয়। ভাত এক মুঠো কম হলেও চলে কিন্তু বিলাস সামগ্রী তার না হলে যেন মনই ওঠে না। নিত্য নতুন শাড়ি, ঝকঝকে বাড়ি, গা-ভরা সোনা, পরিষ্কার বিছানা এটা হলে গর্বে তার বুক ফুলে থাকে। একটা অশিক্ষিতা মেয়ে বিলাসিতার গর্বে সুশিক্ষিতা একটা গরিব মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা বোধ করে।

অতি আধুনিকা ও অতি বিলাসিনী মেয়েরা এ জন্যই অহঙ্কারী ও দাম্ভিকা হয়। বিলাসিতা প্রয়োজন। এটা মানুষের গুণ-রাশির মধ্যে অন্যতম। মেয়েরা বিলাসিনী না হলে সংসার সুন্দর হতো না। মনে আনন্দ আসত না। তাদের প্রতি এত আকর্ষণও পুরুষদের জন্মাত না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তবে যে বিলাসে অহঙ্কার আসে সে বিলাসে পতন ঘটে। বিলাসিতার মোহে পড়ে নারী অনেক সময় জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তাই সংসারে অনর্থ ঘটায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সুশিক্ষিত স্বামীকে রেখে কালো, কুৎসিত ও অশিক্ষিত এক ধনীর ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। গরিব, কৃপণ ও বিলাসহীন স্বামী মেয়েরা সাধারণত পছন্দ করে না। নিজেরাও যেমন বিলাসপ্রিয় হতে চায়, স্বামীকেও তেমনি বিলাসপ্রিয় দেখতে চায়। এটা তাদের প্রকৃতিগতই এক স্বভাব। অনেক মেয়ে এ বিলাসিতার অসাধারণ মোহে পড়ে সোনার সংসার ছারখার করে দেয়। এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। এ জন্যই হজরত নিজেও বিলাস জীবন যাপন করেন নি—তাঁর অতি আদরে কন্যা ফাতেমাকেও বিলাসিতার মোহে নিমজ্জিত হতে দেন নি। এ সম্বন্ধে অনেক ঘটনা রয়েছে।

৯। **সংসারিনী ঃ** শহরে, বন্দরে, ঝোঁপে, জঙ্গলে, আড়ালে যেখানেই বাস করুক না কেন নারী চায় তার স্বামীকে নিয়ে একটি সুখের সংসার গড়ে তুলতে। এ সংসার ছোট হোক, বড় হোক ক্ষতি নেই। গৃহিনী হয়ে আপন হাতে সাজিয়ে-গুছিয়ে কর্তৃত্ব করবে, আপন হাতে স্বামীর সেবা করবে, খাবার তৈরি করবে, ছেলেমেয়ে কোলে করে মানুষ করবে এটাই তার একান্ত সাধ, প্রাণের ইচ্ছা, মনের নিগূঢ় কথা। তাই বয়স বৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাবা-মার সংসার দেখে হৃদয়ের নিভৃত কোণে ভেসে ওঠে আপন সংসার। তাই খেলনার বস্তু হয় ছোট ছোট হাড়ি, পাতিল, থালা, বাসন, চেয়ার, টেবিল ও টেলিফোন। ছেলেরা যেখানে চায় বন্দুক, মেয়েরা সেখানে চায় সিন্দুক। ছেলেরা চায় নৌকা, মেয়েরা চায় চৌকা। ছেলেরা বল নিয়ে খুশি, মেয়েদের পুতুলে ফুটে হাসি।

যতই দিন যেতে থাকে ততই তারা সংসারের স্বপ্নে মাতে। চন্দ্রে অভিযান নয়, পর্বত আরোহণ নয়, সমুদ্রের দুর্গম পথেও নয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে সংসারের পথে এগিয়ে যেতেই চায় তার ব্যাকুল মন। নারী যদি সংসারিনী না হতো তাহলে পুরুষের সারাদিন পরিশ্রমের কোন অর্থই হতো না। পুরুষ উপার্জন করতে জানে, গোছাতে জানে না। খেতে জানে, খাবার তৈরি করতে জানে না। ছেলেমেয়েদের জন্ম দিতে জানে। মানুষ করতে জানে না। এ কৌশল, এ বিদ্যা নারীরই আয়ত্তে। নারী ভিন্ন সংসার অচল। সংসারের সৌন্দর্য, সুখ, শান্তি ও আনন্দের মূলেই এ নারী। নারীহীন সংসার মরুভূমির তুল্য।

বিবাহের পর নারী যখন সন্তানের মা হয় তখন থেকেই পূর্ণভাবে শুরু হয় তার সংসার-জীবন। ছেলেমেয়েদের খাওয়া পরা পোশাক-পরিচ্ছদ, লেখা-পড়া, সংসারে আয়-উন্নতি সবকিছুই নারী নিজ হাতে করতে চায়। চায় তার স্বামীকে সাহায্য করতে, উন্নতির পথে তুলে দিতে। সংসারের তাপ-জ্বালা থেকে মুক্ত করতে। তাই অনেক সময় পুণ্যবতী নারী দুঃখ-কষ্ট নীরবে সহ্য করে, ক্ষুধার জ্বালা হাসি মুখে উড়িয়ে দেয় তবুও চায় স্বামী দীর্ঘজীবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

হোক, অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে উপার্জন করুক আর ছেলেমেয়েদের মানুষ করে গড়ে তুলুক। এ নারীরাই আদর্শ গৃহিনী, শান্তিদায়িনী ও প্রকৃত সংসারিনী।

১০। **বিশ্বাসঘাতিনী ঃ** বিশ্বাসিনীর রূপে আমরা পূর্বে নারীকে দেখে তার চরিত্রের একটা রূপ বর্ণনা করেছি। এটা মিথ্যা নয়। তবে এর পেছনে নারীর অন্য আর একটা রূপ যা দেখা যায় তা অতি ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক। এ রূপটি হলো নারীর অতি নিকৃষ্ট রূপ—বিশ্বাসঘাতিনী। নারী চরিত্রের ও কলঙ্কজনক অধ্যায় নিয়ে ইতিহাসের কি পরিবর্তন ঘটেছে 'সৃষ্টি বৈচিত্র্য' পরিচ্ছেদে তার অতি সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি। বিশ্বাসঘাতিনীর জাত নবীকে বিষ দান করেছে। হাজার হাজার নৃপতিকে সিংহাসনচ্যুত করেছে। লক্ষ লক্ষ স্বামীকে হত্যা করেছে। রাজায় প্রজায় বিরোধ বাধিয়েছে। বীর যোদ্ধাদের পতন ঘটিয়েছে। শাশুরি-ননদের গলায় ছুরি বসিয়েছে। সোনার সংসারে আগুন জ্বালিয়েছে। বিশ্বাসঘাতিনী নারীর এ জঘন্য রূপ কে না জানে? কোন মহা মনীষীর চোখ থেকেই এরা এড়ায় নি। হজরত দাউদ (আঃ) তাঁর ছেলেদের সম্বোধন করে বলেছেন—**"ব্যাঘ্র ও অজগরের পেছনে যাওয়াও শ্রেয়ঃ কিন্তু কামিনীর পেছনে যাওয়া সঙ্গত নয়।"**[১]

মনু বলেছেন—"ইহলোকে পুরুষকে দূষিত করাই নারীদিগের স্বভাব।"[২]

চাণক্য বলেছেন—'বিশ্বাস করো না নারী, নদী, নখা ও নরপতিকে, কেননা এরা বড় বিশ্বাঘাতক।'[১]

নারীর চরিত্র বড় বিস্ময়কর। বিবাহিতা স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে অন্য ছেলের সঙ্গে গোপনে প্রেমে হয়তো বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে তবু বোকা স্বামী কিছুই বুঝছে না। অনেক মেয়েকে দেখা যায় গোপন প্রেমিকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজ স্বামীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এ ঘটনার মূলে থাকে গোপন যৌন-ক্রিয়া। আদালতে গেলে এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

পুরুষ নারীর স্বভাব বিচার করতে জানে না। তার বিদ্যুৎ ঝলকানো হাসি, রক্তিম গণ্ড, পোশাকের বাহার, মৃদু মধুর কথা, হরিণী চোখের চাউনি, এলো-মেলো কেশ ও চুড়ির ঝন-ঝনানীর শব্দ পুরুষকে পাগল করে তোলে। এ সময় তারা মিলনের নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে। তাই নারীর দুরভিসন্ধি কি, মনের গোপন বাসনা কি, পুরুষের বিচার করার ক্ষমতা থাকে না। বিশ্বাসঘাতিনী নারী ঠিক এ সময়েই পুরুষের দুর্বলতা বুঝে একান্ত গোপন কথাটিও তার অন্তর থেকে বের করে নেয়। আর সময়মতো উদ্গীরণ করে তার প্রকৃত মূর্তিটি তুলে ধরে।

যৌন-লিপ্সার মানসে নারী যে অঘটন ঘটায়, যে কদাকার ও কুৎসিত কার্যে লিপ্ত হয় তা পুরুষ মোটেই চিন্তা করতে পারে না। কুরূপ, সুরূপ এদের চোখে ততটুকু বিচার্য নয়—যতটুকু বিচার্য পুরুষের স্বাস্থ্য ও যৌন-ক্ষমতা। সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী ইংরেজ মেয়েরা কালো কুৎসিত নিগ্রো আফ্রিকান্ যুবকদের প্রেমে প্রায়ই পড়ে। এর মূলে নারীর যৌন-সম্ভোগের লোভ। এ লোভেই নারীকে বিশ্বাসঘাতিনীর রূপে রূপায়িত করে।

১। সৌভাগ্যের পরশমণি—তর্জমা, বিনাশ খণ্ড।

২। মনুসংহিতা।

১। সংগৃহীত—পিপাসা পত্রিকা।

এ জন্যই বোধহয় মনু বলেছেন ঃ—

"নৈতারূপং পরীক্ষন্তে নাসং বয়সি সংস্থিতি।
সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে"—১৪
"পৌংশ্চল্যার্চ্ছল চিত্তাচ্চ নৈঃ স্নেহ্যাচ্চ স্বাভবিতঃ।
রক্ষতা যত্নতোপীহ ভর্তৃস্বেতা বিকুব্বতে"—১৫
"এবং স্বভাবঃ জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতি নিসর্গজম।
পরমং যত্ন আতিষ্ঠেৎ পুরুষৌ রক্ষণং প্রতি।"—১৬

অর্থাৎ 'স্ত্রীলোকেরা সৌন্দর্যের অন্বেষণ করে না, বয়সের বিচার করে না, সুরূপ কিংবা কুরূপ বলিয়া বাছবিচার তাদের কাছে নাই—যে কোন প্রকারের পুরুষ পাইলেই তাহার সহিত সম্ভোগ আরম্ভ করিয়া দেয়।" ১৪

"পুরুষ লোক দেখা মাত্রই তাহার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার লালসা স্ত্রীলোকদিগের মনে জাগ্রত হইয়া উঠে; এইজন্যই এবং চিত্তের স্থিরতা না থাকায় তাহারা স্বভাবত স্নেহশূন্য হওয়ার কারণে, স্বামী কর্তৃক সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা স্বামীর অগোচরে ব্যভিচার প্রভৃতি কু-ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়।"১৫

"স্ত্রীলোকদিগের এই স্বভাব স্বয়ং বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট—ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়া পুরুষেরা নারীদিগের রক্ষণের প্রতি অতিশয় যত্নবান থাকিবে।"১৬

কথাগুলো সাধারণভাবে নারী জাতির প্রতি প্রযোজ্য। এর অর্থ তাই এভাবে বলা ঠিক হবে না যে প্রতিটি নারী বিশ্বাসঘাতিনী বা কুলটা। প্রতিটি নারীই যে পুরুষ সাহচর্য লাভ করতে চায় এবং সবারই যে পুরুষ দেখে সঙ্গমের লালসা জাগে তা বললে অন্যায় করা হবে। মনু যা বলেছেন, তা হয়তো নারী জাতির মনের কথা—কার্যক্ষেত্রের কথা নয়।

মনের বেদনা নারী চাপা দিয়ে রাখতে পারে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। একটা প্রবাদ আছে—'নারীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।'

তাই কথাগুলো আমরা নারীর সাধারণ চরিত্রের মধ্যে রেখেই বিচার করছি। বিশেষ ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে উলটো অর্থ বুঝতে চাই না।

১১। **কলহিনী ঃ** নারীর গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছি। এবার লিখতে হচ্ছে তার প্রকৃত গুণের কথা। এ গুণ শতকরা কম হলেও সত্তরটি নারীর মধ্যে দেখা যায়। এরা শান্তিদায়িনী সত্য কথা। কিন্তু কলহিনী হিসাবে এদের যে দুর্নাম জগৎ জুড়ে আছে তা অস্বীকার করার নয়। নবী-পয়গম্বর পর্যন্ত তাদের এ স্বভাবকে ভয় করতেন। দশ ভাই একত্রে দশ বছর কাটালেও কারো সঙ্গে কারো কলহ হয় না, অথচ দশ ভাই বিবাহ করার পর একত্রে দশ মাস কাটাতে পারে না। এমন অশান্তি ও কলহের সৃষ্টি হলে সংসার যেন দোজখের রূপ নেয়। ঝগড়া, কলহ, দুর্নাম, অপবাদ, নিন্দাচর্চা এদের মজ্জাগত স্বভাব। পেটে মোটেই কথা থাকে না। কথায় যে সর্বনাশ হতে পারে, স্বামীর অমর্যাদা ডেকে আনতে পারে, ভবিষ্যৎ অসুখের হতে পারে, এ চিন্তা তারা মোটেই করে না। কথা পেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা তা বমি করে অন্য দু-চার দশজন নারীর কাছে পৌছিয়ে দেয়। হাটে ঢোল দিয়ে যত সকালে কথা ঘরে ঘরে পৌছিয়ে দেওয়া না যায় একজন চোগলখুরী নারীর কানে দিলে তার চেয়ে অনেক সকালে পৌছান যায়। এজন্যই পুরুষের অনেক আপদ ও বিপদ এসে হাজির হয়। দুনিয়ার বুকে যে সব অঘটন ঘটেছে তার মূলেই ছিল এ নারী। এর উদাহরণ 'সৃষ্টি বৈচিত্র্য' পরিচ্ছেদে প্রথমেই দিয়েছি। আমার নবীও এ কথাই বলে গেছেন যে, সর্বপ্রথম এ পৃথিবীতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে কলহের সূত্রপাত হয় তা ছিল নারীকে নিয়ে ইহুদিদের মধ্যে। এ বিষয়ের ওপর আমি 'বিজ্ঞান না কোরআন' পুস্তকে প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। কলহিনী হিসাবে নারীর দুর্নাম সৃষ্টির শুরু থেকেই। একটা সোনার সংসারকে কিভাবে ধ্বংস করতে পারে, একটা জাতির কিভাবে পতন এনে দিতে পারে সে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। 'সৃষ্টি বৈচিত্র্য' পরিচ্ছেদে এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

পয়গম্বরগণ পর্যন্ত তাদের এ নির্মম কলঙ্কের জাল থেকে রক্ষা পান নি। লুত পয়গম্বর তাঁর স্ত্রীর হাতে উঠতে বসতে কিভাবে অপমানিত হতেন, সমউন পয়গম্বর স্ত্রীর চক্রান্তে পড়ে কেমন নির্মমভাবে কাফেরদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন তা চিন্তা করলে শরীর শিহরিয়ে ওঠে। এদের প্রতি তখন আর মায়া থাকে না। হজরতকে বিষ পান করতে দিয়েছিল এ কলঙ্কিনীর জাত নারী। এজিদের স্ত্রী হবার লোভে হাসানকে বিষ দিয়ে হত্যা করল সেও এ নারী। ছলনাময়ী, রহস্যময়ী এ নারী। এদের আসল রূপ যদি প্রকাশ পেত তাহলে ভালবাসার পরিবর্তে পুরুষ এদের ঘৃণার চোখে দেখত। সংসার থেকে পালাত এবং হিন্দু মুনী-ঋষীর মতো চিরকুমার ব্রত নিয়ে ওদের সঙ্গে লীলাখেলা করত। এদের চরিত্র না দেখে সাধে কি হের হিটলার পর্যন্ত মেয়েদের বলেছিলেন, "Go to the kitchen." এ নির্বোধ মেয়েদের জন্যই পৃথিবীতে যত আপদ আর গ্লানি।

নারী চরিত্র পরিচ্ছেদ আরম্ভ করার আগেই আমি রসুল (দঃ)-এর একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছি। সবার হয়তো অমর বাণীটির কথা স্মরণ আছে। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে, নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ হাড়কে সোজা করার চেষ্টা করলে ভেঙে যাবার সম্ভাবনা আবার একেবারে ছেড়ে দিলে চিরদিন তা বাঁকাই থাকবে। এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত আর হয় না। নারীর চরিত্র সবটুকুই তো এই বাণীর মধ্যে নিহিত।

আমরা নারীকে নিয়ে যত বই পুস্তক ও কাব্য রচনা করি না কেন, প্রেমের সমাধি গেঁথে চিরস্মরণীয় করে রাখি না কেন, নারী তার ঐ বক্র স্বভাব নিয়ে চিরদিনই নারী। পুরুষের মতো সহজ সরল ও উদার নয়। কলহ, বিদ্বেষ ও হিংসার মনোভাব ছেড়ে নারী যদি সরল মনে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াত তাহলে এ ধরাতেই বেহেশ্‌ত রচনা করা যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সম্ভব হয় নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

যৌন মিলন

সৃষ্ট জীব মাত্রেরই যৌন-ক্ষুধা আছে। এ ক্ষুধা চরিতার্থ করতে বিপরীতধর্মী সৃষ্টি বিভিন্ন উপায়ে ও ভঙ্গিতে মিলিত হয়। সেহেতু এ যৌন-তৃষ্ণা মেটান অপরাধ নয়। যৌন-তৃষ্ণাই একে অপরের প্রতি আকর্ষন নিয়ে আসে। আর এ আকর্ষণ থেকেই জন্মলাভ করে মায়া, মমতা, প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা।

যৌন-মিলন নারী ও পুরুষের এক মধুর আনন্দ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় অতি সন্তর্পণে ও গোপনে। এ অনুষ্ঠানের নায়ক ও নায়িকা যে অভিনয় করে তা অন্য কোন অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। যদিও প্রতিটি নারী ও পুরুষ এ অনুষ্ঠানের কথা জানে তবুও এর সৌন্দর্য রক্ষার্থেই হোক বা চিরাচরিত নিয়মানুযায়ীই হোক একান্ত গোপনেই একে রক্ষা করে। তাই এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অন্যান্য অনুষ্ঠানের চেয়েই অনেক বেশি। যে

অনুষ্ঠানের মাঝে দেহ ও মনের খোরাক আছে, যে অনুষ্ঠান সৃষ্টির পদ্ধতিকে অক্ষুণ্ন রাখছে, সে অনুষ্ঠান করতেই হবে, তার মর্যাদাও রাখতে হবে।

যৌন-মিলন বা সঙ্গমের কথা শুনলেই আমরা লজ্জায় কান ঢেকে ফেলি। এর গুরুত্ব দেওয়া তো দূরের কথা, এর আলোচনা অবাঞ্ছিত ও ঘৃণিত বলে মনে করি। পূর্বে ধর্মের মহামনীষীরা এ বিষয়ের ওপর কতটুকু জ্ঞান দান করেছেন তা আমার জানা নেই, তবে ইসলাম প্রবর্তক মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মদ (দঃ) আমাদের যে সব অমূল্য উপদেশ এর ওপর দিয়েছেন তার দু-চারটি আমরা উদ্ধৃত করে এর ওপর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করব। এর পূর্বে যৌন-মিলনের প্রয়োজন সম্বন্ধে বিভিন্ন যৌনবিজ্ঞানী যে সব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তার ওপর কিছুটা আলোকপাত করছি।

Dr. Hirsch তাঁর বিখ্যাত Sexual fear পুস্তকে লিখেছেন, "বীর্যপাত না করলে শরীরের কোন উপকারই হয় না বরং প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ডের পেশীগুলোর দুর্বলতা আসে এবং সেগুলো ক্রমশ বিকল হয়ে পড়ে।"

শুধু মানুষ কেন জীবজন্তুর বেলাতেও এটা সত্য। কর্নেল মরিস জনসন তাঁর 'Sex Life of Wild Animals' পুস্তকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন—"গরু, ঘোড়া, শূকর, কুকুর, ছাগল জাতির পুরুষগুলোকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এ সব পুরুষ পশুদের যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে যৌন-মিলনে রত হবার সুযোগ হতে বঞ্চিত করলে এরা স্বল্পায়ু ও ক্ষণজীবী হয়ে যায়। কিন্তু যে সব পশু যৌন-মিলনের সুযোগ পায়, তারা অপেক্ষাকৃত উন্নতদেহী ও দীর্ঘায়ু হয়। স্ত্রী পশুগুলো যৌবন সমাগমে যদি যৌন-মিলনের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয় তাহলে রোগাক্রান্ত হয়।"

যৌন-ক্ষুধা মানুষ ও জীবজন্তুর একই ধরনের। পাশ্চাত্য যৌনবিজ্ঞানীদের মতে, তাই মানুষ ও পশু এ বিষয়ে একই পর্যায়ের, একই শ্রেণীভুক্ত। এ জন্যই তারা পশুর মতো যেখানে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা তাকে নিয়েই সঙ্গমে লিপ্ত হয়। ভাই, বোন, মা, ছেলের মধ্যে সামাজিক বা ধর্মীয় কোন অনুশাসন মানতে তারা রাজি নয়। ইতর জন্তুর মতো সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে ইতর জন্তু হতে আমরা চাই না। আমরা চাই সভ্য মানুষ হিসাবে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সঙ্গম করতে ও সুখের দাম্পত্য জীবন গড়তে।

এবারে আসুন আমরা হজরতের মহাবাণী উদ্ধৃত করি ও যৌন মিলনের সুন্দর প্রক্রিয়া শিখে নিই।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, 'ইতর জন্তুর ন্যায় আপন স্ত্রীর ওপর উপগত হওয়া মানুষের উচিত নহে। বরং সঙ্গমের পূর্বে দূত প্রেরণ করা আবশ্যক।'

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ (দঃ), সহবাসে আবার দূত কেমন? তদুত্তরে হুজুর বললেন, চুম্বনই সেই দূত।"[১]

নারীদেহের ইন্দ্রিয়গুলো পুরুষের মতো সজাগ নয়। কোন্ নারীর কোন অঙ্গে যে যৌন-ক্ষুধা লুকিয়ে থাকে তা বলা কঠিন। কারো স্তনে, কারো ঠোঁটে, কারো পায়ের গোড়ালিতে, কারো বা ভগাঙ্কুরে, কারো বা কেশে ও চর্মে। এক কথায় বলতে হয়, এদের সারা দেহটাই যৌন-চুল্লী বা যৌন-জেনারেটর।

১। হাদিস, সংগৃহীত, কিমিয়ায়ে সা'আদত; ২য় খণ্ড, ইমাম গাজ্জালী, তর্জমা মওলানা নুরুর রহমান, এম. এম.।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নারীর মনের কথা ধরতে না পারলে, নারীর রহস্য না বুঝতে পারলে, নারীদেহের বৈচিত্র্যময় যৌন-জেনারেটরগুলোর সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে পুরুষকে অপমানিত, লজ্জিত, ঘৃণিত ও কলুর বলদের মতোই ঘানি টানতে হয়। এ জন্যই মহাজ্ঞানী রসুল (দঃ) পুরুষকে সচেতন করে দিয়েছেন ও জ্ঞান দান করেছেন। এ জ্ঞান পুরুষকে দিতে তিনি লজ্জিত হন নি। তিনি জানতেন, পুরুষের দুর্বলতা কোথায়। সবার মন জয় করেই তো তিনি জগৎগুরু। পুরুষের মনের কথা যদি না বুঝতেন আর নারীর মনের মাঝে ডুব না দিতেন তাহলে কিভাবে এ কথা বলেন ঃ

"তিনটি বিষয়ে পুরুষের দুর্বলতা প্রকাশ পায়—

(১) এমন একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল যে ব্যক্তি তাহাকে ভালবাসে কিন্তু তাহার নাম ঠিকানা স্মরণ নাই। (২) কোন একজন মুসলমান ভাইয়ের নিকট সম্মান লাভ করিয়া তাহা উপেক্ষা করিল। (৩) চুম্বন আলিঙ্গনাদির সাহায্যে স্ত্রীর কামভাব জাগ্রত করার পূর্বে সহবাস আরম্ভ করিয়া স্ত্রীর শুক্রপাত হওয়া পর্যন্ত নিজের শুক্র রোধ করিতে সক্ষম না হইলে, এমন অবস্থায় নিজের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখা হইল, স্ত্রীর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইল না।"[১]

সঙ্গমে লিপ্ত হবার পূর্বে হাসি, গল্প, আদর, সোহাগ, চুম্বন, আলিঙ্গন, দংশন, পীড়ন, আঘাত, অভিমান অনেক কিছুই প্রয়োজন। নারীর সুপ্ত কামভাব জাগ্রত করা অতি সহজ নয়। তাই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করার পর দৈহিক উৎপীড়নে নারীকে জাগাতে হয়। নইলে খোসার অভ্যন্তরে ঘুমন্ত ভ্রূণের মতোই নারীর কামভাব ঘুমিয়ে থাকে আর সময়মতো এর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সংসারে এক অনর্থ ঘটায়। এ জন্য পুরুষ জাতীয় সৃষ্টি মাত্রই নারীর হৃদয়ে সাড়া জাগাতে লীলাখেলা করে থাকে।

ময়ূর পেখম মেলে ময়ূরীকে ভোলায়, কবুতর বাকুম বাকুম করে কবুতরীর পেছনে পেছনে ঘোরে। মোরগ পাখা মেলে মুরগির গা ঘেঁসে ঘেঁসে তার স্ফূর্তি জাগায়, ঘোড়া চেঁহি চেঁহি করে ঘোড়ীর প্রাণে মিলনের বার্তা এনে দেয়। প্রতিটি পুরুষ জাতীয় প্রাণীই নারীর কাছে অভিনয় করে। কেউবা নাচে, কেউবা গানে, কেউবা উৎপীড়নে, কেউবা নীরবতায় নারীর প্রাণে সাড়া জাগায়। নাটকীয় এক পরিবেশ সৃষ্টি করে তার মন ভুলায় এবং সঙ্গমে আকৃষ্ট করে।

সঙ্গমের পূর্বে দূত প্রেরণের যে নির্দেশ যৌনবিজ্ঞানী হজরত (দঃ) দিয়েছেন তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আরও কিছু আলোচনা করা দরকার।

যৌন-চেতনা স্বভাবত স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রসমূহে প্রবলভাবে থাকে। এই কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে পরিচয় থাকলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যৌনবোধ জাগ্রত করা যায়। নারীদের কেন্দ্রসমূহ হচ্ছে—১) গাল, ২) ঠোঁট, ৩) ভগাঙ্কুর, ৪) স্তন ও এর বোটা, ৫) ভগদেশ, ৬) উরু, ৭) নিতম্ব, ৮) গুহ্যদ্বার ইত্যাদি।

উক্ত কেন্দ্রসমূহে ঘর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, সুড়সুড়ি দিলে স্নায়ুগুলোতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আর এ প্রতিক্রিয়ার ফলেই আসে অনাবিল আনন্দ ও যৌন-ক্রিয়ার লিপ্সা। দূত যেমন সংবাদ আদান-প্রদান করে এক সম্বন্ধ ঘটিয়ে দেয় তেমনি এ সব প্রতিক্রিয়াগুলো নারী

১। হাদিস, সংগৃহীত, কিমিয়ায়ে সা'আদত; ২য় খণ্ড, ইমাম গাজ্জালী, তর্জমা মওলানা নুরুর রহমান, এম. এম. (পৃষ্ঠা ৩৯—৪০)।

পুরুষের মাঝেও এক চরম আকর্ষণ ও যৌন-পুলক এনে দেয়। যৌন মিলনের পূর্বে এর প্রয়োজন যে কত অধিক তা জ্ঞানীগুণী নর-নারী মাত্রই জানে। হজরতের বাণী যে কত বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক বিজ্ঞানীরা তা যাচাই করে দেখুন। এ দূত প্রেরণের যে অসীম গুরুত্ব রয়েছে আল্লাহর বাণী থেকেও আমরা তা দেখতে পাই।

কোরআন বলছে—

'তোমাদের পত্নিগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। অতএব তোমরা, যখন ইচ্ছা স্বীয় ক্ষেত্রে গমন কর এবং স্বীয় জীবনের পূর্বে প্রেরণ কর।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২২৩)

দাম্পত্য জীবনের জন্য উপর্যুক্ত বাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; নারী জাতিকে ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ক্ষেত্রকে সুন্দর পন্থায় চাষ করে বীজ বপন করলে সে বীজ থেকে শস্যকণা উৎপাদিত হয়। চাষী যদি সময়মতো ক্ষেত্রে লাঙল না দেয়, এর উর্বরতা শক্তির জন্য সারের ব্যবহার না করে প্রয়োজনমতো যদি পানি সেচের ব্যবস্থা না করে তাহলে সে ক্ষেত্র হতে পুষ্ট ফুল ও শস্য পাবার আশা বৃথা। জমির ব্যবহার না করে যদি চাষী তা ফেলে রাখে তবে ভবিষ্যতের দুঃখ ও অভাব-অনটনের জন্য তাকেই দায়ী হতে হয়। কপালের দোষ দিয়ে বসে বসে কান্না করা মূর্খতাই প্রমাণ করে।

আপন স্ত্রী ঠিক ক্ষেত্রস্বরূপ। এ ক্ষেত্র থেকেই ভবিষ্যতের সম্বল জোটে, এ ক্ষেত্র রেখে যারা পালিয়ে যায়, বৈরাগ্য সাধনে মন দেয়, তারা কি করে সুসন্তানের মুখ দেখবে? ক্ষেত্রে বর্ষণ না করলে যেমন হা-ভাত হা-ভাত করতে হয় তেমনি স্ত্রীর সঙ্গে না মিশে, সময়মতো এর গর্ভে বীজ বপন না করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে সোনার ছেলে কোলে এসে পড়বে না। জমির উৎকর্ষতা যেমন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তেমনি নারীর উৎকর্ষতাও বিভিন্ন বিষয় ও সাবধানতার ওপরই নির্ভর করে। ফসল পুষ্ট হবার জন্য যেমন পানির প্রয়োজন, সারের প্রয়োজন, তেমনি নারীর পেটে বাচ্চা হলেও তার সেবা, যত্ন ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন।

নিজ স্ত্রীর নিকট আপন ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন সময়ে গমন করা যায়। এতে বাধা-নিষেধের কোন বালাই নেই বিশেষ কোন কারণ ছাড়া। কোন্ কোন্ সময় এবং কোন্ কোন্ দিনে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বাধা আছে এ নিয়ে পরে আলোচনা করব।

কোরআনের উপর্যুক্ত বাণী এ ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে, স্বামী-স্ত্রী আপন মনের খেয়াল-খুশিমতো যখন ইচ্ছা মিলতে পারে। এছাড়া এখানে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। খেতের ওপর চাষীর যেমন অধিকার, স্ত্রীর ওপরও স্বামীর তেমনি অধিকার রয়েছে। স্বামীর এ প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে স্ত্রৈণ হিসাবে যারা গড়ে নিতে চায় তারা আল্লাহরই বিরুদ্ধাচরণ করে।

"স্বীয় জীবনের জন্য পূর্বেই প্রেরণ কর"—কোরআনের এ তাৎপর্যপূর্ণ বাণীটি সবারই অনুধাবন করা উচিত। এ বিষয়ের ওপর বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন মত। কেউ বলেছেন, "স্ত্রী সঙ্গমের পূর্বে শুদ্ধচিত্তে সন্তান কামনা করা।" কেউবা বলেছেন, "স্ত্রীর সহিত আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর আরাধনা করিয়া ইহ-পারলৌকিক জীবনের কল্যাণের জন্য তার প্রসন্নতা সম্পাদন করা।" (তফসীরে হক্কানী)

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, সঙ্গমের পূর্বে দূত প্রেরণের যে নির্দেশ হজরত দিয়েছেন সেটাই এখানে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সঙ্গমের উদ্দেশ্য সন্তান-সন্ততি হলেও প্রধান চিন্তাধারা যা মন মগজে স্থান পায় তা হলো আনন্দ উপভোগ। দূত প্রেরণ—আনন্দের বার্তাই

pdf By Syed Mostafa Sakib

বয়ে আনে। আর এ আনন্দই সংসারকে করে মধুময়, জীবনকে করে পূর্ণ, সৃষ্টিকে করে সার্থক।

যৌন কেন্দ্রসমূহের পরিচয় কিছুটা দিয়েছি। এসব কেন্দ্র ছাড়াও নর-নারীর দেহে প্রচুর যৌনকেন্দ্র আছে। বলতে হয় নর-নারীর সর্বাঙ্গই যৌনকেন্দ্র। যে সব কেন্দ্র চোখে দেখা যায় না, সেগুলোর গুরুত্বও অপরিসীম। এদের মধ্যে চোখ কান, গলার স্বর, নাসিকা ও ত্বক অন্যতম।

চোখ ঃ মানুষের সাধারণত তিনটি চোখ থাকে। বাহ্যত দুটি—যা দৃষ্টিগোচর হয়। আর একটি চোখ থাকে লুক্কায়িত। একে বলা হয় অন্তর চোখ।

নারী-পুরুষ বাহ্য চোখের দৃষ্টিতে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পুরুষের চোখ হতে জ্যোতি বের হয় তা নারীর চোখেতে পড়া মাত্রই তার স্নায়ুমণ্ডলীতে এক আঘাত হানে। এ আঘাত মগজে ধাক্কা দেওয়া মাত্রই তার মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ আলোড়নই যৌন প্রদেশসমূহে এক অপূর্ব চেতনা নিয়ে আসে। ঠিক অনুরূপ ক্রিয়াই সাধিত হয় পুরুষের চোখে, মনে ও মগজে। একবার পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে এ জ্যোতির ক্রিয়া চলতে থাকে দিনের পর দিন।

অন্তরচোখ তার আপন দৃষ্টির সম্মুখে খুঁজে পায় তার মানসপ্রিয়া বা প্রিয়কে। তাই ঘুমেও সেই ছবি দেখে, রাস্তায় হাটতেও সেই ছবি দেখে হাসে ও কাঁদে। বাহ্যচোখ যে জ্যোতি absorb করে অন্তরচোখ সেই জ্যোতিকেই সময়মতো বিকিরণ করে। এ জন্যই একবার মাত্র দেখা হলেও দিনে হাজার বার এ ছবি ভেসে ওঠে। আর দূরে থেকেও নারী-পুরুষ প্রেমে পড়ে। কি অদ্ভুত আল্লাহর এ সৃষ্টিলীলা! কি অদ্ভুত এ যৌনকেন্দ্র!

অনেক স্বামী-স্ত্রী কর্তব্যের খাতিরে অথবা বাধ্য হয়ে দূরে থাকে। যৌন-মিলনের কোন সুযোগ হয় না। জেলের অভ্যন্তরে যারা বাস করে তারা আপন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমের সুযোগ পায় না। অন্তর ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এ সময় স্ত্রীকে শুধু দেখতে পেলে শান্ত হয়, যৌন-তৃষ্ণা মিটে যায়। চোখের মাঝেই যৌন-ক্রিয়া সাধিত হয়। তাই শান্তিতে আরও কয়েকটি দিন কাটাতে পারে।

সঙ্গমে যে তৃপ্তি না আনে দর্শনে তার চেয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি আনে। আকাঙ্খিত প্রেমিকার দর্শনে প্রেমিক যেমন আনন্দ পায় প্রেমিকাও তেমনি প্রেমিককে দেখে আনন্দ পায়। এ জন্যই স্বামী স্ত্রীকে দেখবার ও স্ত্রী স্বামীকে দেখবার জন্যই পাগল হয়ে ওঠে। এক ঘণ্টার দেখা সাতদিনের যৌন-ক্ষুধা মিটিয়ে দেয়।

চোখকে যৌন-জেনারেটর বলা যায়। নারীর পুরুষের দর্শনমাত্রই শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। এ বিদ্যুতের সৃষ্টি চোখের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। দৃষ্টিতে যত শীঘ্র মন তোলপাড় করে ওঠে, শরীরে শিহরণ জাগায়, কামভাবে যৌনাঙ্গ নাড়া দিয়ে ওঠে, অন্য কোন প্রকার অঙ্গের মাধ্যমে তা হয় না। যার চোখ নেই সে যত শীঘ্র প্রেমে না পড়বে যার চোখ আছে সে তার চাইতে অনেক বেশি আগে পড়বে। এজন্যই নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত বৈধ নহে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন—

"তোমাদের পক্ষে প্রথম দৃষ্টি বৈধ কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি অবৈধ।"[১]

১। সৌভাগ্যের পরশমণি—আবদুল খালেক। বিনাশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬।

পথে-ঘাটে, মাঠে, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, সিনেমা, থিয়েটার বায়োস্কোপ, আত্মীয়, অনাত্মীয়ের বাড়িতে, নিমন্ত্রণে অথবা আমন্ত্রণে নারীদের সঙ্গে পুরুষের দেখা হবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। দৃষ্টি ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়বেই। তবে দৃষ্টিকে সংযত করতে না পারলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। প্রথম দৃষ্টি অশুভ নয় কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি অশুভ। কেননা যে সৎব্যক্তি সে প্রথম দৃষ্টির পর আর দ্বিতীয় দৃষ্টি দেবে না। কিন্তু অসৎ ব্যক্তি মাত্রই সে প্রথম দৃষ্টিতে ভাল লাগলে বার বার দৃষ্টিপাত করবে। ফলে যৌনকেন্দ্র চোখ হতে কামভাব সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে। এতে ভুলের কোন অবকাশ নেই। নবী পয়গম্বরগণ পর্যন্ত এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন। হজরত ইয়াহ-ইয়া (আঃ)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যভিচার কোথা হতে জন্মে? তিনি উত্তর দিলেন—চোখ হতে।"[১]

নবী (দঃ) বলেছেন—"গুপ্তাঙ্গের মতো চোখও জেনা করে।"[২]

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম একদা পথ চলার সময় হঠাৎ এক সুন্দরী রমণীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। তিনি পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরলেন এবং স্ত্রী সঙ্গম করলেন। তৎপর অনিতিবিলম্বে গোসল করে ঘরের বাইরে এসে উপস্থিত লোকদের বললেন, "যাহার সামনে পরপত্নী আসিয়া পড়ে এবং শয়তান তাহাকে যদি কামভাবে উত্তেজিত করে তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাহার স্ত্রীর সম্ভোগ করা উচিত। তোমার নিজ স্ত্রীর নিকট যাহা আছে পর স্ত্রীর নিকটও তাহাই আছে।"[৩]

যৌনবিজ্ঞানের এমন সুন্দর উপদেশ, এমন জ্বলন্ত উদাহরণের মাধ্যমে আমরা পাব আমাদের নবীর জীবন থেকে তা ভাবতে পারি নি। কি তিনি দিয়ে যান নি? কি তিনি আমাদের শেখান নি? কোন্ সময় কোন্ নারী-পুরুষের মনে কোন্ ভাবের উদয় হবে এবং সেই মুহূর্তে কি তার করণীয় হবে সেটাও তিনি বলে গেছেন। বাস্তব জীবনের জন্য এমন নবী বা পয়গম্বরকে ইতিপূর্বে আমরা কখনও দেখি নি।

নারী একান্ত বাধ্য হয়ে যখন ঘরের বাহিরে আসে তখন তাদের উচিত অনাড়ম্বর বেশভূষায় অতি সহজ পন্থায় কার্য সিদ্ধি করা। চকচকে শাড়ি, আকর্ষণীয় চাদর অথবা কারুকার্য খচিত বোরখা পরা উচিত নয়, কেননা এগুলো চোখকে ভীষণভাবে প্রলুব্ধ করে। আজকাল মাত্রা ছাড়িয়ে ব্যভিচার চলছে। এর কারণ নারীকে উলঙ্গভাবে সর্বত্র দৃষ্টিপথে পাওয়া যায়। নারীকে আড়ালে না রাখলে এবং তার দৃষ্টি সংযত করতে না পারলে এ ব্যভিচার চলবেই। রসুলের বাণী থেকেও আমরা তা দেখতে পাই। তিনি বলেছেন—

"শয়তানের বিষাক্ত তীর সমূহের (অসংযত) দৃষ্টি একটি বিস্ময়কর তীর।"[১]

চোখ যৌনকেন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। চোখ প্রেমের নায়ক, চোখ আবেগ অনুভূতি সৃষ্টিকারী এক মহামূল্যবান বস্তু। চোখের জ্যোতি যে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল তার প্রমাণ মেলে ম্যাজিসিয়ানদের ও সাধক-পুরুষদের কার্যপদ্ধতির মাঝে। তারা একজনের চোখের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞান করে ফেলতে পারে, মনকে পরিবর্তিত করতে পারে, চিন্তাধারায় বিবর্তন এনে দিতে পারে। এ চোখ সত্যি এক অদ্ভুত সৃষ্টি। আল্লাহর অফুরন্ত এ এক আশ্চর্য নিদর্শন।

১-৩। সৌভাগ্যের পরশমণি—আবদুল খালেক। পৃষ্ঠা ১৩৬। বিনাশ খণ্ড।

১। সৌভাগ্যের পরশমণি। বিনাশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কান ঃ চোখের মতো শক্তিশালী না হলেও কানের দান প্রেমের ক্ষেত্রে কম নয়। মিষ্টি কথা, গানের ও বাঁশীর সুর, মধুর আওয়াজ নারী-পুরুষের যৌন কেন্দ্রগুলোকে সজাগ করে দেয়। নারীর শ্রবণ ইন্দ্রিয় পুরুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের চেয়ে অনেক বেশি ক্রিয়াশীল—এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তাই নারী পুরুষ অপেক্ষা গান, বাজনা, যৌন-বোধের আলাপ, প্রেমিকের কণ্ঠস্বর, প্রিয়জনের উচ্ছ্বসিত হাসি, অশ্লীল কথা শুনলে আনন্দ পায়। মধুর সুর হিংস্র প্রাণী সাপকে যেখানে মুগ্ধ করে সেখানে নারী-পুরুষকে মুগ্ধ করবে না এটা বলাই যেন মূর্খতা। প্রাণের আবেদন, প্রেমিক-প্রেমিকার নিবেদন কানের দ্বারাই সাধিত হয়। আর এ আবেদন ও নিবেদনের মাঝেই জাগ্রত হয় যৌন-বোধ। যৌবনে নারীর কণ্ঠস্বরে বিশেষ কোন পরিবর্তন আসে না, কিন্তু পুরুষের কণ্ঠস্বরে আসে এক অপূর্ব সুর যা নারীর কানে ঢেলে দেয় এক অপূর্ব সুধা। পুরুষ কণ্ঠে যে মোহিনীশক্তি বিদ্যমান নারীর কণ্ঠে তা নেই। নারী মার খেতে রাজি কিন্তু পুরুষের কথা না শুনতে রাজি নয়।

পুরুষের গান, পুরুষের বক্তৃতা যতটুকু আকর্ষণীয় হয়, নারীর বক্তৃতা ও গান ততটুকু আকর্ষণীয় হয় না। পুরুষের গান ও বক্তৃতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনলেও বিরক্তি আসে না; কিন্তু নারীর গান ও বক্তৃতা এক ঘণ্টা শুনবার ধৈর্যও কারো থাকে না। হ্যাভলক সত্যি বলেছেন—"পুরুষের কণ্ঠে যতটা পৌরুষ আছে নারীর কণ্ঠে ততটা নারীত্ব নেই।"

পুরুষ তার এ ক্ষমতাবলে নারীকে বশ করতে পারে আর নারী তার শক্তিশালী শ্রবণ ইন্দ্রিয় দিয়ে তা গ্রহণ করে পুরুষকে প্রাণের সাথে ভালবাসতে পারে।

হজরতের দূত প্রেরণের কথাটি এ জন্যই আমার বার বার মনে পড়ে। কথাশক্তিই দূতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। কথাই দুনিয়াকে নিকটে আনে, হিংস্র জন্তুকে পোষ মানায়, নারী জাতিকে প্রেমের পরশে টেনে আনে। শ্রবণ ইন্দ্রিয় যার ভোঁতা, কান যার বধির, প্রেমের লীলা সে কি বোঝে? রাধা কৃষ্ণের রূপে ভোলে নি—ভুলেছিল তাঁর বাঁশীর সুরে। শ্রবণ ইন্দ্রিয় যদি তার সক্রিয় না হতো তাহলে প্রেমের লীলায় হাবুডুবু খেত না। কৃষ্ণ ভাগ্নে হয়েই চিরদিন তার হৃদয়ে থাকত, প্রেমের অবতার হয়ে মানসচক্ষে ধরা দিত না।

কোকিলের কুহুতান, বৃষ্টির শব্দ, মেঘের গর্জন, নূপুরের ধ্বনি, হারমোনিয়ামের সুর নারীকে মুগ্ধ করে। এ সব ধ্বনি তার কানে পড়লে স্বামীকে মনে পড়ে, না দেখেও প্রিয়জনের গলে মালা পরায়, সঙ্গমের লিপ্সায় আত্মভোলা হয়ে যায়।

পুরুষ যে নারীর কণ্ঠস্বরে ভোলে না তা নয়। তবে নারীর মতো মন হারিয়ে পাগল হয়ে ওঠে না। চুড়ির ঝুনঝুনি শব্দ, পায়ের ধ্বনি, গান, প্রেমাবেগ ও টিপ্পনীমূলক রসের কথা পুরুষকে ভুলিয়ে ফেলে ও নারীর দিকে আকর্ষণ জন্মায়। এ আকর্ষণই নিয়ে আসে যৌন-চেতনা।

ত্বক ঃ জীবজন্তুর সর্বাঙ্গ জুড়ে যে ইন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠিত তাকেই বলা হয় ত্বক বা চামড়া। এমন কোন ইন্দ্রিয় নেই যা ত্বক ছাড়া তৈরি। ত্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের জননী। শিরা-উপশিরা এ ত্বকের মধ্য দিয়ে জালের মতো সমস্ত শরীরে বিস্তৃতিলাভ করেছে। তাই যে কোন অঙ্গের যে কোন স্থানে স্পর্শ করলে বা মৃদু আঘাত দিলে অন্য অঙ্গে সাথে সাথে তা ছড়িয়ে পড়ে। ত্বকের চেয়ে শক্তিশালী বাহন অন্য কোন পদার্থের নেই। স্পর্শকাতরতা, অনুভূতি, বাহক, ধারক ও প্রেরকযন্ত্র হিসাবে এ ত্বক কাজ করে।

It works as sensitive carrier, receiver and transmitter. তাই ত্বক প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত। কোমল ত্বক দ্বারা যৌন প্রদেশসমূহ

গঠিত। এদের Sensitiveness বা স্পর্শকাতরতা খুব বেশি। নারীর যৌন প্রদেশসমূহ বিশেষ করে যোনী, ভগাঙ্কুর, স্তন, ঠোঁট, গাল ইত্যাদিতে এত বেশি অনুভূতি থাকে যে, সহজেই কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না। এ স্পর্শকাতরতাই নারীর সতীত্বের কারণ। স্বামী ছাড়া অন্য কেউ যদি নারীর এ সতীত্বকে একবার হরণ করতে পারে তাহলে নারীর জীবনে সর্বনাশ ঘটে। কেননা স্পর্শসুখ এতই আনন্দদায়ক যে তা ব্যক্ত করার যেমন কোন ভাষা নেই, ভুলে যাবারও তেমনি কোন পন্থা নেই।

একবার এ সুখ পেলে নারী দুনিয়াকে ভুলে যায়। ধর্ম, কর্ম স্বপ্নের মতো বিলীন নয়।

শৈশবকাল থেকেই নারী পুরুষ স্পর্শসুখ অনুভব করে। ছোট বাচ্চা ছেলেদের লিঙ্গে হাত দিলে নিমিষেই দাঁড়িয়ে যায়। সে তখন চায় বার বার তার লিঙ্গ ধরে ঝাঁকুনি দেওয়া হোক। সে জানে না, বোঝে না, অথচ চায় স্পর্শসুখ পেতে। কিশোরী মেয়েদের যখন যৌন-চেতনা অনুভূত হয় তখন তারা চায় স্পর্শসুখ। সঙ্গমের কথা শুনলে ভয় পায় অথচ চুম্বন, আলিঙ্গন ও স্পর্শে সুখ অনুভব করে। যখন বয়স বৃদ্ধি হয়, যৌনাঙ্গসমূহ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তখন স্পর্শন, মর্দন ও চুম্বনই হয় নারীর কাম্য। পুরুষ যদি নারীর এ সুপ্ত কামনাকে বুঝতে না পারে তাহলে নারীর প্রাণে সে স্থান পেতে পারে না। এ জন্য হাবা গোবেচারী, মূর্খ ও লাজুক ছেলেরা তার স্ত্রীর কাছে প্রিয় হয় না। সঙ্গমে যদি স্ত্রী অতৃপ্ত থেকে যায়, তার বীর্যপাতের পূর্বেই পুরুষ শক্তিহীন হয়ে পড়ে তবে স্ত্রীর কাছে তাকে বড় লজ্জিত ও বোকা হতে হয়। লেখাপড়ায় সেরা ডিগ্রিধারী, পি-এইচ. ডি., এফ. আর. সি. এস., আই. স্পেশালিস্ট তখন কৃষক, মজুর ও দীন-স্পেশালিস্ট একটা সাধারণ লোকের চেয়েও ঘৃণ্য ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে তার অতৃপ্ত স্ত্রীর কাছে। তাই সাবধান পুরুষ জাতি, যৌনবিদ্যার স্পেশালিস্ট হোন। রসুলের নির্দেশ পালন করুন, সঙ্গমের পূর্বে দূত প্রেরণ করে নারীর প্রাণে জোয়ার আনুন। সঙ্গম সুখের হবে, জীবন আনন্দময় হবে, সংসার মধুময় হবে, ধর্ম পূর্ণ হবে। স্ত্রীর কাছে আদর পাবেন, প্রেম পাবেন, ভালবাসা পাবেন এবং সর্বশেষে তার মনও পাবেন।

নাসিকা ঃ নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলা হয়। এই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই মস্তিষ্ক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ অতি অল্প সময়েই মন ও দেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সুগন্ধ মস্তিষ্ককে সুস্থ, সবল ও সতেজ করে কিন্তু দুর্গন্ধ ঠিক এর বিপরীত ক্রিয়া করে। দুর্গন্ধ মুহূর্ত মধ্যে সব আনন্দ ও উত্তেজনা নিঃশেষ করে মানসিক অশান্তি আনতে সক্ষম। এজন্য গন্ধের ওপর যৌনবোধ অনেকটা নির্ভরশীল।

অনেক প্রাণী আছে যাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় এত শক্তিশালী যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ওপর তা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। কুকুর এর নিদর্শন। প্রাণীদের মতো যদিও নর-নারী ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ততটুকু প্রভাবান্বিত নয়, তবুও যৌন-চেতনায় এর দান স্বল্প নয়। আমাদের রসুল (দঃ) সুগন্ধিযুক্ত আতর ব্যবহার করতেন। ফুলকে ভালবাসতেন। তাঁর শরীর হতে যে ঘর্ম নির্গত হতো তা যে কোন সুগন্ধিকেই হার মানাত। সুগন্ধি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যেমন পুষ্ট করে, রোগজীবাণু ধ্বংস করে, তেমনি যৌন কেন্দ্রগুলোকেও এক চেতনা শক্তি দিয়ে উত্তেজিত করে। নারী-পুরুষ উভয়েই সুগন্ধি ব্যবহার করলে প্রকৃতিগত ভাবেই এক আকর্ষণ জন্মে। মনে ও দেহে আনন্দের লহরী ছোটে। উভয়ে উভয়কে পেতে উন্মুখীব হয়ে ওঠে। ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়-চোপড় বা দেহ নিয়ে সঙ্গমে যে আনন্দ পাওয়া যায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধির মাঝে তার চেয়ে শতগুণ বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। যেহেতু সুগন্ধি পুরুষকে আকৃষ্ট

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে, মুহূর্তেই তার যৌন-চেতনা এনে দেয়, প্রেম-ভালবাসার উদ্রেক করে, তাই সুগন্ধি ব্যবহারের প্রতি একটু সতর্কতার বিধানও রয়েছে। এ বিধান দিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহেস ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেছেন—"নারী যদি স্বামী ব্যতিরেকে পর পুরুষের জন্য সুগন্ধি মাখে তবে সে দোজখে প্রবেশ করে ও ঘৃণিত হয়।"[১]

এ হাদিসটির বিষয়ে বিবাহিতা স্ত্রীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ও তা মেনে চলা উচিত। নিজেদের সতীত্ব রক্ষা, পর পুরুষের লোলুপ লালসার দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে চলাই এ বাণীর উদ্দেশ্য।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন—"তোমাদের কেহ যেন নিজের স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর ন্যায় প্রহার না করে, তারপর দিবসের শেষভাগে (অর্থাৎ কোন্ সময়) তাহার সহিত সঙ্গম করিবে।"[২]

স্বামী-স্ত্রী একত্রে বাস করলে কোন না কোন সময় তাদের মধ্যে মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদ হবার সম্ভাবনা থাকে। একভাবেই যে দিন যাবে এমন কথা নয়। স্ত্রীর অবৈধ আচরণ স্বামীর পক্ষে অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে প্রহার করার নিয়ম হজরত দিয়েছেন। তবে মুখর ওপর নয় অথবা ক্রীতদাসীর মতো নির্মমভাবেও নয়। প্রয়োজনবোধে অর্থাৎ মান-সম্মান রক্ষার্থে প্রহার করলেও তাকে আবার ভালবাসতে হবে, প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট করতে হবে। নারীর প্রাণ বড় কোমল। একটু প্রেমের ছোঁয়া পেলে প্রহারের কঠোরতা ভুলে যায়। প্রখর রৌদ্রের পর বাদলের ধারা যেমন ধরাকে সুশীতল করে আনন্দের হিল্লোল নিয়ে আসে, ঝালের পর মিষ্টি যেমন ঝালের অসহ্য জ্বালা দূর করে তৃপ্তিদান করে, তেমনি ঝগড়া-বিবাদের পর সঙ্গম দুজনের প্রাণেই নতুন জীবন বয়ে আনে। সঙ্গম আবেগ উচ্ছ্বাস ও জ্বালা দূর করার একমাত্র ওষুধ। শান্তি আনয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। দাম্পত্য জীবনের এক পরম সুখকর ব্যবস্থা। হজরতের এ নির্দেশ পুরুষ ছেলেরা পালন করলে নারীকে বশে এনে সুখকর সংসার গড়ে নিতে পারে। সঙ্গম দেহের খোরাক, আত্মার খোরাক ও মনের খোরাক।

স্ত্রীকে প্রহারের পর সঙ্গম কেন প্রয়োজন এর আরও একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে।

নারীর স্বভাব ও চরিত্র পুরুষের স্বভাব ও চরিত্র হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নারী ধর্ষিত হতে যে আনন্দ পায়, অত্যাচারের মাঝেও যে সুখ পায়, গালি ও মারপিটেও যে তৃপ্তি পায় এ কথা চিন্তা করলে হাসি পায়। বিশ্বাস করতেও মন চায় না। তবু একথা সত্য যে সব নারীর ক্ষেত্রে না হলেও অনেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যৌনবিজ্ঞান আলোচনা করলে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক মেলে। ডাক্তার জ্যানেট একদা তাঁর এক রোগিনীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনি আপনার স্বামীকে পছন্দ করেন না কেন?' স্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন—'পছন্দ করব কি, তিনি বিন্দুমাত্র বলপ্রয়োগ জানেন না।'

প্রহার বা মৃদু আঘাত নারীকে দিলে সুপ্ত কাম-ইচ্ছা প্রবল হয়ে ধরা দেয়। কাম-ইচ্ছা জাগ্রত হলে স্বভাবতই মন চায় দৈহিক মিলন। তাই নারীর অপরাধে অথবা নিরপরাধে প্রহার, মৃদু দংশন, ধর্ষণ ইত্যাদিতে নারী যতটুকু ব্যথা না পায় তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পায় যৌন-মিলনে। আর এ মিলন না ঘটলে ফল দাঁড়ায় বিষময়। এ জন্যই দেখা যায় শত অত্যাচার, উৎপীড়ন করেও নারীকে বশ করা যায় যদি পুরুষ সুচতুর হয় এবং যৌন-ক্রিয়ায় কার্যক্ষম হয়। দুই পুরুষে অথবা দুই মেয়েতে ঝগড়া-বিবাদ বা মারামারি করে শত্রুতার সৃষ্টি হয়, বিচ্ছেদ ঘটে কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সারাদিন ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি করেও ভালবাসা নষ্ট হয়

১ ও ২। বুখারী ও মুসলিম।

না। যৌনবিজ্ঞানীরা এর যথেষ্ট প্রমাণও সংগ্রহ করেছেন। একটি ছোট ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি।

রাশিয়াতে একটি মেয়ে তার স্বামীর নিকট হতে তালাক নেবার জন্য আদালতে এক মামলা দায়ে করে। জজ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার স্বামী এমন স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ অথচ তার নিকট হতে তালাক নিতে চাচ্ছ কেন?" মেয়েটি উত্তর দিল—আমার স্বামী এখন আর আমাকে আগের মতো ভালবাসেন না। জজ জিজ্ঞাসা করলেন—তা তুমি কি করে বুঝতে পারলে? সে উত্তর দিল—তিনি আমাকে কয়েক মাস ধরে আর মারধর করেন না।"[১]

নারী চরিত্র বড় রহস্যময়। পুরুষের শূল নারীর কাছে যে ফুল হয়ে দাঁড়ায় একথা পুরুষ জানে না। তাই নারীর কাছে তারা বোকা, চিরদিনের মূর্খ।

হজরত বলেছেন—"কুমারী বিবাহ করিলে তাহার সেখানে থাকিবে সাতদিন আর বিধবা বিবাহ করিলে তাহার সেখানে থাকিবে তিনদিন।"[২] [আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত]

কুমারী ও বিধবা নারীর সন্তুষ্টি বিধানে স্বামীর প্রতি যে উপদেশ তিনি দিয়েছেন তা যে সত্যই প্রয়োজন এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কুমারী নারীর আকর্ষণ ও কামস্পৃহা বিধবা নারীর অনুপাতে ৭ ঃ ৩। অর্থাৎ কুমারী নারীর ৭ ভাগ আর বিধবা নারীর ৩ ভাগ।

যুবতী নারীর কামস্পৃহা মেটাতে হলে যুবকেরই প্রয়োজন—বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় নয়। কোন যুবতীকে যদি কোন বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় তাহলে সে যুবতীর জীবনে সর্বনাশ ঘটে। অনেক বাবা-মা টাকা পয়সা বা ধন-দৌলতের লোভে এমন অসম্ভব বিবাহ সংঘটন করেন যার ফল হয় বিষময়। এ ধরনের বিবাহ হজরত পছন্দ করেন নি। তিনি যুবক ছেলেদের কুমারী নারীকে বিবাহ করতে বলেছেন, বিধবাকে নয়। এক্ষেত্রেও অনুরূপ দাম্পত্য জীবনই হয়। কেননা বৃদ্ধ পুরুষ যেমন যুবতী নারীর মন যোগাতে পারে না, তেমনি বিধবা নারীও যুবক পুরুষের খোরাক দিতে পারে না। এ বিষয়ে হজরতের দুটি বাণী নিম্নরূপ ঃ—"খন্‌সা বিন্‌তে খিজাম আনসারিয়া হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বিধবা এবং ঐ বিবাহ পছন্দ করিলেন না। তিনি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট বলিলেন এবং তিনি এ বিবাহ বাতিল করিয়া দিলেন।"[১]

"তোমরা কুমারী রমণীকে গ্রহণ করিবে, কারণ তাহাদের মুখ মধুর, উদর সন্তানধারী এবং তারা অল্পেই তুষ্ট।"[২]

সঙ্গমের গুরুত্ব

সুখ দেখা যায় না, সুখ দাড়ি পাল্লাতেও মাপা যায় না, অথচ এ সুখের জন্যই মানুষ লালায়িত। মানুষ সুখ ভোগ করে, অনুভব করে অথচ এ সুখ সৃষ্টিকারী কে তার সন্ধান নেয় না। তার কাছে শুকুর আদায় করে মাথা নত করে না। সঙ্গম-সুখ দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। খাওয়া, পরা, আমোদ, আহ্লাদ, গান-বাজনা, গাড়ি, বাড়ি নিয়ে মানুষ যে সুখ না পায়, সিন্দুকে

১। যৌনবিজ্ঞান—আবুল হাসানাত, পৃষ্ঠা ১২৭।
২। যৌনবিজ্ঞান—আবুল হাসানাত, পৃষ্ঠা ১২৭।
১। সহিহ বুখারী (তজরীদুল)। তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ। হাঃ নং ৩৫, পৃষ্ঠা ৩০৮।
২। সগির। সংগৃহীত হাদিসের আলো, কৃত পূর্বে বর্ণিত। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

টাকা রেখে, গয়নায় শরীর ঢেকে যতটুকু আনন্দ উপভোগ না করে মাত্র দশ-পনেরো মিনিটের সঙ্গম-সুখ তাকে তার চাইতে অনেক গুণ বেশি সুখী করে। এ সুখের জন্য প্রতিটি জীবই লালায়িত। বাবুই পাখি, চড়ুই পাখি, মিনিটে মিনিটে—কুকুর, অশ্ব ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ সুখে কাটায়। খাওয়া-দাওয়া সব ভুলে শুধু এ সুখই অনুভব করতে চায়। বিজ্ঞানের চরম সার্থকতা ও পরম সফলতার যুগেও কোন বৈজ্ঞানিক এ সুখ সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ সৃষ্টি করে তার দেহে এ আনন্দের উৎস তুলে দিতে পারে না। যে পারে সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের এ আনন্দ দেখে নিজেও খুশি হন এবং সৃষ্ট জীবকেও খুশি করেন।

আল্লাহর এ অপরিসীম নিয়ামত, বেহেশ্‌তের এ সুখ ধরায় ভোগ করে যারা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারাই পুণ্যবান, তারাই শ্রেষ্ঠ এবাদতকারী। সঙ্গম পাপ মোচন করে, সঙ্গম সম্মান বৃদ্ধি করে, সঙ্গম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার বীজ বপন করে ও পূণ্যের পাহাড় গড়ে তোলে। এ সঙ্গম ঘৃণ্য নয়, অনাদরণীয় নয়, অবহেলিত নয়। আল্লাহকে জানা, চেনা ও স্মরণ করার জন্য এ এক শ্রেষ্ঠ এবাদত। হজরতের বাণী এ কথার প্রমাণ দেয়। তিনি বলেছেন, "স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হলে বিশ্ব ও বিশ্বের যাবতীয় বস্তু হইতে স্বামীর মর্যাদা বেশি হইয়া থাকে। অতঃপর গোসল করার সময়ে শরীরে যত লোম পানিতে ভিজে প্রত্যেকটির প্রতিদানে একটি করিয়া নেকী তাহার আমলনামায় লেখা হইয়া থাকে এবং একটি করিয়া পাপ ক্ষমা হয়। তাহা ছাড়া সম্মানও বৃদ্ধি পায়। বস্তুত গোসলের প্রতিদানে বিশ্ব ও বিশ্বের যাবতীয় বস্তু হইতে অধিক গুরুত্ব সে লাভ করে।"

আল্লাহতায়ালা আনন্দ অনুভব করেন এবং ফেরেশ্‌তাদের বলেন, "লক্ষ্য কর আমার বান্দার প্রতি। এই শীতের রাতে নাপাকী হইতে পাক হওয়ার বাসনায় আমার বান্দা গোসলের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আমাকে প্রতিপালক পরওয়ারদিগার হিসাবে সে বিশ্বাস করে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাহার গুণাহ্ মাফ করিয়া দিলাম।"[১]

আনন্দের মাঝে পুণ্য, ভোগের মাঝে এবাদত, সুখের মাঝে বেহেশ্‌ত। কি অপূর্ব! এমন কথা তো কোনদিন শুনি নি। কেউ তো এবাদতের এমন ধারা শেখায় নি। কে তুমি মহান বৈজ্ঞানিক? কে তুমি নর-নারীর শিক্ষাগুরু—পুণ্যময় প্রদর্শক? তোমাকে জানাই হাজার সালাম।

যে সঙ্গমে এত পুণ্য, যার গুরুত্ব এত অধিক তার মর্যাদা রক্ষা করা ও এর ওপর মনীষীদের বিধি-নিষেধ মেনে চলা একান্তই প্রয়োজন। একই স্বামী-স্ত্রীর সহবাসে একজন হয় বোবা, একজন হয় তর্কবাগিশ। কোন ছেলে হয় টেরা চোখওয়ালা, কেউবা অন্ধ। একই উদর হতে সুন্দর আকৃতির মানুষ জন্মে—সেই উদর হতেই আবার কচ্ছপ, সাপ ও বিকলাঙ্গ জন্মে থাকে। এ রহস্যের মূলে কি, কোন্ সহবাসে ধনাঢ্য, বিদ্বান, সৎ ও পণ্ডিত ব্যক্তির জন্ম হয়, কোন্ ধরনের সহবাসের ফলেই আবার দরিদ্র, মূর্খ, কালো, অসৎ এ বদমেজাজি হয় তা আমাদের জানা একান্তই প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে রোধ করা যায় না সত্য কথা, তবুও সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্য যে পরামর্শ তাঁর নবী-পয়গম্বর ও বৈজ্ঞানিকদের মাধ্যমে দিচ্ছেন তা কি পালন করা কর্তব্য নয়? এ সব নির্ধারিত নিয়মগুলো মেনে চললে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। চলুন আমরা দেখি সে নিষিদ্ধ সময় ও দিনগুলো কি ?

১। গুনিয়াতুত-তালেবীন—বড় পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী। বঙ্গানুবাদ নূরুল আলম বাহ্‌সী। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৩।

সঙ্গমের নিয়ম ও নিষিদ্ধ সময়

স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছামতো যখন ইচ্ছা সঙ্গম করতে পারে। এতে রাত, দিন বা সময়ের কোন বাধাধরা নিয়ম নেই। তবু উপকার বা অপকারের দিকে দৃষ্টি রেখে হাদিস ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সঙ্গম করাই শ্রেয়। একই সঙ্গমে একই যৌন-ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার আকৃতি ও প্রকৃতিগত সন্তান জন্মগ্রহণ করে থাকে। এখান থেকে তাহলে নিশ্চয় চিন্তা করবার বিষয় রয়েছে যে সঙ্গমের পরিবেশ ও তারতম্যের ওপর এর ফলাফল নির্ভর করে। একই মায়ের গর্ভ হতে একজন হয় ধার্মিক আর একজন হয় অত্যাচারী। একজন জ্ঞানী, একজন মূর্খ। একজন সুন্দর, একজন অসুন্দর। একজনের পটলচেরা সুন্দর চোখ আর একজন কানা। এর কি কারণ নেই? যৌনবিজ্ঞানীরা এখন এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন আর পূর্ব যুগের মহামনীষীদের বাক্যকেই সম্বল করে ভক্তিভরে আজ তা গ্রহণ করেছেন এবং এর বিশ্লেষণ দিয়ে তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। এটা সত্যি আনন্দ ও সুখের বিষয়।

সঙ্গমে আমরা যে শুধু অফুরন্ত আনন্দ পাই তা নয়। এতেই প্রেম ও ভালবাসার বীজ বপন হয়। দূর নিকটে আসে, হৃদয় প্রশস্ত হয়। জীবন আনন্দমুখর হয়। ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। আর সৃষ্টিকর্তা খুশি হয়ে আমাদের নেকীর পাল্লা ভারি করে দেন। এর প্রমাণ মেলে আমার রসুল (দঃ)-এর বাণীতে।

তিনি বলেছেন, "যারা হাসি-খুশি ও আনন্দ-রহস্যের মাঝে আপন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করে, আল্লাহ্ তাদের আমলনামায় দশ-দশ নেকী লিখে দেবার আদেশ দিবেন।"[১]

অন্যত্র বলেছেন, "যদি কোন স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গমের সময় খুশিতে বিভোর হয়ে বলে—আল্লাহ্ আমাদের কি আশ্চর্য নিয়ামত, কি খুশি ও আনন্দের জিনিস দান করেছেন যার শোকর-গজারী করা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তাহলে আল্লাহ্‌পাক তাদের কথা বুঝতে পেরে তাদের উভয়ের ও পিতা-মাতার আমলনামার সমস্ত পাপ মাফ করে দেন।"[২]

"যখন কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করে এবং সেও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি স্থাপন করেন। অতঃপর যখন সে তাহার স্ত্রীর হস্ত ধারণ করে তখন তাহাদের পরস্পরের প্রীতি ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের পাপ বিদূরিত করিয়া দেন।" (সগির)

আল্লাহর এ অফুরন্ত নিয়ামত, যার তুলনা এ পৃথিবীতে কোন কিছুর সঙ্গেই হয় না, তা ভোগ করার সময় এ নিয়ামতদানকারীর শুকুর আদায় করা প্রতিটি নর-নারীরই কর্তব্য। শুধু মুসলমানই নয়, বিশ্বাসী সম্প্রদায় মাত্রই যারা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে, তাঁর কলা-কৌশল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারা দেখে বিস্মিত হয়, তাদেরই উচিত তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা ও মনপ্রাণ দিয়ে সঙ্গমের পূর্বে এরূপ নিয়ত করা ঃ

---

১ ও ২। হাদিস, সংগৃহীত মকসুদুল মোমেনিন। পৃষ্ঠা ৩৮৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আল্লাহুম্মা জান্নেব নাশায়তানা ওয়া জান্নেবী শায়তানা মিম্মা রাজাকতানা।" অর্থাৎ—হে আল্লাহ্ আমাকে শয়তানের হাত হতে বাঁচাও এবং আমার জন্য যা হালাল করেছ তা হতে শয়তানকে দূরীভূত কর।

অসুস্থ অবস্থায়, ভরা পেটে, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার মাঝে, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, বজ্রপাত বা নৈসর্গিক গোলযোগের সময় সহবাস নিষিদ্ধ। কেননা, তার প্রমাণ যৌনবিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। চন্দ্রমাসের প্রথম দিন, অমাবস্যা, পূর্ণিমার দিন সঙ্গম নিষিদ্ধ। এর ওপর হজরতের একটি বাণী নিম্নে প্রদত্ত ঃ

হজরত আলীকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—"হে আলী! চাঁদের ১৫ তারিখে বিবির সহিত কখনও সঙ্গম করিও না, কেননা ঐ তারিখে শয়তান লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।"[১]

হজরত আলী বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি চাঁদের প্রথম, মধ্যম ও শেষ তারিখে স্ত্রী সঙ্গম করে এবং তাহাতে সন্তান জন্মে তবে সে সন্তান কোন না কোন দোষে দোষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।"[২]

তিনি আরও বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি দুই ঈদের রাত্রে অথবা সফরে যাইবার রাত্রে সঙ্গম করে এবং তাহাতে সন্তান জন্মে তবে নিশ্চয়ই সে সন্তানও কোন দোষে দোষী হইবে।"

"সোমবার দিন বা রাত্রির সঙ্গমে যে সন্তানের জন্ম হইবে খোদার ফজলে সে সন্তান কারী হইবে। মঙ্গলবারের সঙ্গমে সন্তান জন্মিলে সেই সন্তান পুণ্যবান হইবে। বৃহস্পতিবারের সঙ্গমে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান জ্ঞানী ও খোদাভক্ত হইবে এবং ঐ দিন দুপুরের পূর্বে সহবাস করিলে যে সন্তান জন্মিবে, সে জ্ঞানী ও বিচারক হইবে।"

"আর জুমার রাত্রে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি) বা নামাজের পূর্বের সহবাসে যে সন্তান জন্মিবে সে পূণ্যবান ও সৎ হইবে। আর বুধবার ও রবিবারের সহবাসে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান ভাগ্যহীন হইবে।"[৩]

বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ঠিক নাও হতে পারে; কিন্তু নবী-পয়গম্বরদের বাণী ঠিক হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। চন্দ্রের প্রভাব মানবদেহের ওপর যে কার্যকরী একথা আজ বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় ও আরবীয় যৌনবিজ্ঞানীদের মতে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে নারীর যৌনবোধও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তাঁদের মতে, শুক্লপক্ষে অর্থাৎ প্রথম ১৫ দিন নারীর যৌনবোধ তার দক্ষিণ পাশে এবং শেষের ১৫ দিন বাম পাশে বিস্তৃত থাকে। শুক্লপক্ষে পায়ের পাতা হতে ক্রমশ উর্ধ্বদিকে উঠতে উঠতে মস্তক উপরি আরোহণ করে। কৃষ্ণপক্ষে বাম পাশ দিয়ে নেমে আবার পায়ের গোড়ালিতে আসে। পূর্ণিমার দুদিন পূর্ব হতে নারীর কাম-বাসনা তীব্রতর হয় বলেই আরবীয় বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। শুধু নারী নয়, পুরুষের কাম বাসনাও পূর্ণিমার দু-দিন পূর্ব হতে তীব্রতর হয় বলে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। আমাদের রসুল (দঃ) চাঁদের মাসের মধ্য অবস্থায় রোজা পালন করেছেন।

মেরী স্টোপ, মার্শাল, সেলহিম, কনওট্ হ্যাভলক, এলিস প্রমুখ যৌনবিজ্ঞানীরা তাঁদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত সন্ধানের মাঝেও এটাই খুঁজে পেয়েছেন যে নারীর কাম-স্পৃহা চন্দ্রের উত্থান-পতনের সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত।

১-৩। কেতাবোত্তবেবর—আবু নাইম; অছায়া—হজরত আলী।

বিশ্বের প্রতিটি পদার্থ নিয়েই গঠিত এ মানব দেহ। এমন আশ্চর্যকর সৃষ্টি আর কিছুই নেই। আগুন, বাতাস, মাটি, পানি, মূল উপাদান ছাড়াও কত অজস্র পদার্থ নিয়েই যে গঠিত এ দেহ তার তুলনা নেই।

চাঁদের ধুলি, মরুভূমির বালি, আকাশের গ্যাস, পাহাড়ের ধাতব পদার্থ, সূর্যের অগ্নি সবই তো আছে এ দেহে।

সব বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যেখানে জড়িত এ দেহ, সে দেহ চাঁদের ও সূর্যের প্রভাব পড়বে না এটা তো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বলতেই হবে যে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ মানব শরীরের ওপর প্রত্যক্ষভাবেই ক্রিয়াশীল। নইলে অমাবস্যায় সর্ব রোগের বৃদ্ধি হতো না। পূর্ণিমায় প্রাণীর জীবনে আনন্দের ধারা প্রবাহিত হতো না। দিনের আলোতে শক্তি আসত না। রাতের অন্ধকারে অবসাদ এসে চোখ বুঁজে যেত না।

সাত দিনের প্রতিদিনই যে শুভ একথাও আমরা এখন বিশ্বাস করতে পারছি না। একই শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য যেমন এক নয়, হাত-পায়ের সব আঙ্গুলের দ্বারা যেমন একই কার্য সাধিত হয় না—প্রতিটির জন্য যেমন বিশেষ কার্য ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, তেমনি সাত দিনের প্রতিদিনের গুণাগুণেও নিশ্চয়ই পার্থক্য রয়েছে—যার বিশ্লেষণ বিজ্ঞানীরা আজও দিতে পারেন নি। আধ্যাত্মিক তাপস ও মহামানবদের মুখেই কেবল এসব দিনের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় পাওয়া যায়। হজরতের এরূপ একটি বাণীর এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। হজরত আলী হতে বর্ণিত—তিনি বলেন, "আমাকে রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, হে আলী! আল্লাহ্ সাত দিনের মধ্যে সাতটি কাজ নিহিত রেখেছেন তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি তোমাকে তা শিক্ষা দিচ্ছি, তুমি করো ফল পাবে। যথা—শনিবারে শিকার করা, দালান, ইমারত আরম্ভ করা, রবিবারে গাছ লাগান এবং শস্য বোনা, সোমবারে বিদেশে যাত্রা করা, মঙ্গলবারে ক্ষৌর কর্ম করা, বুধবারে ওষুধ খাওয়া আরম্ভ করা, বৃহস্পতিবারে দোওয়া-কালাম বকশাইয়া দেওয়া, শুক্রবারে বিবাহ ও সহবাস করা ইত্যাদি। সুতরাং এই সাত দিনের মধ্য উল্লিখিত সাতটি কাজ করলে নিশ্চয়ই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কিন্তু ভাল তারিখেও উপরোল্লিখিত কোন খারাপ সময় পাওয়া গেলে ঐ সময় ঐরূপ কাজ না করাই উত্তম। যেমন—অমাবস্যা, পূর্ণিমা।"[১]

(দিওয়ান আলী কেতাব, উদ্ধৃত মকসুদুল মোমেনিন, পৃঃ ৩৯১)

সহবাসের সময় অতিরিক্ত কথা বলা নিষেধ। 'বোস্তান' কেতাবে উল্লিখিত আছে যে, সহবাসের সময় অতিরিক্ত কথা বললে যে সন্তান গর্ভস্থিত হবে সে বোবা হবার সম্ভাবনা। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, খাবার পর ভরা পেটে অথবা রাত্রির প্রথম অংশের সহবাসে যে সন্তান গর্ভস্থিত হয় সে সন্তান মূর্খ হবে।

'শার আতুল ইসলামে' আছে "স্ত্রীর যৌনাঙ্গের দিকে তাকিয়ে সহবাস করলে যে সন্তান গর্ভস্থিত হয় সে সন্তান অন্ধ বা টেরা চোখ বিশিষ্ট হবে।"[২]

অন্যত্র বলা হয়েছে—"যখন তোমাদের কেহ স্ত্রী সঙ্গম করে সে যেন গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, যেহেতু উহাতে উত্তরাধিকারী অন্ধ হইবে এবং বোবা হইবে নতুবা সন্তান তোতলা হইবে।" (সগির)

১-৪। সংগৃহীত মকসুদুল মোমেনিন—আলহাজ্ব কাজী মাওলানা গোলাম রহমান। সগির, সংগৃহীত হাদিসের আলো; ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'রেফাহুল মোসলেমিন' কেতাবেও ঐরূপ কথাই লিখিত আছে। যেখানে আরও বলা হয়েছে যে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় সহবাস করলে যদি কোন সন্তান গর্ভস্থ হয় তবে সে ২১/২২ অঙ্গুলিওয়ালা হবে।'[৩]

'আদম ফিল'-এ বর্ণিত আছে—"রাত্রির প্রথম প্রহর হইতে দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যে সঙ্গম করিলে যে সন্তান গর্ভস্থিত হয় সে সন্তান ভাগ্যবান হইবে।"[৪]

সেরাজিয়ায় আছে, "সহবাসের পরও স্ত্রী কিছুক্ষণ চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবে নচেৎ গর্ভস্থিত হইবে না। হইলেও সন্তান বিকলাঙ্গ হইবার সম্ভাবনা আছে।"[১]

সঙ্গমকালে নারীর যৌনাঙ্গের দিকে তাকান কেন নিষেধ হজরতের এ বাণীটির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দরকার। কেননা, আধুনিক রুচিসম্মত অনেক শিক্ষিত যুবকই হয়তো বলতে পারেন যে সঙ্গমের সময় কথা না বললে আনন্দ আসে না। নারী অঙ্গ না দেখে সঙ্গম করলেও তৃপ্তি হয় না। দু'জনেই দু'জনের যৌনাঙ্গ চুম্বন, লেহন বা ঘর্ষণে প্রচুর আনন্দ পায়। অথচ এ আনন্দ থেকে দূরে থাকা কি উচিত?

মহামনীষীরা যা কিছু বলে গেছেন সব কিছুর পেছনেই যুক্তি আছে। বিশেষ করে আমাদের নবী-সম্রাট হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যা বলেছেন তার মধ্যে যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে। সবকিছুই মানবের মঙ্গলের জন্য। সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে বিরাট স্বার্থ নিহিত। এ স্বার্থ—সমাজ, ধর্ম, ইহকাল ও পরকালের জন্য।

মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গই একধর্মী নয়। কোনটিতে আছে আকর্ষণ ক্ষমতা, কোনটিতে বা বিকর্ষণ ক্ষমতা। একই চুম্বক শলাকার এক প্রান্তে থাকে 'নর্থ-পোল', অন্য প্রান্তে থাকে 'সাউথ-পোল'। এক প্রান্তকে বলা যায় 'পজিটিভ'—অন্য প্রান্ত 'নেগেটিভ'। নেগেটিভ ও পজেটিভ একই বস্তুতে বিরাজমান বলেই বস্তুটি সুদৃঢ় ও কার্যক্ষম হয়। মানবদেহের কোষগুলিও ঠিক তেমনি একধর্মী না হয়ে ভিন্নধর্মী হয়। পুরুষ ও নারী জাতি প্রকৃতিগতই বিপরীতধর্মী। তাই এদের মধ্যে আকর্ষণ বিদ্যমান। তবুও নারী অঙ্গের কোন অংশে পুরুষের চোখ পড়লে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। আবার কোন অংশে চোখ পড়লে আকৃষ্ট হয় না। সেখানে চোখ পড়লে আকৃষ্ট হয়, মনে করতে হবে যে চোখ ও সেই অঙ্গটির মধ্যে বিপরীতধর্মী ইলেকট্রন ও প্রোটন রয়েছে। ঠোঁট দিয়ে নারীর ঠোঁটে ও গালে চুমু খেলে দু'জনের যত আনন্দ হয় ও শীঘ্র উত্তেজনা হয়, সেই ঠোঁট দিয়ে পায়ে, হাতে অথবা পিঠে চুমু খেলে আকর্ষণ তো হবেই না, বরং বিরক্ত আসে। সারাদিন ধরে কেউ কারো পায়ে বা পিঠে কামড়ালে কোন ভাবেরই উদয় হয় না। এর কারণ এই যে, ঠোঁটের কোষ ও পায়ের কোষের মধ্যে বিকর্ষণ ক্ষমতা বিদ্যমান। অনুরূপভাবে ঠোঁটে ঠোঁটে, ঠোঁটে ও গালের কোষের মধ্যে থাকে আকর্ষণ ক্ষমতা।

নারীর যৌনাঙ্গ এত বিশ্রী যে পুরুষ বেশিক্ষণ এর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না। অল্পক্ষণ দেখার পরই যেন এক ঘৃণার ভাব এসে পড়ে। এর মূলগত কারণ এই যে, নারীর যৌনাঙ্গের কোষের সঙ্গে পুরুষের চোখের কোষের এক বিকর্ষণ ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। বার বার তাই তাকালে চোখের ওপর ভীষণ ক্রিয়া সাধিত হয়, যার ফলে এ কোষগুলোর অবনতি ঘটে। চোখের কোষের অবনতি ঘটার অর্থ দৃষ্টিহীনতা। এ জন্যই আমার নবীর এ নির্দেশ।

১। সংগৃহীত মকসুদুল মোমেনিন। আলহাজ কাজী মাওলানা গোলাম রহমান। ছগির, সংগৃহীত হাদিসের আলো, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২।

সঙ্গমকালে অতিরিক্ত কথা বললে কেন ছেলে বোবা হবার সম্ভাবনা থাকে, উৎফুল্ল হৃদয়ে সঙ্গম না করলে ছেলে কেন বদমেজাজি ও নির্বোধ হয় এসব কথাগুলোর বিশ্লেষণ আশা করি যৌনবিজ্ঞানী ভাইয়েরা আমাদের দেবেন। সঙ্গমের ফলে যে সন্তান মায়ের গর্ভে আসে তার চেহারা, চালচলন, স্বভাব-চরিত্র কেমন হয় অর্থাৎ মায়ের মতো, না বাবার মতো এবং কেন হয় এর কোন জবাব আমরা বিজ্ঞানীরা আজও দিতে পারি নি। দেখি আমাদের যৌনবিজ্ঞানী হজরত এর কোন সমাধান দিয়েছেন কি না।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম নবী করিম (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি কারণে সন্তান হয় বাপের মতো এবং কি কারণে সন্তান হয় মায়ের মতো?"

হজরত উত্তর দিলেন—"যখন পুরুষ সহবাস করে স্ত্রীর সহিত, তখন যদি পুরুষের বীর্যপাত প্রথমে হয় তবে সাদৃশ্য হয় তাহার সহিত আর যদি স্ত্রীর বীর্যপাত প্রথমে হয় তবে সাদৃশ্য হয় উহাদের সহিত।"[১]

একই মায়ের গর্ভে কত সন্তানের জন্ম হয় অথচ তাদের স্বভাব, চরিত্র ও দৈহিক গঠন এক নয়। কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ শান্ত, কেউ উগ্র, কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা। এর কারণ কি? তা আমরা বুঝতে পারি নি। তবে মায়ের অথবা বাপের বংশজাত স্বভাব চরিত্র সন্তানের মধ্যে প্রতিফলিত হয় এ কথাই আমরা জানতাম। পুরুষ শুক্রকীটের প্রাধান্য যদি নারী শুক্রকীটের (ডিম্বের) ওপর হয় তা হলে বাপের স্বভাব চরিত্র ও চেহারা সন্তানের ওপর পড়ে। আর যদি এর উলটো হয় তবে মায়ের সাদৃশ্য হয় এ কথা আমরা বলে থাকি। কিন্তু পুরুষ শুক্রকীটের প্রাধান্য নারীর ওপর কিভাবে হয় তা আমরা পরীক্ষাগার থেকে বুঝতে পারি নি। হেরা গুহার বিশাল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এর প্রকৃত ফলাফল দিলেন আমার নবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। যারা ধর্ম গেল, ধর্ম গেল বলে চিৎকার করতে থাকেন—'উম্মির' অর্থ অশিক্ষিত বলে যে সব পণ্ডিতেরা আমার নবীকে ছোট করে থাকেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করে বলছি,—আপনারা এ অর্থ আর করবেন না। সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী আমার নবী (সঃ), যার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা করতে আমি লজ্জা বোধ করি। কেননা, তিনি নিজেই বলেছেন—"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে সবকিছুর তত্ত্ব আমি অবগত হলাম।" (মিশকাত)

দেখুন কেমন এবং কত বড় বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল এ ধরার বুকে। সালাম—লাখ সালাম তোমার প্রতি।

মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাবের মধ্যে সঙ্গম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে হজরতের কঠোর আদেশ বিদ্যমান। উক্ত সময়ে স্বামীর পৃথক বিছানায় থাকাই উত্তম। কেননা, স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বিছানায় থাকলে স্বামীর কাপড় দূষিত হবার সম্ভাবনা। অবশ্য যদি স্ত্রী সতর্কতা অবলম্বন করে থাকতে পারে তবে দোষের কিছু থাকে না। কিন্তু সঙ্গম কোন মতেই চলবে না। এ বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশও নিম্নরূপ ঃ

"এবং তাহারা তোমাকে ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুমি বল, উহা অশুচি। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীলোকদিগকে অন্তরাল কর এবং বিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের

১। সহীহ বুখারী—তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। পৃষ্ঠা ২৭০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সন্নিকটবর্তী হইও না। অনন্তর যখন তাহারা পবিত্র হইবে তখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে স্থান হইতে আদেশ করিয়াছেন তোমরা তাহাদের নিকট গমন কর। আল্লাহ্ ক্ষমাপ্রার্থীগণকে ভালবাসেন এবং শুদ্ধাচারিগণকেও ভালবাসিয়া থাকেন।"[১] (২ ঃ ২২৩)

আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি মহিমা কে বোঝে, কার সাধ্য? একই ভাত, মাছ, তরি-তরকারী খাই, একই রক্ত-মাংসে গঠিত এ দেহ। আমাদের শরীর হতে রক্ত ফেলে দেবার প্রয়োজন পড়ে না—অথচ মেয়েদের শরীর থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত সরিয়ে না দিলে এরা সুস্থ থাকে না, যৌন-বাসনা প্রবল হয় না, মানসিক ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় না। উপরন্তু কঠিন রোগে যথা মস্তিষ্কবিকৃতি, গা জ্বালা, নিদ্রাহীনতা, অশান্তি, জরায়ু ব্যথা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ে। যে সব নারীর নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, তারাই সম্যক উপলব্ধি করতে পারে এটা কি অদ্ভুত বিপদ!

যা হোক আমাদের আলোচনা—কেন ঋতুস্রাবের সময় সঙ্গম নিষিদ্ধ। ঐ সময় জরায়ু অভ্যন্তরে এক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। সমস্ত দেহের দূষিত পদার্থ রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে জরায়ুতে আসে। জরায়ু থেকে তা নির্গত হয়ে নারীকে সুস্থ রাখে। এ সময় জরায়ুর ওপর এক ভীষণ চাপ পড়ে। ফলে অনেকের জরায়ু ফুলে যায় এবং ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়ে। এ সময় সঙ্গমে লিপ্ত হলে জরায়ুর ওপর কেমন আঘাত পড়তে পারে এবং তার ফলাফল কি হতে পারে তা সবাই উপলব্ধি করতে পারেন। ডাক্তারদের মতে, এ সময় সঙ্গম করলে জরায়ু উলটে যাবার সম্ভাবনা, স্থানচ্যুত হবার সম্ভাবনা, আঘাতে জরায়ুতে ঘা হয়ে শ্বেতপ্রদরের সম্ভাবনা ও জরায়ু বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া মলমূত্র ত্যাগে কষ্ট, ঋতুর বিশৃঙ্খলা, জরায়ু মূর্ছা, স্নায়ুসমূহের উগ্রতা ইত্যাদিরও সম্ভাবনা থাকে।

শুধু নারীরই নয়, পুরুষেরও কঠিন রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। জরায়ু হতে নির্গত দূষিত রক্ত পুরুষের লিঙ্গকেও আক্রান্ত করতে পারে, এর অবসাদ আনতে পারে। চুলকানি, পাঁচড়া ও কঠিন চর্ম রোগে পুরুষকে অকেজো করে দিতে পারে। এজন্য ঋতুস্রাব শেষ হবার পর স্ত্রী পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সহবাস নিষিদ্ধ। প্রতিটি যৌনবিজ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ববিদ, মহাপুরুষ, ডাক্তার, কবিরাজ কেউ এ সময়ের মধ্যে সঙ্গম করতে আদেশ করেন নি শুধু স্বামী-স্ত্রীর মঙ্গলের জন্যই। রোগে, শোকে, দুঃখে যেমন সঙ্গম নিষিদ্ধ তেমনি ঋতুস্রাবের সময় সঙ্গম নিষিদ্ধ। এতে আমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে বলেই আল্লাহ পাকও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ বিধি আমাদের মানতেই হবে।

একটা প্রশ্ন অবশ্য সবার মনেই আসে যে, যে সব স্বামী বিদেশে থাকে তারা হয়তো এমন সময় বাড়ি আসল যে স্ত্রীর তখন ঋতুস্রাব হচ্ছে। এ সময় সঙ্গম করা নিষিদ্ধ। অথচ সাত দিন অপেক্ষা করার সময় নেই। তখন তারা কি করবে?

মহামনীষী ইমাম গাজ্জালী সাহেব তাঁর কিমিয়ায়ে সা'আদত পুস্তকে লিখেছেন যে স্বামী উলঙ্গ হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে জড়াজড়ি করতে পারে এবং বাহ্যিক আলিঙ্গনাদি, চুম্বন, দংশন তৃপ্তি লাভ করতে পারে এতে দোষের কিছু নেই।

১। কোরআন ঃ সূরা বাকারাহ, আয়াত ২২৩।

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

দাম্পত্য জীবন সুখের ও সুন্দর করতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই সজাগ থাকতে হবে—অশেষ ধৈর্য নিয়ে সংসারে পা বাড়াতে হবে। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। এর ওপর আলোচনা ব্যাপক। এখানে আমি তা করতে পারছি না। কেননা, শুধু এটাই আমার বিষয়বস্তু নয়। সংক্ষেপে সবকিছুর ওপরই আমাকে আলোচনা করতে হবে এবং হজরতের অমিয় বাণী ও উপদেশাবলী নর-নারীর কানে কানে পৌছাতে হবে।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

হজরত বলেছেন, "স্ত্রী যদি স্বামীর অধিকার সম্বন্ধে অবগত থাকিত তবে সে কখনও তাহার প্রাতঃভোজন হইতে নৈশভোজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপবেশন করিতে পারিত না।"[১]

নারী জাতির জন্য হজরতের এ বাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীর সংসারে ডুবে থাকা, স্বামীর ঘর-দুয়ার ও বিষয়াদি সম্পূর্ণ নিজের মনে করে রক্ষণাবেক্ষণ করা, ছেলে-মেয়েদের মানুষ করা, স্বামীর খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় পরিষ্কারাদি নিজ হাতে সম্পন্ন করা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। যারা এ কর্তব্য পালন করে তারাই শান্তিদায়িনী পুণ্যবতী স্ত্রী। এরা প্রবাল মুক্তার মতো স্বামীর ঘরে জ্বলে ও স্বামীর সংসার আলোকিত করে। বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের স্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন হয়। এদের স্বভাবগত যে প্রকৃতি গড়ে ওঠে তার ফলে স্বামী হয় সুখী যার উল্লেখ করেছেন আমার নবী।

তিনি বলেছেন, "আমি কি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন সম্বন্ধে সংবাদ দেব না যাহা মানুষের সঞ্চয় করা উচিত। উহা হইতেছে পুণ্যবতী স্ত্রী। তাহার স্বামী যখনই তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে সে তাহাকে সন্তুষ্ট করে; যখন সে কোন আদেশ দেয় সে তাহা পালন করে এবং সে যখন তাহার নিকট অনুপস্থিত থাকে—সে সতীত্ব রক্ষা করে।"[২]

ঠিক অনুরূপ আর একটি হাদিস আমরা ইবনে মাজাতে পাই। সেখানে আছে, "আল্লাহকে ভয় করার পর মুমেন পুণ্যশীলা স্ত্রীর চেয়ে কিছুই অধিকতর উৎকৃষ্ট দেখিতে পায় না। সে যদি তাকে আদেশ করে সে তাহা পালন করে, সে যদি তাহার দিকে দৃষ্টি করে, সে তাহাকে আনন্দ দান করে। সে যদি তাহাকে কোন প্রতিজ্ঞা করায় সে উহা পালন করে এবং সে যদি তাহার নিকট হইতে অনুপস্থিত থাকে সে তাহার নফ্স ও মালকে রক্ষা করে।"[৩]

ওপরে বর্ণিত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে স্ত্রীর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভালমন্দ কাজ সবকিছুই স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী হওয়াটাই শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল। যে স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে, স্বামীর অবাধ্য, স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে, সে স্ত্রী বিষধর সর্পের ন্যায়। স্বামীকে দেবতার ন্যায় যেমন ভক্তি করতে হবে, তেমনি প্রেমের নায়ক হিসাবে তার সঙ্গিনী হয়ে প্রেম করতে হবে। নার্স

১। সগির। সংগৃহীত হাদিসের আলো, কৃত পূর্বে বর্ণিত, ২য় খণ্ড।
২। আবু দাউদ। সংগৃহীত হাদিসের আলো, পূর্বে বর্ণিত।
৩। ইবনে মাজা। সংগৃহীত হাদিসের আলো, পূর্বে বর্ণিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়ে যেমন সেবা করতে হবে, রাজরাণী হয়েও তেমনি তার হৃদয়রাজ্যে বিচরণ করতে হবে। এক কথায় বলতে হয়, স্বামীর জন্য দাসীবৃত্তি, পাচিকা, প্রেমিকা, নায়িকা, রক্ষিকা, ভক্ষিকা, গায়িকা যখন যা প্রয়োজন তাই করতে হবে। মনে রাখতে হবে, নারী সৃষ্টি শুধু পুরুষের সেবা ও সন্তুষ্টির জন্যই। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার কিরূপ হতে হবে প্রতিটি ধর্মের মনীষীই তা বলে গেছেন। সেগুলোও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা ও প্রতিপালনযোগ্য। হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

কার্যে দাসী, রতৌ বেশ্যা, ভোজনে জননীসমা।
বিপত্তৌ বুদ্ধি দাত্রী চাসা ভার্য্যা সর্ব্ব দুর্লভা।[১]

অর্থাৎ—সেবায় দাসী, শয়নে বেশ্যা, আহারে জননী, সহানুভূতিতে মিত্র, উপদেশে গুরু, সন্তান উৎপাদনে স্ত্রী।

স্ত্রীর নিকট পুরুষের স্থান যে কত উর্ধ্বে হজরতের নিম্নোক্ত বাণী হতে তা বুঝা যায়। এ বাণীর মর্মকথা উপলব্ধি করে যদি নারীরা চলত তাহলে তারা এ পৃথিবীতেই বেহেশ্‌ত রচনা করতে পারত। এ শিক্ষা প্রতিটি ধর্মের, প্রতিটি দেশের নারী জাতির জন্যই প্রযোজ্য।

হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, "একদা হজরত কতিপয় মুহাজেরিন ও আনসারদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়ে তথায় একটি উষ্ট্র উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সেজদা করিল। তাহারা বলিলেন, 'হে রসুলুল্লাহ! পশুগণ এবং বৃক্ষাদি পর্যন্ত আপনাকে সেজদা করে?' তিনি বলিলেন, 'তোমাদের প্রভুর এবাদত কর এবং তোমাদের ভ্রাতাকে সম্মান কর। যদি আমি অপর কাহাকেও সেজদা করিতে বলিতাম তবে নারীদিগকে বলিতাম তাহাদের স্বামীদিগকে সেজদা করিতে।"[২]

এ গুরুত্বপূর্ণ হাদিসটি আমরা শৈশবকাল থেকেই শুনে আসছি। প্রতিটি ইসলামী সম্মেলনেই বক্তাগণ নারীদের উদ্দেশে এ মহামূল্যবান হাদিসটি বর্ণনা করেন, কিন্তু সমাজে এর প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায় না। স্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ্যতা ও অশোভন আচরণ স্বামীর প্রাণে যে কেমন আঘাত হানে তা প্রতিটি ভুক্তভোগী পুরুষই জানে। তবুও এর কোন প্রতিকার হচ্ছে না। এটা বাস্তবিকই দুঃখের কারণ। এ বিষয়ে আমার মনে হয় হিন্দুরা যথেষ্ট সজাগ। তাদের পরিবারের মেয়েরা স্বামীকে ঠিক দেবতার মতোই ভক্তি করে, স্বামীকে দেবতা বলেই তারা জানে। কেননা, তাদের ধর্মগ্রন্থেও এ কথাই বলা হয়েছে—

"দুঃশীল কামবৃত্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
স্ত্রীনাং আর্যস্বভাবানাং পরমং দেবতং পতিঃ॥ (মহাভারত)

অর্থাৎ—স্বামী দুঃশীল বা যথেচ্ছাচারীই হউন না কেন স্ত্রীর নিকট তিনিই পরম দেবতা।

ধর্মের এ শিক্ষা যেন অতি শৈশব থেকেই তারা মায়ের কাছে শিখে নেয়। তাই দিনের প্রারম্ভেই একবার স্বামীকে প্রণাম করে। শিক্ষিতা, অশিক্ষিতা, সতী, অসতী, বাধ্য, অবাধ্য সব নারীর জন্যই যেন এটা বিধিবদ্ধ। কিন্তু মুসলিম সমাজের খুব কম পরিবারের মধ্যেই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এমন ব্যবহার দেখা যায়। যাদের ভেতর দেখা যায় তারাই সুশিক্ষিত, ধর্মভীরু ও অভিজাত বংশের। শৈশবের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এ শিক্ষা নির্বিচারে চলে সারা জীবন। যে মেয়ে তার মাকে দেখে তার বাবার প্রতি ব্যস্ত, ভক্ত ও অনুরক্ত—তাকে নিয়েই

১। সুভাষিত রত্ন ভাণ্ডাগারম্—ষষ্ঠ প্রকরণ। উদ্ধৃত, যৌনবিজ্ঞান—আবুল হাসানাত, পৃষ্ঠা ৪২৪।
২। মিশকাত।

তার জীবন, সুখে-দুঃখে একদেহ একআত্মা—সেই মাতার মেয়ে স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই দুর্ব্যবহার করতে পারে না। মায়ের মতো সেও স্বামীকে হৃদয়ের মাঝেই টেনে নিয়ে তার সেবাতেই নিজেকে সঁপে দিতে চায়। আর যে মেয়ে তার মাকে দেখে পিতার সঙ্গে কলহ করতে, উপদ্রব করতে, অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে, সে মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে এলেও স্বামীকে দেবতার মতো ভক্তি করবে না। মায়ের স্বভাব একশ' ভাগ না খাটালেও নব্বই ভাগের মধ্যে কোন ভুল হবে না। সিনেমা না দেখালে ভাত রাঁধবে না, শাড়ি না আনলে কথা বলবে না, গয়না না দিলে দেহদান করবে না। কি করে এদের নিয়ে দাম্পত্য জীবন সুখের হবে? শিক্ষা দিতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষায় পরকালের ভীতি আনতে হবে। সাংসারিক শিক্ষায় জীবনযাত্রার কৌশল শেখাতে হবে। যৌনশিক্ষায় হৃদয় মনে আলোড়ন আনতে হবে। স্বামীর মর্যাদা ও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ ও রসুলের বিধান অনুযায়ী বুঝাতে হবে—বাস্তব জীবনে ও শিক্ষাজীবনে। প্রতিটি পরিবারেই সুশীলা, ধর্মপরায়ণা, বুদ্ধিমতী নারী গড়তে হবে, যারা বুঝবে রসুল (দঃ)-এর এমন গুরুত্বপূর্ণ বাণী।

দাম্পত্যজীবন সুখের ও সুন্দর করতে হলে রসুল (দঃ)-এর জীবনচরিত জানতে হবে। অন্ধের মতো তা বিশ্বাস করে পালন করতে হবে। কেননা রসুল (দঃ)-এর আদেশ ও উপদেশ সম্পূর্ণই বিজ্ঞানসম্মত। শান্তি, শৃঙ্খলা, ন্যায় ও পুণ্যের জন্য এমন বাণী আর কেউ দিতে পারে নি। দেখুন দাম্পত্য জীবনের জন্য কেমন সুন্দর তাঁর বাণী। তিনি বলেছেন,

"যখন কেন পুরুষ তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে আর সে অস্বীকার করে এবং পুরুষ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ অবস্থায় রাত্রি কাটায়, ফেরেশ্‌তারা অভিসম্পাত দেয় তাহাকে (ঐ স্ত্রীকে) ভোর পর্যন্ত।"[১]

এর ওপর বিশ্লেষণের আর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কেননা 'পুরুষ চরিত্র' পরিচ্ছেদে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। তবুও দু-একটি কথা বলেই শেষ করছি।

যৌন-ক্ষুধার চেয়ে তীক্ষ্ণ ও প্রবল ক্ষুধা জীব-জন্তুর জীবনে আর নেই। যখন দেহে এ ক্ষুধার জ্বালা অনুভূত হয় তখন মানুষ এবং জীবজন্তু দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাই খাওয়া-দাওয়া, আরাম-আয়েস ভুলে গিয়ে ইচ্ছে জাগে মিলনের। যদি মিলন ঘটে তবে সে কণ্টকপূর্ণ ধরাকে সুষমামণ্ডিত বেহেশ্‌ত মনে করে। সত্যই যৌন-মিলনের সুখ ধরার কোন সুখের তুল্য নয়। বেহেশ্‌তের অপরূপ সুখেরই সামান্য একটু নিদর্শন। এ সুখের সময় এ জন্যই আল্লাহর কাছে শুকুর আদায় করতে হয়। স্ত্রী যদি স্বামীকে এ সুখ থেকে বঞ্চিত করে তবে এর পরিণাম কি হতে পারে জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর দরকার নেই, একটি অশিক্ষিত ও মূর্খকে জিজ্ঞেস করলেই তার সুন্দর জবাব পাওয়া যাবে। অশিক্ষিত, অশান্তিকারিণী এ মূর্খ নারী, শুধু স্বামী দ্বারাই উপেক্ষিত হবে না—ফেরেশ্‌তাদের দ্বারাও হবে অভিসম্পাদিতা ও মহান আল্লাহর কাছেও পাবে এর উপযুক্ত শাস্তি। দাম্পত্য জীবন সুখময় করবার ইচ্ছা যদি কোন নারীর থাকে তবে সর্বপ্রথম এ বিষয়েই স্বামীকে সুখী করতে হবে (অবশ্য এর মধ্যে অন্তরায় থাকতে পারে যা উভয়ে মিলে এর সমাধান খুঁজে নেবে)। এরপর তাদের আর কি কর্তব্য রয়েছে হজরতের নির্দেশ তাদের প্রতি কেমন তার দু-চারটি হাদিস মাত্র তুলে ধরছি। খুব গভীরভাবে এগুলো মেয়েরা চিন্তা করবেন এবং পালন করে বেহেশ্‌তের মধ্যে আপনাদের অনন্তকালের

১। সহীহ বুখারী। সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ। তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। হাঃ নং ২২/১৯৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য সুখের আবাস গড়ে তুলবেন। শিক্ষিতা মেয়েরা এগুলো মুখস্থ করবেন এবং অন্যান্য মেয়েদের শিক্ষা দেবেন যেন তারা সুখী ও সুন্দর পরিবার গড়ে তুলতে পারে।

হজরত বলেছেন—

(১) "যে স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে সাত দিন তার স্বামীর খেদমত করবে তার জন্য বেহেশ্‌তের সাতটি দরজা খোলা হবে।"

(২) "যে স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে নিজের স্বামীর কাপড় ধৌত করে দেবে আল্লাহ্ তার আমলনামা হতে দু-হাজার গুণাহ কেটে দেবেন। আর আকাশ ও পৃথিবী মধ্যস্থিত ফেরেশ্‌তাগণ তার জন্য নেক দোওয়া করতে থাকবেন।"

(৩) "যখন কোন স্ত্রী তার স্বামী কর্তৃক গর্ভবতী হয় তখন ঐ গর্ভের দিন থেকে শুরু করে প্রসব বেদনা উপস্থিত হবার পূর্ব পর্যন্ত সে দিনে রোজা রাখার ও রাত্রিতে নফল এবাদত করার সমান সওয়াব পাবে। আর যখন প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় তখন আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশ্‌তের মধ্যে এমন সব বস্তু গচ্ছিত রেখে দেন যার সন্ধান পৃথিবী, আকাশ, বেহেশ্‌ত ও দোজখবাসী কেউ জানে না। আর যখন সন্তান প্রসব করে তখন থেকে দুধ ছাড়ান পর্যন্ত প্রতি ঢোক দুধের পরিবর্তে আল্লাহ্ তাকে এক একটি করে নেকী দান করেন। ঐ সময়ে মৃত্যু হলে সে নারী শহীদের দরজা প্রাপ্ত হয়। আর যদি তাকে তার সন্তানের জন্য কোন রাত্রি জাগতে হয় তবে আল্লাহ্ তাকে ঐ রাত জাগার পরিবর্তে সত্তরটি গোলাম আজাদ করার সওয়াব দেন।"

হজরত বলেছেন, "এ পুণ্যের মালিকা হবে তারাই যারা সর্বদা আল্লাহর হুকুম ও স্বামীর হুকুম পালন করে থাকে। আল্লাহ্ ও স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীদের এ পুণ্য দেওয়া হবে না।"

(৪) "যে সমস্ত স্ত্রীলোক স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে হিংসা না করে ধৈর্য ধরে থাকে আল্লাহ্ তাদের শহীদের তুল্য পুণ্য দান করবেন।"

(৫) "যে স্ত্রীলোক পবিত্র নিয়মে পুণ্যের আশায় নিজ সংসারের কাজকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের জেহাদের তুল্য পুরস্কার দেবেন।"

(৬) "স্ত্রীলোকদের গমচূর্ণ ও ধান ভানাই ধর্মযুদ্ধ স্বরূপ।"

(৭) "স্বামীকে দেখে খুশিচিত্তে যারা সম্মুখে উপস্থিত হয় ও মারহাবা বলে সন্তোষ প্রকাশ করে সে সব স্ত্রীলোক জেহাদের অর্ধেক পুণ্য পাবে।"

(৮) "যে স্ত্রী তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে (অর্থাৎ বিদেশ থাকা কালে) সাজসজ্জা করবে না—সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র বন্ধ রাখবে, নিজ দেহকে কু-কাজ থেকে রক্ষা করে সব সময় নামাজ, রোজা ইত্যাদি করতে থাকবে। নিশ্চয়ই সে কিয়ামতের দিন ১৬ বছরের যুবতীর ন্যায় হয়ে বেহেশতে স্থান পাবে। তার স্বামী যদি বেহেশ্‌তবাসী হয় তবে তার সংগেই তার বিবাহ দেওয়া হবে।"

(৯) "যে স্ত্রীলোক স্বামীকে গালি দিয়ে মনে কষ্ট দেবে তার ওপর আল্লাহর গজব নাজেল হবে এবং ফেরেশ্‌তা ও সমস্ত লোকের বদদোয়া পড়বে।"

(১০) "যে স্ত্রী স্বামীর সাধ্যের অতিরিক্ত জিনিসপত্র দাবি করে স্বামীর মনে আঘাত দেয় সে স্ত্রী কখনও বেহেশ্‌তে যেতে পারবে না।"

(১১) "যে স্ত্রী তার স্বামীকে বলে তোমার কোন কাজই আমার পছন্দ হয় না তখনই তার সত্তর বছরের এবাদতের পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়। যদিও সে দিনে রোজা থাকে, রাতে নামাজ পড়ে সত্তর বছরের পুণ্য সঞ্চয় করে।"

(১২) "যদি কোন স্ত্রীলোক পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য স্বামীকে দিয়ে গর্ব করে বলে যে, এ সম্পত্তি তোমাকে কে দিয়াছে বা কোথায় পেয়েছে? তখনই তার পূর্বেকার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়।"

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

দাম্পত্য জীবন সুখের ও শান্তিময় করে গড়ে তুলবার জন্য আমরা নারীকেই বিশেষভাবে উপদেশ দিয়ে থাকি। কেননা, নারীর ধৈর্য ও সহনশক্তি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু এ বিষয়ে পুরুষের কর্তব্য কি কম? দাম্পত্য জীবন নারী-পুরুষের সমবায়ের জীবন, সহানুভূতির জীবন, সমঝোতার জীবন। তাই শুধু নারীর সহানুভূতি, ভালবাসা, প্রেম, ধৈর্য ও ব্যবহার নিয়েই সুখের জীবন গড়ে উঠতে পারে না। কর্তব্যের ক্ষেত্রে কম-বেশি নেই। উভয়ের কর্তব্যই এক, সমান। এ জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) উভয়ের জন্যই কর্তব্য নির্দেশ করেছেন—যার সামান্য কিছু তুলে ধরছি। মনের মিল, আত্মার মিল, উভয়ের মিল সমান না হলে দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। ভাবের আবেগে, যৌন-প্রবৃত্তির তাগিদে, মন যোগানোর সাময়িক ইচ্ছায় পুরুষ তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরতে পারে, চুম্বন-আলিঙ্গন করতে পারে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি আনতে পারে না। যৌন-মিলনের শান্তি সসীম ও সাময়িক, আর দাম্পত্য জীবনের শান্তি অসীম ও চিরস্থায়ী ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। পৃথক মন, পৃথক আত্মা ও পৃথক আকৃতি বিশিষ্ট ভিন্ন পরিবেশের দুটি নর-নারী যে এক প্রাণ নিয়ে জীবন কাটায় এটা সত্যি আশ্চর্য।

তাই চলুন, আমরা আল্লাহর শুকুর আদায় করি ও আমাদের সম্বন্ধে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রসুলুল্লাহ (দঃ) দেখিয়েছেন তা শিখি, পালন করি ও সুখের দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলি।

চোদ্দশ' বছর আগে নবী করিম (দঃ) বলেছেন—

"নারীর ঈমান ও জ্ঞান-বুদ্ধি পুরুষের ঈমান ও জ্ঞান-বুদ্ধির অর্ধেক মাত্র।"[১]

আমি পূর্বে 'নারী পুরুষের পার্থক্য' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি যে পুরুষের মস্তিষ্ক ও সেরেবেলাম (Weight of brain and cerebeilum)-এর ওজনের অনুপাত

$$১ : ৮\frac{৪}{৫} \text{ এবং নারীর } ১ : \frac{১}{৪}।$$

মস্তিষ্কের যে সব পরিমাণের ওপর জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়া উচিত তা নির্ভর করে Cerebeilum-এর ওপর।

নারী জাতির বুঝ, বিচারশক্তি, কার্য-ক্ষমতা, সূক্ষ্ম চিন্তাধারা, দৈহিক শক্তি ও সৃজন শক্তি পুরুষের তুলনায় নিতান্তই কম। এজন্যই এদের ওপর প্রাধান্য করতে আল্লাহপাক পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন। কোরআনে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে—"পুরুষগণ নারীদের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত, যেহেতু আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে একের ওপর অন্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।"[২] (৪ ঃ ৩৪)

যখন এ কথাই সত্য বলে আমরা মেনে নিয়েছি তখন নারীর ব্যবহার, চালচলন, কথা ও

১। হাদিস সংগৃহীত মকসুদুল মোমেনিন বা স্ত্রী শিক্ষা—কৃত আলহাজ্ব গোলাম রহমান। পৃষ্ঠা ৩৮০।

২। কোরআন ঃ সূরা নেসা, আয়াত ৩৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চলার ভঙ্গিতে যে অসংখ্য দোষ থাকবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই এদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখতেই হবে। এদের সঙ্গে মিশেই ভবিষ্যৎ রচনা করতে হবে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে, সংসারে শান্তি আনতে হবে ও দাম্পত্য জীবন সুখের করে গড়তে হবে। হজরত নারী চরিত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে তাদের প্রতি যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি পুরুষদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে। একথা ভুললে চলবে না যে ওরা নির্বুদ্ধিশীলা হলেও পুরুষের অধীন। পুরুষ ছাড়া ওদের চলবার কোন পথ নেই।

তাই আহারে-বিহারে, হাসি-গল্পে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে পুরুষকে হতে হবে মহান, উদার, ক্ষমাশীল, দয়াশীল ও চিন্তাশীল। স্ত্রীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালানো যাবে না, একাকিও স্বার্থপরের মতো চলা যাবে না, সমান অংশে তুল্য ভাগ করেই এদেরও খাওয়াতে হবে, পরাতে হবে এবং ধৈর্য নিয়ে সংসার করতে হবে। এ কথা সত্য যে আপনাদের প্রতিভা ও সৃজনশক্তির মূল্য তারা দিতে পারবে না এবং বুঝবেও না। আপনারা বহির্জগতে বিরাট মনীষী, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী হলেও ওদের কাছে নিতান্তই নির্বোধ বলে আখ্যায়িত হবেন এটাও সত্য, তবুও আপনাদের মেনে নিতে হবে। এটাই হবে আপনার মহত্ত্ব ও গৌরব। প্রতিটি মহামনীষীর জীবন চরিত আলোচনা করলে আপনারা দেখতে পাবেন কত নিদারুণ ব্যথার মাঝে তাঁরা জীবন কাটিয়েছেন! স্ত্রীর কাছে সহানুভূতির পরিবর্তে পেয়েছেন ক্লেশ ও অকথ্য গালি। এ গালিই তাঁদের করেছে মহান। আর এই মহান ব্যক্তিদের জন্যই আমার নবী বলেছেন—

(১) "যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে মাফ কর তবে আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করিয়া বেহেশ্‌তে দিবেন।"[১]

(২) "যখন তুমি আহার কর তখন তাহাকে আহার করিতে এবং যখন বস্ত্র পরিধান কর তখন তাহাকে বস্ত্র পরিধান করিতে দিবে। তাহার মুখের ওপর আঘাত করিবে না বা তাহাকে গালাগালি দিবে না বা বিরক্ত হইয়া তাহাকে এক ঘরে ত্যাগ করিবে না।"[২]

(৩) "কোন মুসলিম তাহার স্ত্রীকে ঘৃণা করিবে না, যদিও সে দোষের জন্য তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তবে তাহার কোন গুণের জন্য তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে।"[৩]

দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ও প্রতিকার

অশান্তি কথাটা শুনলেই যেন শরীর শিউরে ওঠে। যেদিন থেকে হজরত আদম (আঃ) বেহেশ্‌ত হতে এ কণ্টকপূর্ণ পৃথিবীতে পদার্পণ করেছেন সেদিন থেকেই চলছে এক অশান্তি। এ অশান্তির বিরাম নেই, কারণ আজাজিল অভিশপ্ত হবার পর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এ সুযোগ দেওয়া হোক যেন তাঁর প্রিয় বান্দাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। আল্লাহপাক তার প্রার্থনা কবুলও করেছেন। পাক কোরআন এর সাক্ষী ঃ

"এবং নিশ্চয়ই বিচারদিবস পর্যন্ত তোমার উপর আমার অভিসম্পাত। সে বলিয়াছিল,

---

১। হাদিস—সংগৃহীত মকসুদুল মোমেনিন; কৃত পূর্বে বর্ণিত। পৃষ্ঠা, ৩৩৬।

২। আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা।

৩। মুসলিম ঃ

'হে আমার প্রতিপালক, তবে সমুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ প্রদান কর।' তিনি বলিয়াছিলেন—"নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তগণের অন্তর্গত। সুবিদিত দিবস পর্যন্ত।' সে বলিয়াছিল—'তোমার সম্মানের শপথ, নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকেই বিভ্রান্ত করিব কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত তোমার বিশুদ্ধ সেবকগণ ব্যতীত।" [সূরা সাদ, আয়াত ৭৮-৮০]

তাহলে দেখা যায় যে এ অশান্তি আজকের নয়, সৃষ্টির শুরু থেকেই চলছে। আর এ অশান্তি সৃষ্টির মহানায়ক আজাজিল শয়তান। তাই দেশে-দেশে, রাজায়-রাজায়, ভাইয়ে-ভাইয়ে, স্বামী-স্ত্রীতে দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগেই আছে। তবুও কি শান্তি নেই? সুখী পরিবার ও সুখী দাম্পত্য জীবন কি দেখা যায় না? ওপরে বর্ণিত কোরআনের শেষোক্ত বাণীটি 'তাহাদের অন্তর্গত বিশুদ্ধ সেবকগণ ব্যতীত' জ্ঞানীদের জন্য উপহার স্বরূপ। যাঁরা প্রকৃত ঈমানদার, ইহ-পরকালে বিশ্বাসী, তাঁরা জীবনের যে কোন স্তরেই শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। দাম্পত্য জীবনে অশান্তিকে মনে-প্রাণে তাঁরা ঘৃণা করেন।

দাম্পত্য জীবনের অশান্তির মূলে যে কয়েকটি কারণ আছে তার মধ্যে (১) অশিক্ষা (২) অধৈর্য (৩) যৌন-মিলনে গরমিল, (৪) পরিণত বয়সে বিবাহ না হওয়া, (৫) অবাধে মেলামেশা ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে আমরা অতিসংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করছি ও প্রতিকারের পথ দেখাতে চেষ্টা করছি।

(১) অশিক্ষা ঃ এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। কেননা অশিক্ষিত পুরুষ বা অশিক্ষিতা মেয়েদের নিয়ে কি বিপদ ঘটে, প্রতি পদে পদে কেমন লাঞ্ছনা ও অপমানিত হতে হয় তা প্রতিটি লোকই বুঝতে সক্ষম। অশিক্ষা ও অজ্ঞতা জীবনের জন্য আনে অভিশাপ। এ জন্যই রসুল (দঃ) বলেছেন—'প্রতিটি নর-নারীর জন্যই বিদ্যা শিক্ষা ফরজ।' দাম্পত্য জীবনের জন্য এ অশিক্ষা আরও ভয়াবহ। পুরুষ অশিক্ষিত হলে তার মধ্যে আসে পশু-প্রবৃত্তি। মান-অপমানের ভয় করে না। একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলেই স্ত্রীকে পশুর মতো প্রহার করতে থাকে অথবা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে তার মন ভেঙে দেয়। সঙ্গমের ক্রিয়া-কৌশল বোঝে না। নিজের ইচ্ছা পূরণ করতেই থাকে ব্যস্ত। তাদের ঔরসে যেসব ছেলে-মেয়ে জন্মে তারাও হয় পশু সম। বাবা-মার কথা মানে না। যত সব অপকর্ম করে বসে। এতে সংসারে নেমে আসে আরও অশান্তি। এর প্রতিক্রিয়া পড়ে নিরীহ নারীর ওপর। ফলে স্বামীর ওপর আসে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা। সংসারের মায়াজাল থেকে তখন হতে চায় বিচ্ছিন্ন। অশিক্ষিত স্বামী নিয়ে সুখের দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলেছে এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই কম। কেননা এরা হয় বুদ্ধিহীন, অধার্মিক, ঝগড়াটে, স্বার্থপর, হিংসুক, লোভী ও বদমেজাজি। এত সব disqualification বা বদ্‌গুণ নিয়ে কোন্ অশিক্ষিত পুরুষ তার স্ত্রীর মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে? অনেক পিতামাতা আপন শিক্ষিতা মেয়েকে ধনের লোভে অথবা পারিপার্শ্বিক চাপে একটা অশিক্ষিত ছেলের হাতে তুলে দেয়। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই মেয়েটির জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। মনের মিল হয় না। চাল-চলনেও হয় বিরাট অসামঞ্জস্য। সমঝোতার পরিবর্তে গড়ে ওঠে অসাম্য। এ অসাম্যের ভার মেয়েটির হৃদয় ভেঙে চুরমার করে দেয়। একটি অনাথ ও নিরাশ্রয় শিক্ষিত ছেলের হাতেও মেয়েকে সঁপে দেওয়া যায়; কিন্তু ধনী অশিক্ষিত ছেলের হাতে দেওয়া যায় না। বিয়ের পূর্বেই মেয়ের বাবাকে এ বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হয়; নইলে এ বিষম অশান্তির বোঝা তাকেও বইতে হয় সারা জীবনব্যাপী বিয়ে দিয়ে নিজের মেয়েকে নিজ ঘরে পালতে অথবা মেয়ের আশা ত্যাগ করে শুধু কাঁদতে হয়। এরূপ পিতামাতা অন্য দেশে না থাকলেও এদেশে কম নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অজানা, অচেনা একটি মেয়ের হৃদয় জয় করে আধিপত্য বিস্তার করা খুব সোজা কথা নয়। দুর্গম মরুভূমি পাড়ি দেওয়া যায়, বিশাল সাগরও অতিক্রম করা যায়, দুর্ভেদ্য জঙ্গলেও আধিপত্য বিস্তার করা যায়, হিমালয়ের শৃঙ্গেও আরোহণ করা যায়; কিন্তু জ্ঞান ছাড়া শক্তি ও সাহস দিয়ে নারীর মন জয় করা যায় না। এ জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। বিভিন্ন মনীষীর উক্তিও সেটাই প্রমাণ দেয়। জনৈক মার্কিন ডাক্তার তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানে তাই বলেছেন, "The men and women are suffering today because directly or indirectly they have been unjust by dealt with wrongfully educated or educated at all along sex line."[১]

অজ্ঞতা, অশিক্ষা, মূর্খতা শুধু স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনেই নয়, দেশ, জাতি ও ধর্মের জন্যও কলঙ্কস্বরূপ। আল্লাহপাকও এদের পছন্দ করেন না। হজরতের বানীও এ কথারই প্রমাণ দেয়। তিনি বলেছেন—"জ্ঞানীর নিদ্রা একজন মূর্খের সারা রাত্রি এবাদতের চেয়েও উত্তম।"[২]

দাম্পত্য জীবনে অশান্তির জন্য শুধু পুরুষই যে দায়ী তা নয়, অশিক্ষিতা মেয়েরাও এর মূলে। তারা স্বামীর মর্যাদা বুঝে না। কোন্ সময় কি ধরনের ব্যবহার করতে হবে, কোন্ মধুর কথায় স্বামী খুশি হবে, কি আপ্যায়নে তার হৃদয় গলবে, এ জ্ঞান স্ত্রীর না থাকলে দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে না। স্বামী-ধ্যান, স্বামী-জ্ঞান, স্বামীই সর্বস্ব একথা মনেপ্রাণেই বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু সমাজের মেয়েদের এ উপলব্ধি নেই। তারা চায় স্বামীকে ঘরমুখী করে রাখতে, তার একান্ত সেবক ও দাস করে রাখতে। স্বামীর শিক্ষা ও পদমর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন খুব কম নারীরাই করে থাকে। স্বামী যখন তার আত্মসম্মানে আঘাত পায় তখন স্ত্রীকে কিছুতেই প্রাণের সুখে ভালবাসতে পারে না।

যারা শিক্ষিত, সম্মানকে বোঝে না, তারা স্ত্রীর অকথ্য ভাষা, কলহ, অন্যায় আব্দার অশোভন ব্যবহার দেখে গা রক্ষা করতে দূরে সরে থাকবার চেষ্টা করে অথবা বিষ খেয়ে বিষ হজম করে—শক্তি, সাহস, বল-ভরসা ও প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। কত হাজার হাজার জীবনের যে এজন্য অকালবার্ধক্য আসে এবং মৃত্যুর কোলে তাদের ঠেলে দেয় তার হিসাব কে দেবে। এ অশান্তির জন্য দায়ী নারী, অশিক্ষিতা ও আত্মাভিমানী মূর্খ নারী।

(২) অধৈর্য ঃ দাম্পত্য জীবনের অশান্তির মূল কারণের মধ্যে অধৈর্য অন্যতম। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনই যে অশিক্ষিত হবে, জ্ঞানী গুণী হবে, দুজনই যে অমায়িক ও ভদ্র হবে এমন কোন কথা নয়। প্রায়ই দেখা যায় স্বামীর স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে স্ত্রীর কোন মিল নেই। এছাড়া বর্ণ ও আকৃতি ভেদেও থাকে পার্থক্য। সুন্দর স্বামীর স্ত্রী প্রায়ই কালো এবং কুৎসিত হয়। আবার অপরূপ সুন্দরী নারীর ভাগ্যে জোটে তরমুজের বিচির রং বিশিষ্ট রোগা এক তালপাতার সিপাই। লম্বা যুবকের স্ত্রী হয় বেটে আবার লম্বা নারীর স্বামী হয় বামুনপীর। একজন ডক্টরেটের কপালে জোটে ক্লাস থ্রি পড়া এক মহামান্যা যুবতী। আবার এম. এ. পাস করা বিদুষী এক নারীর গলার মালা হয় রিলিফে আই. এ. পাস করা এক চট্‌পটে বাবরিওয়ালা সৌখিন ভদ্র লোক। ধার্মিক নারীর সাথী হয় ব্যভিচারী, আর ব্যভিচারিণীর পতি হয় সমাজহিতৈষী—এক মহামান্য ইমানদার। তেলে এবং জলে যেমন ক্ষণস্থায়ী মিশ্রণ হয়,

---

১। সংগৃহীত, পিপাসা পত্রিকা—৪র্থ সংখ্যা, জুন ১৯৬৮।

২। হাদিসের আলো, ১ম খণ্ড। কৃত আজহারউদ্দিন, এম. এ.।

এদের দাম্পত্য জীবনেও তেমন মিলন ঘটে। জানি না অন্য দেশের অবস্থা। তবে বাংলার অশিক্ষিত সমাজে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই, এদের উপায় কি?

বাম-মা পয়সার লোভেই হোক অথবা সমাজের চাপের ফলেই হোক যখন এমন কাণ্ড ঘটিয়ে পিছুটান দেয় তখন এ দম্পতি কি একসঙ্গে গলায় কলসি ঝুলিয়ে পানিতে ডুবে মরবে, না অনাবিল দুঃখ-কষ্ট নিয়েও সংসার করবে? কালো স্বামী নিয়ে কি কোন সুন্দরী মেয়ে সুখের সংসার করছে না? অসুন্দরী স্ত্রী নিয়েও কি কোন সুশ্রী স্বামী সুখের দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছে না?

মানুষ সব দিকে সুখী হয় না। একটা না একটা অভাব লেগেই থাকে। যার ধন আছে তার জন নেই। যার জন আছে তার ধন নেই। গুণ থাকলে রূপ থাকে না। রূপ থাকলে আবার গুণ থাকে না। দুটি সুখও একত্রিত হয় না। দুটি দুঃখও এক পাশে থাকে না। সুখের পাশেই দুঃখ থাকে। দুঃখের সঙ্গেই আবার সুখ থাকে। ব্যভিচারী, বদমেজাজি, অশিক্ষিত সুন্দর স্বামী নিয়ে জীবন কাটানোই সুখের, না ধার্মিক, বলিষ্ঠবান, শিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন কালো স্বামী নিয়ে জীবন কাটানোই সুখের? বন্ধ্যা, সুন্দরী নারীর চেয়ে কালো স্বাস্থ্যবতী গর্ভধারিণী নারীই কি ভাল নয়? গুণ না থাকলে রূপের মোহ বেশিদিন টিকে থাকে না। মাকাল ফলের রূপ আছে কিন্তু কৈ একটি পাখিও তো তার কাছে যায় না? কোকিলের রূপ নেই কিন্তু কেন দুনিয়ার জ্ঞানী-গুণী-কবি-সাহিত্যিক, নারী-পুরুষ সবাইকে সে পাগল করে তোলে? বহুদিন আগে আমি লিখেছিলাম—

'রূপে আমার আঁখি ভুলে
পরাণ ভুলে গুণে
হৃদয় ভরে ভালবাসায়
মধুর কথা শুনে।।" (লেখক)

আকাঙ্খিত স্ত্রী হলো না বলেই কি সংসার ছেড়ে পালাতে হবে? আপনার স্ত্রীর কি কোন গুণ নেই? খুঁজে দেখুন, রূপ ছাড়া হয়তো আর সব গুণই আছে। কিন্তু আপনার চোখে ধরা পড়ছে না। পড়ত যদি, দেখতেন যে আপনার বন্ধুর ঐ সুন্দরী স্ত্রীটি রান্না করতে জানে না, ঘর সংসার গোছাতে জানে না, হাসতে জানে না। তখন আপনিও প্রেমে পড়তে চাইতেন আপনার ঐ কালো স্ত্রীর গুণে। উদাহরণ দিলে শত শত তুলে ধরতে পারি এবং দেখাতে পারি যে পুরুষছেলেরা কি ভাবে সুন্দরী স্ত্রী ঘরে রেখে অসুন্দরী নারীর পিছন পিছন ঘোরে। মেয়েদের বেলাতেও তাই। এরা ধনী বুঝে না, অভিজাত বুঝে না, সুন্দর ও শিক্ষিত বুঝে না। এরা বুঝে প্রেম। চায় পুরুষের শক্তি, সাহস, বল-বীর্য আর ফাঁকি আশা।

তাই সুন্দর শিক্ষিত স্বামী রেখে আঁধার রাতে পালিয়ে যায় ঐ কালো দুর্বৃত্তের হাত ধরে এক শূন্য আশার ভরসায়। যদি এটাই হয় সমাজের চিত্র, তবে আপনার মনোমতো স্ত্রী বা স্বামী হয় নি বলে দুঃখ করার কি আছে? ধৈর্য ধরে সংসার করতে থাকুন। সুখ পাবেনই। অধৈর্য হলে আপনার জীবনটাও ব্যর্থ হবে—যাকে বিয়ে করলেন তার জীবনও ব্যর্থ হবে। অনাগত ভবিষ্যতে আপনার ছেলে-মেয়েদের জীবনও হবে অসুখের। আপনার বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের মুখে পড়বে কালি। অধৈর্য জীবনে আনে অধঃপতন; মনকে করে অস্থির; সংসারকে করে ছারখার আর দাম্পত্য জীবনে আনে চরম বিপর্যয়। অধৈর্য হয়ে যদি একজন আর একজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, চলার পথে বিঘ্ন ঘটায়, মনের কোণে আগুন লাগিয়ে দেয় তাহলে সে আগুন আর নেভে না। ধিকি ধিকি হলেও একদিন না একদিন পুড়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেহটাকে ছাই করে দেয়। এ আগুন কেউ দেখতে পায় না, নেভাতেও পারে না। আমার একটা গানের মাঝেও এ কথাই বলেছিলাম—

"ফাগুন বনে লাগলে আগুন
সবাই দেখতে পায়,
মনের বনে ধরলে আগুন
নিভান কঠিন দায়।" (লেখক)

তাই সাবধান থাকতে হবে, কোন কারণবশতই যেন কারো মনে আগুনের সামান্য একটু স্ফুলিঙ্গও না পড়ে।

অনেক সময় দেখা যায় সামান্য কারণ নিয়েই দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। হাসি-রহস্যের মাঝেই মনে দারুণ আঘাত লাগে। এগুলো স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। তবুও সতর্ক থাকতে হবে যেন অসতর্কতার মাঝেও কারো মনে কোন কঠিন আঘাত না আসে। আর এলে তখনি তা পরিষ্কার করে নিতে হবে। মনের কোণে জট্‌লা পাকাতে থাকলে ধীরে ধীরে তা আরও বিকৃত রূপ নেবে। মন একবার ভাঙলে তা কিন্তু কাঁচের ফলকের মত জোড়া লাগে না।

এ সংসার বড় জটিল। ভুল হবেই, আঘাত লাগবেই, অভাব ঘিরে ধরবেই। তাই বলে মুষড়ে পড়লে চলবে না। অধৈর্য হলে সমাধান পাবেন না। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর জীবনের মিল হতে বেশি দেরি হয়। একজনকে চিনতে বেশ সময় লাগে। নানাদিক থেকে নানাপ্রকার কুৎসার কথা আপনার কান ঝালাপালা করে তুলবে। স্বামীকে বলবে ঐ মেয়ের চরিত্র খারাপ, বংশ খারাপ, রূপ নেই, গুণ নেই, তোমার সঙ্গে মানায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। এদিকে আবার অবুঝ গোলাপ কলির মতো পবিত্র মেয়েটির মনে নব-বিবাহিত স্বামীর সম্বন্ধে এমন সব কুৎসিত কথা বলবে যা শুনে মেয়েটি অতি সহজেই বিশ্বাস করবে। কতটুকুইবা এদের বিচারশক্তি। জীবনের শুরুতেই মনে মনে লাগে দ্বন্দ্ব। অধৈর্য হলে এখান থেকেই শুরু হয় দাম্পত্য জীবনের অশান্তি। আর দুজনে ধৈর্য ধরে কুৎসার কারণ বের করে এর শেকড় টেনে তুলে ফেললে আর কোনদিন তা মাথাচাড়া দেবে না।

দাম্পত্য জীবনে যে অশান্তি নেমে আসে তার কিভাবে সমাধান করা যায় বিভিন্ন যৌনবিজ্ঞানী তার ওপর যথেষ্ট বই পুস্তক লিখেছেন। আমাদের দেশেও এমন বইয়ের অভাব নেই। কিন্তু নারীর লিখিত 'নারী ও মন', 'দাম্পত্য জীবনের সমস্যা ও সমাধান'—এ ধরনের বই মেলে না। একজন মাত্র লেখিকা দেখলাম মিসেস নাদিরা বারি, বি. এ. বি. টি.—যিনি প্রাণ দিয়ে লিখেছেন। সমাজের কলুষচিত্র তাঁর চোখের সম্মুখে অহরহ ভাসত। হাজার হাজার দম্পতির করুণ ইতিহাস দেখে তিনি হয়তো সহ্য করতে পারেন নি। তাই কলম ধরেছিলেন দরদ নিয়ে—পঙ্কিল সলিল থেকে এ সব দম্পতিকে টেনে তুলতে। আজও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তবু তাঁকে অন্তর থেকে ভক্তি করি। তাঁর প্রতি অফুরন্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাঁর বাস্তব দৃষ্টি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে 'পুরুষ চরিত্র' লিখতে যার উদ্ধৃত প্রসঙ্গসহ পূর্বে দিয়েছি। এখানে তাঁর লেখা 'দাম্পত্য জীবনের সমস্যা ও সমাধান'[১] হতে কিছু অংশ তুলে ধরছি। দেখুন কত সুন্দর চিত্র, কত সুন্দর তার সমাধান। তিনি লিখেছেন—

১। সংগৃহীত মাসিক পিপাসা, ঈদ সংখ্যা, ১৩৭৩।

"এবার আমি মেয়েদের সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করব। মনে করুন, আপনি স্ত্রী, বিবাহিতা। আপনার স্বামী হয়তো অন্য একটা মেয়েকে ভালবাসেন অথবা চরিত্রহীন। গণিকালয়ে গিয়ে মদ খায়, বায়ুকামগ্রস্ত। এখন আপনি শিক্ষিতা ভার্যা তার। আপনি কি করবেন এর জন্য? নীরবে চোখের জল ফেলবেন? না চিৎকার করে পাড়া মাথায় করবেন? না বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকবেন? না তাদেরকে বলে স্বামীকে শাসন করবেন? না আইন আছে, স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীকে ডিভোর্স করতে পারেন, আপনি তাই করবেন? এতক্ষণ অন্ধকারে ছিলেন, এবার আইনের প্রদর্শিত পথ দেখে আশার আলোক দেখছেন হয়তো। কিন্তু না, আইনের পথে পদার্পণ করলে নারীত্বের কাছে আপনি অপমানিত হবেন। আপনার নারীত্ব কি এত ব্যর্থ যে স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না? এই সংকীর্ণ নারীত্ববোধ নিয়ে আপনার কোন পুরুষের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া ঠিক হয় নি। নারী হয়ে যখন জন্ম নিয়েছেন, আপনি নারীত্বের অপমান হতে দেবেন কেন? কোর্ট-কাছারি মুক্তির পথ নয়। ওখানে গেলে আপনার নারীত্বের কি চরম অপমান হবে না? চরম অক্ষমতা প্রকাশ পাবে না? কোর্ট-কাছারিতে গিয়ে কি আপনার গোপন ইজ্জতের কাহিনী ব্যক্ত করতে হবে না? হাজার হাজার শ্রোতা উৎসুক ভরে আপনার ব্যর্থ ইজ্জতের কাহিনী শুনবে না? খবরের কাগজ ওয়ালারা আপনার ইজ্জতের কাহিনী ফলাও করে প্রচার করবেন না? জগৎ সে কাহিনী পড়ে আপনাকে ধন্যবাদ দেবে কি? জগৎ জানবে, আপনার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, তাদের সামাজিক আত্ম-মর্যাদা কি এর জন্য ক্ষুণ্ন হবে না? তাতে আপনার নারীত্বের দাম কমবে, না বাড়বে, বলুন তো! আপনার একার জীবন ও যৌবনের জন্য জগতের সবার মান, সম্মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি খোয়াবেন—এটা তো হতে পারে না। এই করবেন বলেই কি আপনাকে বাপ-মা লালন-পালন করেছেন? মানুষ করেছেন? লেখাপড়া শিখিয়েছেন? বি. এ, এম. এ. পাস করিয়েছেন? না, কখনই হতে পারে না—তাহলে আপনি কি করবেন?

"হ্যাঁ, আপনি ধীর-স্থির ভাবে নিজের কর্তব্য ও করণীয় কি চিন্তা করবেন। কি করে আপনি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন তা বার বার করে চিন্তা করতে হবে। তারপর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে সেইমতো কাজে অগ্রসর হবেন। এটা দাম্পত্য জীবনের সমস্যা। এখানে পিতা-মাতা, ভাই-বোন কেউ আসবে না সমাধান করতে। এর সমাধান আপনাকেই করতে হবে। বাবার বাড়িতে আপনি এসব কোনদিনই কল্পনা করতে পারেন নি। স্বামীর বাড়িতে এসে দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন কি? না, আশ্চর্য আপনার হতে হবে না। পুরুষের পক্ষে যত অপকর্ম আছে ধরুন তা তারা করবে, সেই অপকর্মকারী পুরুষকে নিয়ে ঘর করতে হবে। দাম্পত্য জীবন সুখের করতে চেষ্টা করতে হবে। আপনি নারী, এইভাবে আপনার তৈরি হতে হবে। সরাসরি আপনি পুরুষের কোন কর্মে বাধা দেবেন না। তাহলে বিপরীত ঘটবে।

"সাইকোলজিতে বলে—নারীকে উৎপীড়ন করেই পুরুষ পরিতৃপ্ত হয় আর নারী সেই পীড়ন খেয়েই নিজকে সমাহিত, কৃতার্থ ও ধন্যা মনে করেন। নারীর বাধায় পুরুষের মনে আরও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। তারা ঐ বাধা দেওয়া কর্ম সম্পাদন করবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। পুরুষ যদি নারীর প্রতি প্রভুত্ব করতে না পারল তবে তার পৌরুষ মিথ্যা। এই মিথ্যা পৌরুষ নিয়ে জগতে অনেক পুরুষ স্ত্রৈণ হতে পারে কিন্তু তাই বলে সবাই তো আর স্ত্রৈণ হয় না। পুরুষ উত্তাল, বাধা পড়লে তাদের গতি উচ্ছ্বসিত ও প্রবলতর হয়। তাদের বাধা দিতে হলে চালাকির আশ্রয় নিতে হয়। যেন সরাসরি তারা বাধা দেওয়া বুঝতে না পারে।

"মনে করুন আপনার স্বামী প্রতিদিনই অফিস হতে দেরি করে আসেন। এই দেরির কারণ কি তা হয়তো জানেন না। ধরুন হয়তো অফিস শেষে কোথাও আড্ডা দেন নতুবা অন্য যে কোন কারণে হোক তিনি সময় মতো অফিস শেষে বাসায় আসেন না। আপনার কাছে শেষ পর্যন্ত সেটা খারাপ লাগে। কেননা পুরুষকে চিরদিন ঘরমুখো করে রাখা নারীমনের চির আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা আপনার সফল হচ্ছে না। তার জন্য মনে মনে যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

অসন্তুষ্ট হন, তাহলে কিন্তু ভুল করবেন। নীরবে আপনার পথ পরিষ্কার করতে হবে এবং সেটা কিছুটা বুদ্ধির আশ্রয় নিয়েই করতে হবে। প্রতিদিন যখন এমনই করছেন তিনি, তখন আপনি কি করবেন? দরকার তো তাকে সময়মতো বাসায় আনা। ধরুন শেষে বিকালে বাসায় এসেছেন। আপনি তাকে আদর করে নিয়ে বসালেন। হাত-মুখ ধোয়ার পানি দিলেন; বাতাস করলেন। যদি Electric fan থাকে তা ছেড়ে দেবেন। তার পোশাক ছাড়িয়ে নিলেন বা নিতে সাহায্য করলেন। বাথরুম থাকলে তোয়ালে সাবান এনে দিলেন। কিন্তু এটা আপনার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম হলো। এটা সেবা, এগুলো আপনি চাকর বা চাকরানী মারফত করতে যাবেন না। তাতে প্রেম ঘনীভূত হয় না। তারপর গেলেন তার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। এদিকে চা-নাস্তা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চাকর বা চাকরানীকে বলে দিলেন—সাহেবকে বলগে জলখাবার নিয়ে আসব কি? মা সমস্ত বিকেল ধরে চা খায় নি আপনার খাওয়া হয় নি বলে। কতবার করে আমরা বললাম কিন্তু তিনি কিছুতেই খেলেন না। বললেন, সাহেব আসুক তারপর একসঙ্গে খাব। বাস, চাকর বা চাকরাণী দিয়ে যদি আপনার এই কথাটা স্বামীর কানে পৌঁছাতে পারেন, তবে দেখবেন, তিনি যদি আপনাকে শতাংশের একাংশও ভালবাসেন, তবুও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আপনাকে ডাকবেন, কেন চা খান নি তার জন্য বলবেন। আপনি শুধু রাগ প্রকাশ করে বলবেন। নিশ্চয়ই এ অমুক বলেছে—আমি দেখছি ....। যাবার জন্য পা বাড়াবেন—স্বামী আপনাকে ধরে টানবেন। তারপর আব্দার করবেন, কেন চা নাস্তা কর নি। আপনি স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে শুধু বলবেন, স্বামীকে না খাইয়ে মেয়েদের খেতে নেই। এ কথা শোনার পর কোন পুরুষ কি আর দেরি করে বাসায় আসতে পারে? দেখবেন এ ওষুধেই আপনার কাজ হয়েছে। এরপর থেকে প্রতিদিন সময়মতো বাসায় তিনি আসবেন। কোন কারণে না এলেও ছট্‌ফট্ করবেন। এরপর থেকে কিন্তু আপনার আসন স্বামীর হৃদয়ে অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আপনার ভালবাসা ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে স্বামীর মনে আর কোনও সংশয় রইল না। ঠিক এমনি করে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে সংসার জীবন তথা দাম্পত্য জীবনকে মধুর করতে প্রয়াসী হবেন। দেখবেন পৃথিবীতে অজস্র সুখ আছে।

"এখন আসুন আপনার দাম্পত্য জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে দাম্পত্য জীবনটা কি, কখন থেকে এর আরম্ভ, কি এর উদ্দেশ্য, কেমন করেই বা এর সমস্যা উৎপন্ন হয়, আর কি এর প্রতিবিধান ও প্রতিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে আপনার পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। মনে রাখবেন—রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে যেমন ডাক্তারি চলে না, আবার ওষুধ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে রোগের ঔষধ নির্ধারণ করা চলে না। আপনি স্ত্রী, আপনিই আপনার দাম্পত্য জীবনের ডাক্তার। আপনি রোগ ও তার উৎপত্তি ও তার কারণ এবং এর প্রতিবিধান ও প্রতিষেধক ওষুধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু বিজ্ঞান রোগের মতো সত্যিকারের দাম্পত্য জীবনের এই সকল সমস্যারূপ রোগগুলির কোন ওষুধ সৃষ্টি করে নি, এর ওষুধ আপনার মস্তিষ্কপ্রসূত। প্রখর বুদ্ধি ও বিবেচনার ব্যবহার ও প্রয়োগ মাত্র। আপনি যদি উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধির কৌশলগুলো প্রয়োগ করেন, দেখবেন ক্রমান্বয়ে সে সৎভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হচ্ছে। শুধু একটা কথা—ধৈর্য হারাবেন না আর একগুয়েমি বা জেদী হবেন না। কেননা, নারী চরিত্রে এ দুটি লক্ষণ যে কত বড় খারাপ, সে কথা ঘটনাস্থলে গিয়ে বলব। এখন ক্রমান্বয়ে আমরা আলোচনার পরে আলোচনা করে এগিয়ে চলি। স্ত্রী হোন আর পুরুষ হোন দাম্পত্য জীবন সম্বন্দে যদি আপনাদের পূর্ণ খুঁটিনাটি জ্ঞান না থাকে তবে এর সমস্যার সমাধান করা চলে না। ....।"

দাম্পত্য জীবনের সমস্যা ও সমাধানের বেশ সুন্দর পথ আমরা দেখলাম মিসেস নাদিরা বারীর লেখা হতে। এবার এগিয়ে চলুন আমরা অন্যান্য সমস্যাগুলো দেখি।

(৩) যৌনমিলনে গরমিল ঃ যে সমস্ত কারণের ফলে দাম্পত্য জীবনে ঘোর দুর্দিন নেমে আসে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ যৌনমিলনে গরমিল। স্বামী যদি অত্যন্ত কামুক হয় আর স্ত্রীর কাম-বাসনা না জাগে অথবা স্ত্রীর কামভাব প্রবল কিন্তু স্বামী দুর্বল হয় তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই মনে অশান্তি ধরে যায়। এমনও হতে পারে যে স্বামীর যৌনাঙ্গ স্ত্রীর যৌনাঙ্গের সঙ্গে খাপ খায় না, হয় বড় না হয় ছোট। এরূপ ক্ষেত্রেও দু'জনের মধ্যে গরমিল দেখা দেয়। স্ত্রীর লজ্জা, জড়তা স্বামীকে আনন্দ দান করে না; কাম-রসের আধিক্য না হওয়ায় স্ত্রীর প্রাণে ভীতি আসে, পুরুষের বীর্যস্খলন স্ত্রীর পূর্বে ঘটে, স্ত্রীর আনন্দ নষ্ট হওয়া প্রভৃতি কারণে দু'জনের মধ্যেও কলহ সৃষ্টি হয়। দুশ্চরিত্র স্বামীর যৌন-কদাচার নিরীহ সতী নারীর পছন্দ না হওয়া অথবা স্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী স্বামী সম্ভোগ না ঘটাও অশান্তির কারণসমূহের অন্যতম। অসামঞ্জস্য যৌনাঙ্গের কারণে যদি গরমিল সৃষ্টি হয় তবে এর প্রতিকার কঠিন তবুও ধৈর্যসহকারে স্বামী-স্ত্রী কৌশল অবলম্বন করলে, যৌন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিভিন্ন আসন পরামর্শ করে বিভিন্ন আসন পদ্ধতির ব্যবস্থা করলে অনেকটা সমাধান হয়। প্রধান কথা স্বামী-স্ত্রীর আত্মার মিল। দু'জনেই যদি সহনশীল হয়, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের মায়া ও ভালবাসা থাকে তবে দুরহ ও অসম্ভব বলে কোন কিছু থাকে না। উভয়ের যৌনবিদ্যার জ্ঞান প্রতিকারের প্রকৃষ্টতম পন্থা। এছাড়া প্রয়োজনবোধে ওষুধপত্র ব্যবহারের দরকার। পুরুষের ধ্বজভঙ্গ, শিথিলতা, ধাতুদৌর্বল্য ও মানসিক দুর্বলতাই যৌন-অক্ষমতার কারণ। এ সব ব্যাধিতে যদি কেউ আক্রান্ত হয় তবে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও কবিরাজের পরামর্শ একান্ত দরকার। নিচে কয়েকটি ওষুধের ব্যবস্থা তাদের জন্য দেওয়া হলো ঃ

(১) ১ ভাগ অশ্বগন্ধ্যা; ১ ভাগ শিমুল মূল; ১ ভাগ তালমূলি ও ১ ভাগ ভূই কুমরা চূর্ণ—প্রতিটি দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করে প্রতিদিন সকালবেলা আধ তোলা মাত্রায় গাওয়া ঘি, দুধ, মিছরি চূর্ণ অথবা মধুর সঙ্গে সেবন করলে যে উপকার হয়—যে কোন বাজীকরণ ঔষধে সে ফল পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এটি ইন্দ্রিয় শিথিলতা, ধাতুদৌর্বল্য ও দুর্বলতার মহৌষধ।

(খ) ইন্দ্রিয় দৌর্বল্যে ঃ যাদের পুরুষাঙ্গ শিথিল, উত্থানশক্তি নেই অথবা সামান্য উত্তেজিত হয়ে নরম হয়ে যায়, তাদের জন্য নিচের ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রসূ—আলকুশীর বীজ চূর্ণ (খোসা ছাড়িয়ে) ও মাষকলাই চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করে প্রতিদিন সকালে সেবন করলে যতই দুরারোগ্য রোগ হোক না কেন শীঘ্র আরোগ্য হবেই। আলকুশীর বীজ চূর্ণের হালুয়া প্রস্তুত করে প্রতিদিন কিছু কিছু ব্যবহার করলেও ঐরূপ ফল পাওয়া যায় এবং শুক্র গাঢ় হয়।

(গ) দুগ্ধসহ কাঠাল কয়েকদিন খেতে পারলে অত্যন্ত বল ও শুক্র বৃদ্ধি হয়। কাঠালের বিচিও খুব শক্তিশালী ও শুক্রবর্ধক।

(ঘ) ধাতুদৌর্বল্যে, স্বপ্নদোষ রোগ জন্মালে কুড়চীর বীজ চূর্ণ এক আনা মাত্রায় ঠাণ্ডা পানিসহ সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

(ঙ) বটের ডালের শেষ কলিটুকু ভাঙলে যে আঠা বের হয় তার ৮/১০ ফোটা অন্তত ১৫ দিন বাতাসার মধ্যে বা চিনিতে মিশেয়ে সেবন করলে ধাতুদৌর্বল্য রোগ আরোগ্য হয় ও আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়।

(চ) ভূঁই কুমড়া চূর্ণ চারি মাত্রায় কিছুদিন ঘি, মধু বা চিনিসহ বিকালে সেবন করলে বল-বীর্য বৃদ্ধি হয়। ভূঁই কুমড়া চূর্ণ প্রস্তুতের নিয়ম হলো এই যে এটা উত্তমরূপে চূর্ণ করে ছায়ায় শুকাতে হয়। এরপর কাঁচা ভূঁই কুমড়ার রস পুনরায় মাখিয়ে ছায়ায় শুষ্ক করতে হবে। এরূপ সাতবার রস মিশিয়ে শুকনো করলেই ভূঁই কুমড়া চূর্ণ প্রস্তুত হয়।

(ছ) ধাতুদৌর্বল্যে শতমূলী বিশেষ উপকারী। শতমূলী চূর্ণ দুই হতে চার আনা পরিমাণ কিছুদিন গাইয়ের দুধ, ঘি ও চিনিসহ খেলে ধাতুদৌর্বল্য থাকে না। এর আর একটি বিশেষ ফলপ্রসূ ওষুধ এই—

pdf By Syed Mostafa Sakib

(জ) অফুলা শিমুল গাছের মূল শুকনো করে এক তোলা দুধ চিনি ও ঘি সহযোগে প্রতিদিন সকালে সেবন করলে ধাতু গাঢ় হয় এবং বল বৃদ্ধি হয়। উক্ত শিমুল মূল গাইয়ের কাঁচা দুধ দিয়ে পেষণ করে খেলেও উপকার হয়।

ছেলেদের নিয়মিত মধু সেবন করতে আমি অনুরোধ জানাই। আমার নিজের জীবনে ছোট বেলা হতেই একমাত্র নেশা ছিল মধু সেবন। আজও তা করে থাকি। শুধু ধাতুদৌর্বল্যেই নয়, সমস্ত রোগ নিরাময়কারী এ মধু। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও নিয়মিত মধু সেবনে অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি হালুয়া খেতে খুব ভালবাসতেন। নিচে বর্ণিত হাদিসসমূহ এটা প্রমাণ করে।

'হজরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হালুয়া ও মধু ভালবাসতেন।"[১]

ইমাম গজ্জালী (রাঃ) তাঁর জীবন চরিত আলোচনায় লিখেছেন—

'খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে তিনি মধু ও মাংস বেশি পছন্দ করতেন।"[২]

"রসুলুল্লাহ (দঃ) একবার কামভাবে দুর্বলতা অনুভব করেন। তাঁর জীবন চরিত পাঠ করে আমি আর একটি জিনিস দেখতে পাই। এমন অবস্থায় হজরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে **'হারিস'** খেতে বলেন।"[১] (গারায়েবুল আখবার)

এবার মেয়েদের জন্য দু-একটি ব্যবস্থা নিচে দেওয়া হলো ঃ

মেয়েদের যৌন-দুর্বলতার প্রধান কারণ শারীরিক দুর্বলতা। এটা বাঙালী মেয়ে মাত্রেই দেখা যায়। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই এর মূল কারণ। শরীরে যখন ভিটামিনের অভাব হয় তখন মানসিক দুর্বলতা, শারীরিক শক্তির অভাব দেখা দেয়। তাই যৌন-তৃষ্ণা অন্তরে জাগে না। স্বামীর সঙ্গে সহবাস করার কথা শুনলেই মেজাজ খারাপ হয়ে ওঠে অথবা ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে। শক্তিশালী পুরুষ হলে তার ভয়ে স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে বাপের বাড়ি যায়। এর প্রতিকারের সহজ উপায় থাকা সত্ত্বেও কেউ প্রতিপালন করতে পারে না। কেননা অধিকাংশ পরিবারই গরিব। স্বামীর পক্ষেও সম্ভব নয় যে সামান্য চাকরি করে অথবা প্লাটফরমে দোকান দিয়ে তার স্ত্রীকে রোজ নিয়মিত ছানা, মাখন, ঘি, দুধ, গোশ্‌ত, ডিম, প্রচুর মাছ ও তরকারি খেতে দেয়। তাই নির্জীব স্ত্রী দিনে দিনে আরও নির্জীব হয়ে পড়ে। বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই অথবা দু'একটা ছেলেমেয়ে হবার পর থেকেই শুরু হয় শ্বেত প্রদর যা শরীরের বল বৃদ্ধি, ক্লান্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলে। বড় ডাক্তার কবিরাজের কাছে যাবার যাদের সামর্থ্য নেই তাদের জন্য এ সহজ পদ্ধতির চিকিৎসা ফলপ্রদ।

(ক) শ্বেত প্রদর রোগে ঃ শুষ্ক আমলকীর বীজ দুই আনা মাত্রায় পানিসহ পেষণ পূর্বক প্রয়োজনমতো কাশীর চিনি মিশিয়ে সেবন করলে এক সপ্তাহের মধ্যেই শ্বেত প্রদর বন্ধ হয়।

(খ) হরিদ্রাবর্ণ প্রদর রোগে ঃ শুষ্ক আমলকী ভেজানো পানি এক ছটাক মিছরি ভেজান পানিসহ কিছুদিন সেবন করলে প্রদর ও যোনীদাহরোগ আরোগ্য হয়।

(গ) শ্বেতরক্ত ও নীলদি সকল প্রকার প্রদর রোগে ঃ অশোকের ক্বাথ, অশোক দুগ্ধ বা অশোক ক্ষীর-এর যে কোন একটি ব্যবস্থা করলে রোগ আরোগ্য হয়। তবে নিয়মিত অন্তত তিন সপ্তাহ ব্যবহার করা উচিত। অশোক ক্বাথ দ্বারা যোনী ধৌত করলে যাবতীয় যৌন-রোগ যেমন প্রদর, ব্যথা, ফুলে যাওয়া, ঘা ইত্যাদি আরোগ্য হয়। প্রায় মেয়েরই এ রোগ দেখা যায়। তাই এ ব্যবস্থা মেয়েদের জেনে রাখা একান্ত দরকার।

এসব আমার লিখবার বিষয়বস্তু নয়। তবু লিখলাম এ উদ্দেশ্যে যে তরুণ-তরুণী ভাই-বোনেরা যারা শারীরিক অসুস্থতা হেতু সুখের দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলতে পারছেন না,

---

১। বুখারী। সংগৃহীত হাদিসের আলো, কৃত পূর্বে বর্ণিত। ২য় খণ্ড, পানভোজন পরিচ্ছেদ।

২। সৌভাগ্যের পরশমণি—তর্জমা আবদুল খালেক। বিনাশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৯।

তাদের এ ব্যবস্থায় যদি কিছুটা উপকার হয় এবং সুখে স্বামী-স্ত্রী জীবন কাটাতে পারেন তাহলে নিজ আত্মার কাছে পরম শান্তি পাব।

(৪) পরিণত বয়সে বিবাহ না হওয়া ঃ ছেলে-মেয়ের পরিণত বয়স কি এর সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। কেননা অবস্থাভেদে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ওপর ছেলে-মেয়েদের শরীরে যৌন-চেতনা আসে। শীতপ্রধান দেশের ছেলে-মেয়েরা যে বয়সে খেলাধূলা করে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সে সময়ে তারা ছেলে-মেয়ের বাবা-মা হয়। যাই হোক, আমাদের কথাই বলছি। ছেলেদের চরম যৌবন ও উত্তেজনার কাল সাধারণত কুড়ি হতে পঁচিশ বছর। আর মেয়েদের ষোল হতে কুড়ি বছর। এই সময়ের মধ্যে তাদের শরীরে যে জোয়ার আসে তা কোন কবি, সাহিত্যিকই তার ভাষায় বুঝাতে পারবে না। এ জোয়ার হলো আষাঢ়ের পাগলা জোয়ার। সম্মুখে যা পায় ভেঙেচুরে চুরমার করে রেখে যায়। জ্ঞান থাকে না। ধর্ম থাকে না। থাকে শুধু উচ্ছ্বসিত বেগে প্রবাহিত হবার দুর্বার গতি। এ গতির মুখে বাঁধ দিলে তা থাকে না। ছেলে-মেয়েদের জীবনেও ঠিক তাই ঘটে।

ছেলেরা বি. এ., এম. এ. পাস করার পর চাকরির নেশায় থাকে। চাকরি পাবার পর চিন্তা করে ঘর-বাড়ি করতে হবে, ভাইবোনকে মানুষ করতে হবে, বাবা-মাকে সন্তুষ্ট করতে হবে, তাই লজ্জা ও দায়িত্বের খাতিরে বিবাহ করে না। যারা লেখাপড়া করে না তারাও টাকা-পয়সা রোজগারে মন দেয়। অনেক সময় বাবা-মার ওপর ভরসা করে মুখ বুঁজে থাকে। কিন্তু অজ্ঞ বাবা-মা বুঝে না যে তার ছেলের যৌবনে ভাটা পড়ে এলো। স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হতে হতে যে ছেলের দেহ-মন নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে—এ কথা বুঝে না। যখন ভাটা পড়ে, যৌবনের উন্মাদনা থাকে না, তখনি হয়তো এক ষোড়শী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়। বয়সের হয় তারতম্য, যৌনতৃষ্ণায় হয় অসামঞ্জস্য আর মানসিক চিন্তায় বিরাট পার্থক্য। তাই যৌনজীবনে হয় অশান্তি। এটা হলো নিরীহ ও সৎ ছেলের ব্যাপার। যারা চঞ্চল, ধনী ঘরের ছেলে, ধর্মকর্মের পরোয়া করে না তারা কিন্তু দু-চার দশটা মেয়েকে উপভোগ করে বিভিন্ন স্বাদ জিহ্বায় নিয়ে নেয়। একটিতে তারা আর মনস্থির করতে চায় না। বাবা-মার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এসব দুরন্ত ছেলেদের বিয়েতে রাজি করাতে পারে না। শেষে নিতান্ত দায়ে পড়ে যখন বিয়ে করে তখন ঐ মেয়েকে আর পছন্দ করে না। যত সুন্দরী ও শিক্ষিতা স্ত্রী তার হোক না কেন—মন ভরে না, চোখ ভোলে না, দৌড়ায় ঐ কালো কুৎসিত ব্যভিচারিণী নারীর পেছনে। এদের দাম্পত্য জীবন অবাস্তব, আশাহীন, শৃঙ্খলাহীন, শান্তিহীন।

এবারে আবার মেয়েদের কথাও বলতে হয়। অনেক বাবা-মা ধনের অভাবে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারে না। যুবতী মেয়েকে বছরের পর বছর ঘরে রাখে। সতী মেয়েরা কাল কাটায় ঠিক কথা, কিন্তু দেহের সব কিছু উজাড় করে। আষাঢ়ের জোয়ার থেমে গেলে যেমন নদী শান্ত হয়, স্রোতের গতিবেগ ম্লান হয়ে যায়, তেমনি ভাইরাস গ্রন্থি যা থেকে রস নিঃসৃত হয় তা অকেজো হতে থাকে। লোহা মাটিতে ফেলে রাখলে যেমন মরিচাপ্রাপ্ত হয় এবং কাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয় তেমন অবিবাহিতা মেয়েদের পরিণত বয়সে বিয়ে না দিলে মরিচাপ্রাপ্ত লোহার মতোই অকেজো হয়। প্রতিটি ঋতুস্রাবের পরে মেয়েদের যে যৌন-তৃষ্ণা জাগে তার উপশম সঙ্গমে না হলে জরায়ু দুর্বল হয়ে যায়। বাবা-মাকে এ পরিণতির জন্য জবাব দিতে হবে। ঋতুস্রাবের পর সঙ্গমে সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু স্বামীর অভাবে সে সন্তানের আগমন হয় না। তাই বিবাহ না দেওয়ার জন্য পিতা-মাতার পাপ হতে থাকে—মনীষীরা এ কথাই বলেন। কেননা যারা সতী মেয়ে, ধৈর্য ধরে থাকে, তাদের অসীম জ্বালা বুকে নিয়ে দিন কাটাতে হয়। আল্লাহর কাছে তারা মনে-প্রাণেই ফরিয়াদ জানায়। আর যারা ধৈর্য রাখতে না পেরে ছেলেদের সঙ্গে যৌন-মিলনে ব্রতী হয় এবং অলক্ষ্যে সন্তানের জননী হয় তাদের দশা কি? যৌবনের তাড়নায়, দেহের চরম ক্ষুধায়, মনের অসহ্য জ্বালায় ছেলেদের সঙ্গে যৌন-ক্রিয়ায় যখন লিপ্ত হয় তখন ভবিষ্যতে কি হবে এ চিন্তা নারীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

মস্তিষ্কেই আসে না। ঐ চরম মুহূর্তে এ চিন্তা আসবার কথাও নয়। এ চিন্তা যারা করতে পারে তারা সাধারণ নয়, অসাধারণ। স্বাভাবিক চরিত্রের অধিকারিণী নয়। অস্বাভাবিক চরিত্রের অধিকারিণী, সতী সাধ্বী, মহান নারী। এদের পেটে জন্মলাভ করে ওলি, গাউস, কুতুব, ফকির, নবী, পয়গম্বর, দেশ ও জাতির মহান নায়ক। এদের আমরা শ্রদ্ধা করি, সালাম জানাই। কিন্তু তাদের নিয়েই তো সমগ্র দেশ ও সমাজ নয়। সাধারণ নারী ও পুরুষকে নিয়েই এ সংসার। সেই সংসারের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই তো আমাদের কর্তব্য; এক মহান দায়িত্ব। এ দায়িত্বের হাত থেকে এড়াতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে আপনার মেয়েটির দৈহিক ও মানসিক মনের অবস্থা বিচার করে। আপনার মেয়েটি কলেজে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রি নিতে হোস্টেলে থাকছে বলেই আপনি নিশ্চুপ বসে আছেন। সে যে যৌবনের তাড়নায় মরছে—কন্ট্রাক্টারদের প্রলোভনে অথবা হোস্টেলে-আয়ার সাহায্য নিয়ে অন্য ছেলের হাত ধরে বের হয়ে যাচ্ছে এবং অচেনা বাড়ির অন্দরমহলে দেহ বিক্রি করছে—সে খবরও জানেন না। ১৯৭৬ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি যুবতী নারীকে নিয়ে কি ঘটনা ঘটে গেল—তার বাবা-মার বুক ছিন্ন করে কিভাবে দুর্বৃত্তেরা সে নারীর সঙ্গে পশুর মতো সঙ্গম করে জীবনলীলা সাঙ্গ করল, সে কথা শুনে কি আপনি চমকে উঠছেন না? আপনার মেয়েও যে এমন কাজ করছে না তার প্রমাণ কি? হয়তো এখন প্রমাণ পাচ্ছেন না, নিজের মেয়ে তাই তার ওপর সন্দেহ আসছে না; কিন্তু দু-দিন পর যখন খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় বের হবে যে ড্রেনের নিচে অথবা বদ্ধ বিলের জলে একটি মেয়ের লাশ ভাসছে আর সেটা আপনারই মেয়ে তখন কি করবেন? অথবা মনে করবেন, খুব চালাক মেয়ে, ধরা পড়বে না। কিন্তু বিয়ের পরে দেখলেন স্বামীর ভাত খায় না। যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন তাকে পছন্দ করে না—চায় ঐ কালো রংয়ের তার ঐ প্রেমিক যার সঙ্গে হোটেলে থাকা অবস্থা প্রেম উঠেছিল—সঙ্গম করেছিল। ঐ মেয়ের দাম্পত্য জীবন তো সুখের হবেই না—তাকে নিয়ে আবার আপনাদের দাম্পত্য জীবনেও যে বুড়ো বয়সে ভাঙ্গন ধরবে। তাই সাধু সাবধান! পরিণত বয়সে মেয়েকে বিয়ে দিন। নইলে আপনার ধন-মান-ইজ্জত সবই ঐ মেয়ে নষ্ট করবে।

শুধু আমাদের দেশের চিত্রই যে এরূপ ন্যক্কারজনক তা নয়। যারা সভ্য বলে দাবি করে, উন্নতির চরম শিখরে যাদের স্থান, তাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের কি অবস্থা ঘটে, যৌবন মনের কোটরে আবদ্ধ করে রাখতে পারে কি না, বিবাহের পূর্বে ছেলে-মেয়েরা যৌন-সাধ প্রাণভরে উপভোগ করে কি না এটাও একটু দেখা দরকার। আমি নিজে ইচ্ছামতো সে চিত্র তুলে ধরলে অনেকের কাছেই ভাল লাগবে না। যাদের চিত্র তুলে ধরব, তারাও চেষ্টা করবেন আমাকে বিচারের কাঠগড়ায় তুলে জবাবদিহি করতে। তাই চলুন তাদের দেশের চিন্তাবিদ যৌনবিজ্ঞানীদের কথাই শুনি তারা কি বলেছেন। আমেরিকার অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের সঙ্গে আলাপ করে প্রখ্যাত Professor Terman বলেছেন, 'বিবহের পূর্বে ব্যভিচারের মাত্রা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দ্রুতগতিতেই চলছে।"[১]

Miss Dorothy Bromely বলেছেন, "গড়ে বিশ বছর বয়সের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন ও মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২৫ জনই যৌন তৃষ্ণা মিটিয়েছেন।"[২]

(৫) অবাধ মেলামেশা ঃ দাম্পত্য জীবনে চরম অশান্তির মূলে যে সব কারণ রয়েছে তার মধ্যে অবাধ মেলামেশা অন্যতম। নারী-পুরুষ যৌন-তৃষ্ণা মেটায় দু-দিক থেকে। একটি দৈহিক আর একটি মানসিক। প্রথমে মানসিক ক্ষুধা যেমন দেখবার সাধ, কথা বলবার

১। Psychological Factors in Marriage—Prof. Terman.
২। Youth and Sex—Miss Dorothy Bromley.

সাধ, একসঙ্গে চলাফেরা করবার সাধ ইত্যাদি। একটি ছেলে যত সাধু ও ভদ্র হোক না কেন মন তার চাইবেই একজন সমবয়স্কা মেয়ের সান্নিধ্য। মেয়েদেরও ঠিক তাই। মনকে ধরে রাখা যায় না। বিপরীত লিঙ্গে আকর্ষণ আসবেই। তাই সুযোগ পেলে এর সদ্ব্যবহার তারা করতে ছাড়বে না।

সুযোগ কি ভাবে আসে? কোন কোন পরিবারে অবাধ মেলামেশার পক্ষে কোন বাধা নেই। তাই পড়ার ছলে হোক, গান-বাজনার ছলে হোক, বা আত্মীয়তার খাতিরেই হোক এ সুযোগ ছেলেরা করে নেয়। প্রথমত ছেলেরা মুখরোচক কথা, ভদ্রব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার দেখে মেয়ের বাবা-মা মুগ্ধ হয় এবং পরিবারের সঙ্গে মিশবার অবাধ লাইসেন্স দেয়। পরবর্তী সময়ে এ পরিবারে বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে ভাবসাব জমে যায়। এখন ঐ মেয়েটিকে বা ছেলেটিকে অন্যত্র বিবাহ দিলে তারা মোটেই সুখী হয় না। অতীতের স্মৃতি যখন মনের কোণে ভেসে ওঠে তখন ঐ মেয়ে স্বামীকে আস্তে আস্তে অশ্রদ্ধা করতে থাকে। এই অশ্রদ্ধাই দিনে দিনে অশান্তি নিয়ে আসে।

অবাধ মেলেমেশার আরও কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুযোগ যেমন সিনেমা হল, নাট্যমঞ্চের আসর, গানের আসর, কবিতা পাঠের আসর, সমবায় সমিতি, বনভোজন, কলেজ হোস্টেল ইত্যাদি।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে এসব আসরে যখন ছেলে-মেয়ে একত্রে রং-বেরঙের পোশাক পরে অভিনয় করে তখন যার চোখে যাকে ভাল লাগে তাকেই ভালবাসতে শুরু করে। এই ভালবাসার বীজ আস্তে আস্তে অঙ্কুর গজিয়ে শাখা-প্রশাখা মেলে দেয়। যদি ছেলে-মেয়েতে বিয়ে হয় তো সোনায় সোহাগা। আর যদি না হয় তাহলেই হয় তাদের বিবাহিত জীবনে অশান্তির কুরুক্ষেত্র।

সিনেমা জগৎ ও নাটকের বিষয়ও একটু আলোচনা না করে পারছি না। দাম্পত্য জীবন হয়তো বেশ সুখেই কাটাচ্ছেন। স্ত্রী যা বলে শুনছেন, যখন যা আদেশ করে মানছেন, যা চায় তাও দিচ্ছেন। নাটক দেখার সখ, সিনেমা দেখার সখ জাগল, আপনি শুনে আর না বলতে পারলেন না। হয় সঙ্গেই নিয়ে গেলেন অথবা পঞ্চাশ টাকার নোট একটা বের করে দিলেন। আপনার স্ত্রী ইচ্ছামতো সাজগোজ করে আয়নাতে বার বার মুখটা দেখে বেশ খুশি হয়ে চললো সিনেমায়। বক্সে টিকিট করে বন্ধুর সঙ্গে হাসিগল্পের মাঝে রাজ্জাকের অভিনয় দেখলো। ফিরবার সময় বার বার মনে পড়তে লাগলো ঐ রাজ্জাকের চেহারা আর অভিনয়ের ভঙ্গি। বাড়ি এসে স্বামীর কালো চেহারা আর কুচির মতো দেহটা দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল। একটানে কাপড়টা ছেড়েই স্বামীর ওপর একচোট নিল, ছেলে কাঁদছে কেন? বিছানাটা কি এলোমেলো! কি স্বার্থপর! আমার জন্য ভাত বাড়া হয় নি? নানা কথায় স্বামীকে বোকা বানিয়ে বসিয়ে রাখলো। তারপর তো আর বলবার কথা নয়। রাজ্জাকের মতো হাসতেও পারলেন না। একটা ফুল নিয়ে নাকের কাছে ধরে আড়নয়নে তাকালেন না। হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে প্রেমের একটি গান গেয়েও শোনালেন না। নতুন ডিজাইনের একটি সুট পরেও আকৃষ্ট করলেন না! বুকে টেনে নিয়ে ভালবাসার একটি চিহ্ন তার গালে এঁকে দিতে পারলেন না। আপনাকে ভালবাসবে কেন? আপনাকে দেখলে তার মনের আগুন বাড়বে বই কমবে কি?

এবার আসুন ছেলেদের কথায়। সুন্দরী স্ত্রী ঘরে। সম্ভ্রান্ত বংশের বি. এ. পাশ করা মেয়ে! আপনার সঙ্গে মিল মহব্বত আছে বেশ! কিন্তু সিনেমা হলে যখন সুরাইয়াকে আপনি দেখলেন বাঁকা চাউনিতে তার স্বামীর সঙ্গে অভিনয় করতে, তখন ঐ ঘরে ফেলে আসা স্ত্রীর ওপর কি মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন না? একথা কি শয়তান আপনাকে বলে দিল না—"ওহঃ!

pdf By Syed Mostafa Sakib

টাকার লোভে কি করেছ? একদম uncultuaed, না জানে গান গাইতে, না জানে একটা কথা বলতে।" ঘরে এসে আপন মনে একমুঠো ভাত মুখে দিয়ে ঢক্ ঢক্ করে দু-গ্লাস পানি খেয়ে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আর আপনার ঐ স্ত্রী যে রাত জেগে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, ভাত খায় নি, তার সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। আপনার মুখের চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখে বেচারী ভয়ে অস্থির হয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার সাহসটুকুও পাচ্ছে না—'কি হয়েছে আপনার।' নিজের মনেই নিজে বার বার প্রশ্ন করছে কি অন্যায় করেছি? কেন স্বামী আমার ওপর বিরূপ? কেন সে আমায় পাশে ডাকে না? সারাটি রাত গেল—সেও ঘুমাতে পারল না। আর আপনার চোখেও নিদ্রাদেবী ভর করল না। আবেগ, উচ্ছ্বাস ও মনের দহন জ্বালায় আপনিও মরলেন; আর ভয় ভীতি, সংকোচ ও লজ্জায় ফেলে দিয়ে ঐ হতভাগিনী মেয়েটার অন্তরেও আগুন লাগালেন! একদিন নয়, দুদিন নয়। চলল আপনার সিনেমা, নাটক ও বাইস্কোপ দেখার চিরাচরিত এক অভ্যাস। আপনার স্ত্রী যদি সতী হয় সমাজের ভয় করে, তাহলে সারাটি জীবন দুঃখের অনলেই পুড়বে আর যদি অসতী হয়, ধর্মকর্ম না মানে, তাহলে তাকে কি দোষ দেবেন—যদি সে আপনারই এক বন্ধুর সঙ্গে প্রেম গড়ে তোলে? আপনার অনুপস্থিতিতে যদি সে যৌন-তৃষ্ণা নিবারণ করে তবে সে দোষ কি তার?

অবাধ মেলামেশার সুযোগে যাবেন না। আপনার স্ত্রীকেও যেতে দেবেন না। আপনি যদি যান তবে সে মরল আর আপনার স্ত্রীকে যদি যেতে দেন তবে আপনিও মরলেন। অশান্তি, চরম অশান্তির মুখেই ঠেলে দিলেন আপনাদের মূল্যবান দাম্পত্য জীবনকে।

ছেলে-মেয়েদের চালাক বানাতে আপনারা যারা পিতা-মাতা, অবাধ মেলামেশার সুযোগ দেবেন না। ছেলেও হারাবেন—মেয়েও আপনার মুখে কালি দিয়ে বাড়ি হতে বের হয়ে যাবে। জাতি, ধর্ম মানবে না। এই নাটোরেই দেখলাম এক হিন্দু মেয়ে মুসলমান এক মেজর-এর সঙ্গে অবাধ মেলামেশার লাইসেন্স পেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। কত নামজাদা এ ভদ্রলোক। কে না তাকে ভালবাসে ও সম্মান করে! কিন্তু নিজের ঔরসজাত মেয়ে বাবার এ সম্মান দেখল না। কত মনোবেদনা নিয়ে ভদ্রলোক তার বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন মেয়েটিকে দেখতে এবং বাড়ি নিয়ে আসতে। আমিও সঙ্গে ছিলাম। কি অকৃতজ্ঞ মেয়ে! তার বাবার সঙ্গে দেখাই করল না। অবর্ণনীয় দুঃখ হৃদয়ে নিয়ে ফিরে এলেন ভদ্রলোক।

প্রেম কি জাত-বেজাত মানে? ভালবাসা কি কালো-সুন্দর বোঝে? এরা চায় একটু সুযোগ। চায় একটু বিকাশের ক্ষেত্র। তাই ছেলে-মেয়েরা আত্মীয় হোক, অনাত্মীয় হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, বে'টে হোক, লম্বা হোক, বোকা হোক, অন্ধ হোক একত্রে মিলতে চাইবেই। যৌন-তৃষ্ণার আকর্ষণে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হবেই। এজন্যই ইসলাম অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী নয়। ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নারী-পুরুষের জন্য তাই পর্দা প্রথার প্রচলন করে গেছেন। এ প্রথা আলোচনার পূর্বে অবাধ মেলামেশার আর একটি কুফল বর্ণনা করেই শেষ করছি যা বিজ্ঞানসম্মত।

অবাধ মেলামেশার ফলে অকালেই যৌবন চলে আসে। মানব দেহ হতে পিনিয়াল গ্রন্থিরস যখন নিঃসৃত হতে থাকে তখনই যৌবনের সূচনা হয়। আবার থাইরাস গ্রন্থির হরমন দেহ হতে বেশি পরিমাণে নিঃসরণে দেহের পুষ্টি ও বুদ্ধি কমে যায়। এটা বর্তমান যৌনবিজ্ঞানীদের মত। অল্প বয়সে ছেলে-মেয়েরা যখন যৌন-চিন্তায় মন দেয় তখন হতেই এ রস নিঃসরণ হতে থাকে। তাই অল্প দিনের মধ্যেই কামভাব জাগে ও যৌবনে পদার্পণ করে। এটা দেহ ও মনের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর।

পর্দাপ্রথা

হযরত বলেছেন, "নারীরা আড়ালে থাকার বস্তু। আড়াল হইতে নারী বাহির হইলেই শয়তান তার প্রতি উঁকি মারে।"[১]

নারী চরিত্র নিয়ে আমি ইতিপূর্বে অনেকটা আলোচনা করেছি। 'সৃষ্টি বৈচিত্র্য' পরিচ্ছেদেও নারী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ, যৌন চেতনার উন্মেষের কারণ কিছুটা বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। পর্দাপ্রথার অর্থ নারী জাতির মর্যাদা রক্ষা। এ প্রথা বহুকাল থেকেই চলে আসছে। হিন্দুরা দাবি করে যে পর্দাপ্রথা প্রথমে তাদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে অবশ্য এ কথা দেখা যায় যে পুরুষের সঙ্গে নারীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হতো না। পুরুষের সম্মুখে তারা আসলে বিনীতভাবে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো, ওপরের দিকে তাকান নিষিদ্ধ ছিল এবং চঞ্চলতা না করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। শ্বশুর, ভাসুর, সবার সম্মুখে ঘোমটা পরে লজ্জার মনোভাব নিয়ে দাঁড়াতে হতো। অবশ্য এরূপ প্রথা তাদের মধ্যে এখনও আমরা দেখতে পাই। তবু যেন এ কথা মেনে নিতে পারি না যে পর্দাপ্রথা তাদের নিকট হতেই প্রচলিত এবং এর মর্যাদা তারা অক্ষুণ্ন রেখেছে। কেননা তাদের বেদ পুরাণ দেখলে মনে হয় ব্যভিচারে সমগ্র দেশ গ্রাস করেছিল। মুনী-ঋষিদের স্ত্রীগণও রক্ষা পায় নি।

পুরাণে আছে ঃ "দীর্ঘতমা মুণিও তাঁর স্ত্রীকে অপরের ভোগ্যা জেনে সতীত্বের নিয়ম স্থাপন করেন।"

বেদে আছে ঃ "মনু সংহিতার মতে, পুত্র দ্বাদশ প্রকারের। তার মধ্যে স্ত্রীলোকের অবিবাহিতা অবস্থায় যে সন্তান জন্মলাভ করত তাকে বলা হতো **'কানীন'**। গর্ভবতী কুমারীর বিবাহের পর জাত সন্তান **'সহোঢ'**। বিধবার পুনরায় বিবাহের পর জাত সন্তান **'পৌণভব'**। ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতির ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান **'শৌদ্র'**।"

(সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাংলা অভিধান।—পুত্র শব্দের ব্যাখ্যা)

পর্দাপ্রথা যদি মানা হতো তাহলে ব্রাহ্মণ, মুনী-ঋষী তাঁদের স্ত্রীগণ কিভাবে অন্যের দ্বারা ধর্ষিত হয়ে গর্ভবতী হতেন? পর্দার মাথায় কুঠারাঘাত হেনে শুধু হিন্দুরাই নয়, খ্রিষ্টান, ইহুদি ও মুসলমানগণও অবাধ মেলামেশার সুযোগ নিচ্ছে। হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের নারীগণ ইচ্ছেমতো ধর্ষিতা হতো, নিজেরা বাজার করত। এরা তখন মুসলমান ছিল না, ছিল পৌত্তলিক, খ্রিষ্টান, ইহুদি। হজরত সমাজের চরম দুর্দশা দেখে, নারী জাতির প্রতি পশুর মতো আচরণ দেখে তাই কঠোর আদেশ দিলেন—"কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবেন না এবং কোন স্ত্রীলোক অন্য কোন পুরুষের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে না। আর দুজন পুরুষ একত্রে চাদরের নিচে শুইতে পারবে না এবং দু-জন স্ত্রীলোকও একত্রে এক চাদরের নিচে শুইতে পারবে না। এ সমস্তই নিষিদ্ধ।" (মুসলিম)

১। বুখারী শরীফ—তর্জমা মাওলানা শামসুল হক। ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা—৩৬৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

নারীর মান, নারীর ইজ্জত ও নারীর মর্যাদা দিলেন আমার নবী (সঃ)। পর্দাপ্রথা পুরাতন হলেও নতুন করে কঠোর আদেশের মাধ্যমে যিনি চালু করলেন তিনিই হলেন ইসলামের আলো—বিশ্বমানবের মুক্তিদাতা হজরত মুহাম্মদ (দঃ)।

শুধু অচেনা, অজানা নারী পুরুষের দেখা করাই নিষেধ নয়, নিজ পরিবারভুক্ত ও আত্মীয়ের মধ্যে বিশেষ কয়েক ব্যক্তি ছাড়া নারীদের মেলামেশাও নিষিদ্ধ করেছেন। নিম্নের হাদিসটি এর প্রমাণ দেয়।

উকবা-বিন-আমির হতে বর্ণিত আছে, "রসুলুল্লাহ (দঃ) বললেন—'সাবধান হও (নির্জনে) স্ত্রীলোকদিগের নিকট গমন হইতে।' একজন আনসারী বলল—"হে রসুলুল্লাহ! দেবর সম্বন্ধে কি বলেন।" তিনি বললেন—'দেবর ত মৃত্যুতুল্য।"[১] (বাঁচ তাহা হইতে)

প্রগতিশীল দেশের নর-নারী পর্দাপ্রথাকে প্রাচীন ও অসভ্য প্রথা বলে মনে করে। তাদের মতে—(১) এটা নারীর ওপর একটা অবরোধ প্রথা যার ফলে নারীর মানসিক চিন্তাধারার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নারীর স্বাস্থ্যকে হীন ও দুর্বল করে ব্যাধিগ্রস্ত করে দেয়। ফলে স্নায়ুতন্ত্রে আস্তে আস্তে অবসাদ আসে, ফলে তার নৈতিকশক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। আর স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্বলতার কারণেই যৌন-উন্মাদনার সৃষ্টি হয়।

(২) পর্দাপ্রথার জন্যই বিবাহের পূর্বে নারীকে তন্ন তন্ন করে দেখার সুযোগ হয় না। তাই বিবাহের পরে দুজনের জীবনে অভিশাপ নেমে আসে।

(৩) পর্দাপ্রথা নারীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের পথে বাধা দেয়। তাই ইচ্ছানুযায়ী স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে স্বাধীনভাবে চলতে পারে না।

তাদের মতে নর-নারীর অবাধ মেলামেশা সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে উন্নতি আনে। নারীকে অবরোধ করে তাদের প্রতিভা চাপা রাখা উচিত নয়। এ মতবাদেই তারা আজ নারীকে মাঠে-ঘাটে, হাটে ও বাজারে নামিয়েছে; নারীকেও নানাভাবে প্রেরণা দিয়ে চঞ্চলা করে তুলছে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্মান, ফ্রান্স, ইতালি, চীন, রুশ ও ভারত প্রভৃতি দেশের নারীরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে এবং প্রভূত উন্নতিও করছে। এটা অস্বীকার করার নয়। তাদের মতে, নারীরা প্রগতির পথে। কিন্তু সমাজহিতৈষী ও ধর্মপরায়ণ মনীষীদের মতে এরা প্রগতির পথে নয়—অধঃগতির পথে। তাই এ জটিল প্রশ্ন সবার মাথায়ই আসছে 'নারী আজ কোন্ পথে'? ১৯৬৫ সনে এ বিষয়ের ওপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আহ্বান করেছিলেন 'জাহানে-নও' পত্রিকার সম্পাদক। আমি মূর্খ এ বিষয়ের ওপর যা লিখেছিলাম তা অবিকল পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরলাম।

১। যাদের সঙ্গে দেখা করা চলে—(১) স্বামী, (২) স্বামীর বাবা, দাদা যত উর্ধ্বে যাবে। (৩) আপন পিতা, দাদা এবং তদুর্ধ্বে। (৪) আপন ভাই, বিমাতা ভাই, বৈপিতৃক ভাই। (৫) সতিনের ছেলে। (৬) আপন মামা (৭) আপন চাচা। (৮) আপন পুত্র। (৯) আপন ভাই-এর পুত্র ও যত নিচে যায়। (১১) নাবালক ছেলে। (১২) নিজ গোলাম ও বাঁদী।

যাদের সঙ্গে দেখা করা চলে না—(১) ভাসুর ও ভাসুরের ছেলে। (২) দেবর ও দেবরের ছেলে। (৩) চাচার ছেলে। (৪) জেঠার ছেলে। (৫) মামার ছেলে। (৬) স্বামীর অন্যান্য ভাই। (৭) সমস্ত অজানা ও অচেনা পুরুষ ইত্যাদি।

সহীহ বুখারী। তর্জমা—পূর্বে বর্ণিত বিবাহ পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ৩১৩ হাঃ নং ৪০/৬/০।

নারী আজ কোন্ পথে

(অধোগতির পথে)

সকল সভ্য দেশের সকল শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের মাথায় একটা কথাই বার বার দোলা দিচ্ছে যে "নারী আজ কোন্ পথে"? প্রগতির পথে না অধঃগতির পথে? প্রগতির অর্থ উন্নতি, আর অধঃগতির অর্থ অবনতি। বিশ্বের নারী-সমাজ আজ উন্নতির পথে না অবনতির পথে—সেটাই আমাদের বিচার্য। প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করলেই হয় উন্নতি আর এর বিরুদ্ধাচরণ করলেই হয় অবনতি। এই নিখিল বিশ্বে এমন কোন সৃষ্টি নেই যা উদ্দেশ্যহীন অথবা অযৌক্তিক। বিভিন্ন সৃষ্টির বিভিন্ন স্বরূপের মাধ্যমেই এই মহাবিশ্বকে শৃঙ্খলিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা হয়েছে ও সৃষ্ট জীবকে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোত্রে পৃথক করে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত করা হয়েছে। কোন সৃষ্টিই অসুন্দর নয়। কোন সৃষ্টিই বৃথা নয়। আল্লাহপাক তাই কোরআনে স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "এবং আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং তদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়সমূহ বৃথা সৃষ্টি করি নাই; অবিশ্বাসকারীরাই এরূপ ধারণা করে। অতএব অবিশ্বাসকারীদের জন্য পরিতাপ।"

(সূরা সাদ, আয়াত ২৭)

"বল, আমাদের প্রভুই তো প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করে যার যার পথ নির্দেশ করেছেন।"

(কোরআন)

যে শ্রেণীকে যে প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে সেই পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতাই দান করা হয়েছে। অন্যান্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য রেখে এবার আমরা একটা গোত্রের শ্রেণীবিভাগ ও কার্যপ্রণালী বিচার করে দেখব।

মানুষ গোত্রকে দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—নারী ও পুরুষে। এই নারী ও পুরুষের পার্থক্য দেখে আমরা তাদের স্ব-স্ব কার্যপ্রণালী বিচার করব। একই রক্ত মাংসে গঠিত, একই উপাদান হতে সৃষ্ট, একই আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়েও নারী পুরুষ হতে সম্পূর্ণই পৃথক। পুরুষ হয় বল বীর্যবান, শক্তিশালী—আর নারী হয় কোমল ও লাজুক। পুরুষেরা সাধারণত চঞ্চলমতি—নারীরা ধীরস্থির। পুরুষ সাহসী—নারীরা ভীরু। পুরুষের উন্নত দেহ ও প্রশস্ত বক্ষ, নারীর স্বাভাবিক দেহ ও স্তনযুক্ত বক্ষ। পুরুষ চিন্তাশীল ভাবুক—নারী স্বভাবধর্মী ও পরশ্রীকাতর, পুরুষের চিন্তাধারা জাগ্রত ও বিপ্লবী—নারীর চিন্তাধারা সুপ্ত ও সাম্য। পুরুষ আলোড়নকারী—নারী প্রেরণাকারী।

পুরুষ ও নারীর সৃষ্টির মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি কোন বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করেও প্রকৃতির এ নিয়মকে লঙ্ঘন করা যায় না। নারীর মুখে যেমন গোঁফ গজান যায় না তেমনি পুরুষের বুকেও স্তন স্থাপন করা যায় না। নারীকে মাংস, ডিম প্রভৃতি বলকারক খাদ্য খাইয়ে যেমন নির্ভীক করা যায় না, পুরুষের পেটেও তেমনি কোন যন্ত্র প্রয়োগ করে মানুষ জন্মাবার পরিকল্পনা করা যায় না। যদি এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হতো, তাহলে নারী অনেকদিন আগেই পুরুষকে বাধ্য করত তার পেটে ছেলে রাখতে, বুকে দুধ রাখতে ও গায়ের শক্তি কেড়ে নিতে। কিন্তু সে কল্পনা তাদের চিরদিন কল্পনাই থেকে যাবে।

পুরুষকে কর্মপ্রেরণা দিতেই নারী। পুরুষের মনের খোরাক জোগাতেই নারী। বংশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বৃদ্ধি, সংসার চালনা, স্তনদান ও কচি শিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্বের জন্যই নারী। নারী তার এই স্বাভাবিক ধর্ম ভুলে গেলেই হয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই। তখনই হয় অধোগতি। নিজের প্রকৃতিগত স্বভাব দূরে ঠেলে দিয়ে অপরের ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা করতে গেলেই নিজের দায়িত্ব অবহেলা করা হয় এবং অপরের দায়িত্বের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান হয়। নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভিন্ন দুনিয়া অচল। নারীর যে দায়িত্ব পুরুষ তা প্রতিপালন করতে সম্পূর্ণই অক্ষম; আর নারীর পক্ষেও পুরুষের কঠোর সমস্যা ও কার্যাবলি সম্পাদন করা দুরূহ।

বিশ্বের নারী-সমাজ আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের স্বাধীনতা আদায় করতে। সংগ্রাম চালাচ্ছে পুরুষের অধিকারকে হরণ করতে। আর নারীর স্বাভাবিক দায়িত্বকে চুলায় দিতে। প্লাকার্ড হাতে জোর গলায় আওয়াজ তুলছে, "সামাজিক শাসনের বলে নারীকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। নারীকে কোণঠাসা করে রাখবার সর্বপ্রকার কুপ্রচেষ্টার মাথায় কুঠারাঘাত হানতে হবে। নারী জীবন্ত, প্রাণপূর্ণ এবং প্রচুর সম্ভাবনাময় সৃষ্টি। নারী পাথর নয়, গাছ নয় এবং চতুষ্পদ জন্তু নয়। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সমান অধিকার আদায় করবে। শাস্ত্রের দোহাই, ধর্মের বাধা, সমাজের অনুশাসন মানবে না।"

তাদের এ আওয়াজ ব্যর্থ হয় নি। এ ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট অগ্রগতিও হয়েছে। আজ নারী-সমাজ বল্গাহীন অশ্বের ন্যায় 'সহীসকে' ভ্রূকুটি দেখিয়ে নিজের খেয়ালখুশি মাফিক চলছে। আজ আর তারা ভীরু নয়, আজ আর তারা কারো অধিকারে নয়। নিজের স্বামীকে তারা আজ দেবতা বলে মানতে রাজি নয়। পর্দার অন্তরালে 'অসূর্যম্পশ্যা' আখ্যা নিয়ে নিজেদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে তারা রাজি নয়। স্বামীর পদপ্রান্তে বেহেশ্‌ত এ মহাবাণীকে স্মরণ করে তাদের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিতে তাঁরা রাজি নয়। ভ্রমর যেমন নতুন নতুন ফুলে বসে বিভিন্ন মধুর স্বাদ গ্রহণ করতে ব্যস্ত থাকে, প্রগতিশীল নারী সমাজও আজ সেইরূপ নতুনত্বের আস্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত। স্বীয় গণ্ডির মধ্যে পর্দার অন্তরালে মানবগোষ্ঠীর সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের মহান দায়িত্বের মধ্যে আজ আর তারা আবদ্ধ নেই। 'লজ্জা' শব্দটির মাথায় পদাঘাত করেই তারা বের হয়ে এসেছে রাস্তাঘাটে, হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, হাটে ও বাজারে। স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে, শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করে, বাপ-মার স্নেহ-মায়া পরিত্যাগ করে, নতুন বন্ধুর হাত ধরে যৌনকামনা পরিতৃপ্ত করছে। এই কি প্রগতি? প্রগতির অর্থ যদি এই হয় তাহলে এ প্রগতির মাথায় লাথি মেরে চিরজীবনের জন্যই একে বিসর্জন দিয়ে অধোগতির পথ বেছে নেওয়াই শ্রেষ্ঠ।

নারীকে আজ যে স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে, যে প্রগতির পথে তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে সে পথ তাদের আলোর পথ নয়। সে পথ উদ্দেশ্যহীন। সে পথ কণ্টকপূর্ণ। সে পথ অন্ধকারের পথ। করাচি, লাহোর, ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি বড় বড় শহরের নারীদের কীর্তি-কাহিনী মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায়। হোস্টেলের মেয়েরা নিজ আত্মীয়ের পরিচয় দিয়ে ছুটির দিনে বন্ধুর বাড়িতে ইচ্ছামতো কাটিয়ে আসে। অত্যাধুনিক পরিবারে মেয়েরা স্বামীর কাছে কোলের শিশুকে রেখে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে মার্কেটিংয়ের নাম করে বের হয় আর নতুন বন্ধুর স্বাদ আস্বাদন করে রুক্ষ মেজাজে ঘরে ফেরে। শুধু কি তাই? বোকা স্বামীকে ছেলের যত্ন ভাল হয় নি বলে অযথা গালাগালি দিয়ে নিজের দোষ গোপন রাখে আর পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষা করে। নগ্ন টেডি পোশাক পরে রাস্তায় হেলে-দুলে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাজারে গিয়ে দশ টাকার শাড়ি বিশ টাকায় কিনে স্বামীর ওপর বাহাদুরী করে আর তাকে বোকা ঠাওরায়। সংসারের শান্তি, উন্নতি ও শৃঙ্খলাকে ব্যাহত করে।

যারা নিজের কর্তব্যকে ভুলে যায় তারা নিজের মাথায়ই কুঠারাঘাত করে। যারা বিশ্ব-নিয়ন্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে তারা নিজের গলাতেই নিজে ফাঁসি ঝুলায়, যারা সমাজের শাসনকে অবহেলা করে ও বিবেকের বাঁধনকে টুটে ফেলে তারাই অন্যের গলায় ছুরি বসায়। যৌন প্রবৃত্তির তাগিদে যারা উন্মুক্ত প্রান্তরে নেমে আসে তারাই সমাজের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে। নারীরা আজ যে স্বাধীনতার আওয়াজ তুলেছে সে স্বাধীনতা সমাজের জন্য, দেশের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য এবং সর্বশেষে আত্মার জন্য কলঙ্কজনক। নারী চায় যৌন-কদাচারের স্বাধীনতা, নারী চায় বেশভুষা ও উলঙ্গের স্বাধীনতা। প্রগতিশীল নারীর এই দাবি। এই তাদের আওয়াজ। অন্যথায় সমাজ তাদের যে স্বাধীনতা দিয়েছে সেই স্বাধীনতাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আজ নারীকে জন্মের পর গলা টিপে মারা হয় না। নারী-সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হয় না। নারীকে মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে হয় না। নারীকে শিক্ষায় পশ্চাদপদ রাখার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয় না। নারীকে তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হয় না। নারীকে বনবাসে পাঠিয়ে বাঘ ভাল্লুকের মুখে তুলে দেওয়া হয় না। পার্থক্যের মধ্যে এই যে পুরুষ বহির্জগতের জন্য, আর নারী অন্তর্জগতের জন্য। পুরুষ জ্ঞান, সাধনা ও কঠোর ব্রতের জন্য—নারী সংসার চালনা ও প্রেমের জন্য। পুরুষ বিপ্লবের জন্য, আর নারী সাম্যের জন্য। পুরুষ উপার্জনের জন্য, আর নারী গঠনের জন্য। পুরুষের সাথে সমান তালেই নারীর কাজকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তথাপি তারা পুরুষের অধিকারকে ছিনিয়ে নেবে। প্রগতিশীল নারীর ঢেউ আজ সমাজের স্তরে স্তরে দোলা দিচ্ছে আর বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি করে তুলছে। যদি এ ঢেউকে স্তব্ধ করা না যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে পুরুষের ত্রাহি ত্রাহি ডাক উঠবে।

ডিমের কুসুমকে যদি বাইরে মুক্ত আবহাওয়ায় রাখা যায় তাহলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। গুণাগুণ তো থাকেই না বরং বিষ হয়ে দাঁড়ায়। ডাবের জলকে বৃষ্টির জলে অথবা উন্মুক্ত যে কোন জলে মেশালে এর বিশেষ কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। ফল উৎপাদনকারী অঙ্কুর বীজের খোসা ছাড়িয়ে রাখলে পচে যায় ও ভবিষ্যৎ জন্মদানের ক্ষমতা তিরোহিত হয়। নারীর পবিত্রতা, কার্যকারিতা ও সৌন্দর্য এদেরই মতো। নারীর আবরণ তার পর্দায়। নারীর সৌন্দর্য তার লজ্জায়। নারীর বাহাদুরী তার ঔরসজাত সন্তান উৎপাদনে। নারী তার এই বিশিষ্ট গুণগুলি হারালেই তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়। তখন তার আকর্ষণ আর আকর্ষণ থাকে না, হয় বিকর্ষণ। পর্দার আবরণ দূরে ঠেলে দিয়ে যদি নারী নগ্নতার আশ্রয় নেয় তাহলে তাকে প্রগতি না বলে অধোগতিই বলতে হবে, কেননা আল্লাহ্ স্বয়ং পবিত্রতাকে পছন্দ করেন; তাই মুমেনদিগকে যে হুরদানে আত্মতৃপ্তি দেবেন তাদের পবিত্রতা সম্বন্ধে কোরআন বলেছে, 'সেই সুলোচনা সুন্দরীগণ পটমণ্ডপসমূহের মধ্যে উপবিষ্টা রহিয়াছে। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে অসত্যারোপ করিবে? ইহার পূর্বে মানব অথবা জ্বিন তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পদে অসত্যারোপ করিবে?" (সূরা রহমান, আয়াত ৭২-৭৭)

"এবং সুলোচনাগণ আনত নয়নে তাহাদের সন্নিকটে অবস্থান করিবে; যেন তাহারা ডিম্ব মধ্যে সুরক্ষিত।" (সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত ৪৮ ও ৪৯)

যে নারী তার আত্মমর্যাদা বুঝে, যে তার সৃষ্টির রহস্য বুঝে, যে তার কর্তব্য পালনে জ্ঞানশীলা হয় সে নারী কখনই তার বিবেককে জলাঞ্জলি দেবে না। কখনই তার পবিত্রতার মুখে কালিমা লেপন করে ইহজগৎ ও পরজগৎ নষ্ট করবে না। "একটা সতীনারী সত্তরটা সৎ পুরুষের চাইতেও উত্তম।" একথা যদি প্রতিটি নারী জানত তাহলে সমাজে অনেক শৃঙ্খলা বিরাজ করত। যদি জানত যে "একটা অসতী নারী সত্তরটা অসৎ পুরুষের চাইতেও নিকৃষ্ট" তাহলে নিশ্চয়ই সমাজকে কলঙ্কের মুখে ঠেলে দিত না। প্রতিটি নারীই সাবধান হতো নিজের পবিত্রতা রক্ষা করতে, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নত করতে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশ্বসুন্দরী হেলেন কিলার তার কক্ষের চতুর্দিকে আয়না ফিট করে নিগ্রো যুবকের সঙ্গে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সঙ্গমের নাট্যাভিনয় করে দর্শকবৃন্দকে আত্মতৃপ্তি দান করেন। হাজার হাজার যুবক-যুবতী টিকিট করে এই নগ্ন সঙ্গম দর্শন করেন। অন্যান্য বিশ্বসুন্দরীদের প্রতিযোগিতায় যে নগ্নতা দেখান হয় তা লক্ষ লক্ষ যুবক ও তরুণ ছেলেদিগকে পথভ্রষ্ট করে। সিনেমা, বায়স্কোপ ও থিয়েটারে প্রগতিশীল নারীর ভাবভঙ্গি, কল্পনা ও প্রেমের অভিনয় যুবক-যুবতীদিগকে শুধু আকৃষ্টই করে না, তাদের মাথা খেয়ে নেয়। সমাজকে করে ধ্বংস আর পরিবারে সৃষ্টি করে কুরুক্ষেত্র। রাস্তাঘাটে, শহরে-বন্দরে প্রগতিশীল নারীর বেশভুষা-চালচলন ও কৃত্রিম হাসি একটা সৎ পুরুষকেও অসৎ হতে বাধ্য করে।

অনেক চিন্তাবিদের ধারণা যে, নগ্নতা কামপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করে। তাদের মতে, যেখানে গোপনীয়তা যত বেশি সেখানে দেখবার কৌতূহলও তত বেশি। গোপনীয়তা দূর হলে দেখবার আগ্রহ কমে যায় ও কামপ্রবৃত্তিও কমে যায়। উক্ত সূত্রের ওপর নির্ভর করেই প্রগতিশীল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ যৌন সাধ মেটানোর সুযোগ দিয়েছে। তাই কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অভিমত, "যত সময় কলেজের অধ্যয়নরত যুবক-যুবতীদের যৌনসম্পর্ক ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকিবে এবং সতর্কতা রক্ষা করা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা উচিত হইবে না।ছাত্র-ছাত্রীদের যৌন ক্রিয়ার গোপনীয়তার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করিতে হইবে।"

কিন্তু এ চিন্তাধারা ভুল এবং নিতান্তই ভুল। একটা Electron যখন একটা Proton-এর পাশাপাশি আসে তখন কিছুতেই তারা দূরে থাকতে পারে না। একত্রিত হবেই হবে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। যারা বলে Electron ও Proton পাশাপাশি রাখলে তাদের Attraction শক্তি হারাবে তারা পাগলের রাজ্য বাস করে। Attraction শক্তি তখনই হারায় যখন কোন Electron, Electric Field-এর বাইরে চলে যায়। নারী ও পুরুষের স্বভাব ঠিক এই Electron ও Proton-এর মতোই। নারীকে কাছে না পেয়ে প্রেমে পড়া আর নারীকে ভোগ করে ভুলে যাওয়া এটা পাগলেরই স্বভাব। কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর এ স্বভাব নেই। তাই যে চিন্তাবিদরা এ থিওরী দিয়ে অনলকুণ্ড সাজিয়ে দিচ্ছেন হয়তো সে চিন্তাবিদরা এ অনলকুণ্ডেই আত্মাহূতি দেবেন।

প্রগতির পথে নারীরা আজ যে ব্যবস্থা চায় সে ব্যবস্থা সমাজের জন্য, দেশের জন্য, ধর্মের জন্য এবং বিশেষ করে নারীত্বের জন্য অবমাননাকর, আপত্তিকর ও লজ্জাকর।

দাম্পত্য জীবনের অশান্তি ও প্রতিকার

আমাদের জানা উচিত পর্দা সম্বন্ধে আল্লাহর বিধিনিষেধ কি? আল্লাহর বাণী শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের সমগ্র জাতির বিশেষ কল্যাণেই অবতীর্ণ হয়েছিল বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ওপর। যাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস আছে, যারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করেন, আমার মনে হয় তাদের জন্য এ গুরুতর ও জটিল বিষয়টি আলোচনার পূর্বে কোরআনের বাণীগুলো যথেষ্ট কার্যকরী ও সহায়ক হবে। তাই আশা করি স্বজাতি, বিজাতি ভক্তি সহকারে এ বাণী পড়বেন ও পর্দা প্রথার ওপর সিদ্ধান্ত নিবেন।

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অপরের গৃহসমূহে প্রবেশ করিও না—যে পর্যন্ত অনুমতি না গ্রহণ কর এবং উহার অধিবাসীদের প্রতি সালাম কর; **ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর** যদি তোমরা হৃদয়সঙ্গম করিয়া থাক। অতঃপর যদি তন্মধ্যে কাহাকেও প্রাপ্ত না হও তবে উহাতে প্রবেশ করিও না যে পর্যন্ত তোমাকে অনুমতি প্রদান করা না হয়। এবং যদি তোমাদিগকে বলা হয় যে তোমরা ফিরিয়া যাও তবে তোমরা ফিরিয়া

আসিবে। ইহা তোমাদের জন্য পবিত্রতর। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। ইহা তোমাদের জন্য অপরাধ নহে যে তোমরা এরূপ বসতিহীন গৃহসমূহে প্রবেশ কর যাহাতে তোমাদের দ্রব্যসম্ভার রহিয়াছে; এবং তোমারা যাহা প্রকাশ কর ও যাহা গোপন কর আল্লাহ্ তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। তুমি বিশ্বাসীদিগকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন নিজেদের নয়নসমূহ অবনত করে এবং স্ব স্ব গুপ্তাঙ্গসমূহ সংরক্ষণ করে। ইহা তাহাদের জন্য পবিত্রতর; নিশ্চয়ই তাহারা যাহা করিয়া থাকে আল্লাহ্ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। এবং তুমি বিশ্ববাসিনীদিগকে বলিয়া দাও যে তাহারাও যেন নিজেদের নয়নসমূহ অবনমিত করে ও স্ব স্ব গুপ্তাঙ্গসমূহ সংরক্ষণ করে এবং যাহা স্বতঃপ্রকাশিত হয়, তদ্ব্যতীত তাহারা যেন স্বীয় বেশ-বিন্যাস প্রদর্শন না করে ও তাহারা যেন স্ব স্ব বক্ষসমূহের ওপর আবরণী স্থাপন করে, এবং তাহারা যেন স্বীয় স্বামীগণের কিংবা স্বীয় পিতৃগণের অথবা তাহাদের স্বামীর পিতৃগণের কিংবা স্বীয় পুত্রগণের কিংবা স্বামীর সন্তানগণের অথবা স্বীয় ভ্রাতৃগণের কিংবা তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের অথবা তাহাদের ভগ্নীর সন্তানগণের কিংবা তাহাদের নারীগণের অথবা তাহাদের অধীনা দাসীগণের কিংবা অথর্ব দাসগণের অথবা নারীগণের আবরণীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ বালকগণের স্বপক্ষে ব্যতীত স্ব স্ব বেশবিন্যাস প্রদর্শন না করে; এবং তাহারা যেন এরূপভাবে তাহাদের পদক্ষেপ না করে যাহাতে তাহাদের আবরণীয় অলঙ্কারসমূহ প্রকাশিত হয়। এবং হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হও যেন তোমরা সুফল লাভ করিতে পার।" (সূরা নূর, আয়াত ২৭-৩১)

পর্দা প্রথার ওপর যে নির্দেশ আমাদের প্রতি আল্লাহ্ দিয়েছেন তা আমরা মানছি না। তাই সমাজের রন্ধ্রে এক উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তি বিরাজ করছে। একজনের গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেবার নির্দেশ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাকে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে। এ ব্যবস্থা নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক। কেননা হয়তো একজনের স্বামী ঘরে নেই। এ অবস্থায় অন্য কোন পুরুষ ঘরে ঢুকলে সতী মেয়েদের জন্য তা লজ্জাজনক ও আপত্তিকর। অসতী মেয়েদের জন্য লজ্জাজনক না হলেও অপর পুরুষের কথাবার্তা ও চালচলন, অসৎকামনা ও চঞ্চলতায় তাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। পুরুষ ছেলেরা স্বার্থপর। সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী নারীর সান্নিধ্য পেলে যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তারই একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর এরা যে ভগ্নী বা স্ত্রী তার একথা খেয়াল থাকে না। খুব কমসংখ্যক পুরুষ সমাজে থাকে যারা নিবিড় সাহচর্য পেয়েও বন্ধুর সর্বনাশ করে না। এ জন্যই পর্দাপ্রথা নারীর জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আর পুরুষের জন্যও নিজেকে সংযত রাখবার এক সুন্দর ব্যবস্থা। এ নির্দেশ না মানলে দুর্ঘটনা ঘটবেই। বন্ধুর স্ত্রী রক্ষা পাবে না, ভগ্নীর ইজ্জত থাকবে না। পুরুষ চরিত্র হারাবে। মেয়েরাও পুরুষের আকর্ষণীয় কথাবার্তা ও চালচলনে ভুলবেই।

এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট। সালাম সম্ভাষণ ও সংবাদ প্রদান ব্যতীত নিজ গৃহে, নিজ মাতা ও কন্যার বাসগৃহে এমনকি স্ত্রীর শয়নগৃহে বা গোসলখানায় বিনা সংবাদে প্রবেশ করা নিষেধ। কেননা ঐ সময় হয়তো বা তারা অপ্রস্তুত থাকতে পারে। তাই অকস্মাৎ গৃহে প্রবেশ করলে উভয়ের জন্যই লজ্জার ব্যাপার হতে পারে।

নারীদের প্রতি আল্লাহ্ নির্দেশ দান করেছেন যে, প্রয়োজনের সময় যখন তাদের ঘরের বাইরে যেতে হয় তখন পরপুরুষের দৃষ্টি হতে নিজেদের রক্ষার জন্য সমস্ত শরীর এবং মাথা পর্যন্ত এমনভাবে ঢেকে যেতে হবে যেন তাদের সম্পূর্ণ দেহ এবং চেহারা দৃষ্টিগোচর না হয়। চলাফেরার সময় এমন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে দ্রুতগতির জন্য পায়ের শব্দ, অলঙ্কারের জন্য অলঙ্কারের ঝন্‌ঝনানী এবং অসংযতার জন্য কুদৃষ্টি কোন পুরুষের ওপর না পড়ে, যার ফলে পুরুষ আকৃষ্ট হয়। দৃষ্টিকে অবনমিত করা ও শরীর আবৃত করার পেছনে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে তা এর পরেই ইনশা আল্লাহ্ আলোচনা করব। এখন আবরণ ও দৃষ্টির

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওপর ভিন্ন মতাবলম্বীদের কিছুটা আলোচনা এ প্রসঙ্গে তুলে না ধরে পারছি না। কেননা তাঁরা যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য না হলেও আলোচনার বিষয়। তাঁদের মতে,

"স্ত্রী লোকদের বহির্জগৎ হতে অপসারিত করে তাদের ঘরের ভেতর পর্দায় পুরে রাখলে উদ্ধৃত আয়াতের কোন অর্থ (তাহারা কেন নিজেদের নয়নসমূহ অবনমিত করে) বা সার্থকতা থাকে না। বিশেষত স্ত্রীদের পক্ষে বহির্জগতে বিচরণ করা যদি অবৈধ বা নিষিদ্ধ হতো তবে পুরুষদের দেখে তাদের নয়ন অবনমিত করার বা বক্ষের ওপর আবরণী স্থাপন করার আদেশ প্রদত্ত হতো না এবং এটাও বলা হতো না যে, তারা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে। অলঙ্কার ধ্বনি প্রকাশ না করে। এছাড়া স্ত্রীলোকদের পক্ষে যদি সর্বাঙ্গ আবৃত করে পর্দা করা ফরজ হতো তবে আল্লহ্ তাদের শুধু বক্ষের ওপর আবরণী স্থাপন করতে আদশে করতেন না। বরং তার পরিবর্তে তাদের মুখমণ্ডল ও হস্তপদ প্রভৃতি সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখবারই আদেশ করতেন। সুতরাং এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে বর্তমান সময়ে মুসলিম জগতে যে অনিষ্টকর অবরোধ বা পর্দাপ্রথা প্রচলিত হয়েছে যার ফলে নারীদের আলো বাতাসের অতীত করে তাদের অন্তঃপুরে রেখে অহরহ অবরুদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সঙ্গে কোরআন হাদিসের আদেশ বা ইসলামী শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই। স্ত্রীলোকদের পক্ষে পর্দায় থেকে এই বিচিত্র বিশ্বের শোভা সৌন্দর্য সন্দর্শন বা গন্ধ মাধুর্য উপভোগ করা হতে চিরবঞ্চিত হয়ে থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। বরং নিজেদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে কাপড় পরে এবং বক্ষের ওপর আবরণী বা আঁচল জড়িয়ে অনাবৃত বদনে, হস্তপদ ও কণ্ঠ-বাহু খোলা রেখে বহির্জগতে অবাধে বিচরণ করা জায়েজ। ঐরূপ অবস্থায় সভ্যতা ও ভদ্রতার রীতি অনুযায়ী শুধু স্ত্রী-পুরুষের দৃষ্টি অবনত এবং নয়ন মন সংযত থাকলেই আল্লাহর আদেশ পালন এবং তার মর্যাদা সংরক্ষণ করা হবে।"

(মোহাম্মদ আলীর তফসীর)

জনাব মোহাম্মদ আলির যে চিন্তাধারা তা আল্লাহর নির্দেশের অনুকূল নয়। কেননা নারীজাতি মাত্রই তা হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রীষ্টান বা পারসিয়ান যে কোন ধর্মাবলম্বিনীই হোক না কেন, বক্ষের উপর আবরণ দেবেই। এটা স্বভাবজাত একটা অভ্যাস—লজ্জা নিবারণের এক ব্যবস্থা। অসভ্য সাঁওতাল, কোল, ভিল নারীরা যারা মাঠে-ঘাটে, হাটে পুরুষদের সঙ্গে কাজ করে তারা সর্বাঙ্গ অনাবৃত রাখলেও বক্ষের ওপর এবং যৌনাঙ্গের পার্শ্ববর্তী অংশটুকু সর্বদাই ঢেকে রাখে। তাই আল্লাহর তরফ থেকে পুনরায় এ বিষয়ের ওপর নির্দেশ দেবার কারণ থাকতে পারে না বলেই আমরা মনে করি। এ নির্দেশ 'সমগ্র নারী জাতির জন্য হলেও বিশ্বাসিনী ও সতী-সাধ্বী নারীদের জন্যই বিশেষভবে প্রযোজ্য যারা পর্দাপ্রথাকে ধর্ম-উপদেশ বলে স্বীকার করে ও বেপর্দা অবস্থায় চলাফেরাকে অসঙ্গত বলে মনে করে। সুতরাং ওপরে বর্ণিত আয়াতের মর্ম এই যে বিশ্বাসিনী রমণীরা যখন প্রয়োজনের তাগিদে বাইরে যেতে বাধ্য হয় তখন তাদের মাথা এবং সর্বাঙ্গ আবৃত করে চলাফেরা করতে হবে যেন কোন অঙ্গই পুরুষের দৃষ্টিগোচর না হয়। বিনত নয়নে অতি সংগোপনে চলতে হবে। কিন্তু মুহাম্মদ আলী সাহেব এ চিন্তাধারা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি কোরআনের শাব্দিক অর্থ ধরেই ব্যাখ্যা করেছেন, এ জন্য অবশ্য আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। কেননা, কোরআনের শাব্দিক অর্থও যেমন প্রযোজ্য তেমনি নিগূঢ় অর্থও সমভাবেই প্রযোজ্য। কোনটিকেই আমরা বাদ দিতে পারি না। তবে বেশি খুশি হতাম যদি তিনি শাব্দিক অর্থে মূল্য দিয়েই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু দুঃখিত, তিনি তা করেন নি। কোন স্থলে শাব্দিক অর্থের মূল্য দেওয়া তো দূরে থাক বিজাতিদের খুশি করতে মনগড়া মতবাদ দিয়ে আল্লাহর বাণীর অপব্যাখ্যা করতে ছাড়েন নি। এ প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি মতবাদ পাঠকবৃন্দের নিকট তুলে না ধরে পারছি না।

সূরা রহমানের ২৬নং আয়াতে বলা হয়েছে—"ইহার উপরে অবস্থিত সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।"

জনাব মুহাম্মদ আলি সাহেব এখানে শাব্দিক অর্থের ধারে কাছেও ভেড়েন নি। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে পৃথিবীর ওপর অবস্থিত সমস্ত বিষয়ের ধ্বংসের অর্থ—'এক জাতির পতন অন্য জাতির উত্থান।'

৩৩নং আয়াতে বলা হয়েছে—'হে জ্বিন ও মানব দল! যদি তোমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমান্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হও তবে অতিক্রম কর।'

এখানে 'এন্স' অর্থ মানব না ধরে তিনি বলেছেন—আরববাসীরা; আর জ্বিন অর্থ 'জ্বিন' না হয়ে অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৭২নং আয়াতে বলা হয়েছে—"হুরুম মাখছুরাতুন ফিল্ খিয়াম",—অর্থাৎ 'সেই সুলোচনা সুন্দরীগণ পটমণ্ডপসমূহের মধ্যে উপবিষ্টা রহিয়াছে।'

বেহেশতের এ হুরকে' মুহাম্মদ আলি সাহেব মোটেও আমল দেন নি। তিনি এ পৃথিবীর সুন্দরী রমণীদেরই এ 'হুর' অর্থে বুঝিয়েছেন এবং "Pure and beautiful woman'-দেরকেই ইঙ্গিত করেছেন।

আরও কিছু ব্যাখ্যা শুনুন—

"বেহেশ্‌ত ও দোজখের" কথাটি বোঝাতে তাঁকে হিমশিম খেয়ে উঠতে হয়েছে। ইহলোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখই নাকি বেহেশ্‌ত ও দোজখ।

৪৬নং আয়াতে বলা হয়েছে—"এমন যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সন্ত্রস্ত তাহার জন্য দুইটি স্বর্গোদ্যান রহিয়াছে।"

দুইটি স্বর্গোদ্যান অর্থে তিনি লিখেছেন—'ইরাক ও পারস্যের উদ্যান বাটিকা ও উর্বরা ভূমি। সুনীল অর্থ শস্যশ্যামল। দুইটি প্রস্রবণ অর্থ ইরাকের ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রীস নামক নদীদ্বয়। ফল-ফুল, দাড়িম্ব ও খর্জুরগুচ্ছ অর্থ ইরাক ও পারস্যের ফলসমূহ। নির্মীলিত নয়না, পরমা রূপসী, সুলোচনা হুরের অর্থ ইরাক, সিরিয়া ও পারস্যের উচ্চ বংশজাত লজ্জাবতী রূপসীবৃন্দ।"

আয়াত নং ৭৪-এ আছে—"ইহার পূর্বে মানব অথবা জ্বিন তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই।"—এর অর্থে তিনি বুঝেছেন তাহারা নব যৌবন প্রাপ্তা ও অবিবাহিতা কুমারী।

ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ আলি সাহেব। এমন সুন্দর কল্পনাপ্রসূত আলোচনা আমি পূর্বে কোনদিন দেখি নি। আপনার এমন জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মুসলমানগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হলেও অবিশ্বাসী সম্প্রদায় যে মুগ্ধ হতে বাধ্য এতে কোন ভুল নেই।

পর্দা প্রথার ওপর দ্বিমুখী আলোচনা অনেক হয়েছে এবং হবে। এর উপকারিতা এবং অপকারিতা দুটোই আছে। অপকারিতার উপরও যথেষ্ট জোরালো যুক্তি লেখা আছে। অমুসলিম ছাড়াও প্রসিদ্ধ মুসলিম চিন্তাবিদ পণ্ডিতদের লেখাতেও আমরা এ বিষয়ের ওপর আলোচনা দেখতে পাই। বিখ্যাত 'আল্ মারআতুল জাদীদাহ, গ্রন্থের লেখক মান্যবর জনাব কাসেম আমীন বেগ লিখেছেন—

"পর্দার অপকারিতা এই যে, ইহা নারীকে তাহার প্রকৃতিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়; তাহার শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণতা সাধনে বাঁধা দান করে; প্রয়োজনের সময় স্বহস্তে তাহার নিজের জীবিকা অর্জনের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়; স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বিবেক জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হইতে ও নৈতিক বা চারিত্রিক জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে দেয় না ইত্যাদি। তাহা ছাড়া পর্দার অধীনে থাকা অবস্থায় কোন নারীরই সন্তানের উচ্চমানে শিক্ষা-দীক্ষা দানের উপযুক্ত মাত্রারূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না এবং এই পর্দার কারণেই জাতির অবস্থা স্থূল-রোগে আক্রান্ত মানুষের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে।"[১]

১। বঙ্গানুবাদ—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী, কৃত—হাফেজ আজিজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৩৯।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পর্দা প্রথার প্রয়োজন ও উপকারিতার ওপর বিভিন্ন ধরনের আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি—পরেও ইনশা আল্লাহ্ করব। যার যেটা খুশি সেটাই মেনে চলবে। এতে আমাদের আপত্তি করার কিছু নেই। হাদিস, কোরআন ও বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ পর্দার স্বপক্ষে যতই দেওয়া যাক না কেন, পাশ্চাত্য দেশের নারী-পুরুষ তা কিছুতেই মানবে না ও শুনবে না। তেমনি সভ্যদেশের উলঙ্গ প্রথার মতো মূল্যই থাক না কেন আমাদের কাছে তা কোনদিনই গ্রহণীয় হবে না, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ ও রসুলের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে। তবে হ্যাঁ! একটি কথা সত্য ও চির সত্য যে, প্রকৃতির বিধান লঙ্ঘন করলে তার পরিণতি ভোগ করতেই হবে। নারীকে তার প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঠেলে দিলে সে আর নারী থাকবে না—পুরুষের রূপ ধরবে। নারীর মাঝে যদি নারীত্বই না থাকে তবে সে নারী জন্মে লাভ কি? চলুন দেখি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্দা প্রথার ওপর আলোচনা করি এবং এর উপকার এ অপকার জেনে নিই।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পর্দার গুরুত্ব

কোরআন ও হাদিস থেকে আমরা পর্দার নির্দেশ কিছুটা দেখলাম। এর উপর আল্লাহ্ ও রসুলের বহু নির্দেশ রয়েছে; সেগুলো তুলে না ধরে আমরা শুধু উদ্ধৃত সূরা নূরের কয়েকটি আয়াত ধরেই এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করছি।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি—দৃষ্টিকে অবনমতি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং গুপ্তাঙ্গকে সংরক্ষিত করারও আদেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেশভুষা ও চালচলনে নারীকে সতর্কতা অবলম্বন করতেও হুকুম দেওয়া হয়েছে।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে ব্যভিচার চক্ষু থেকেই জন্মলাভ করে। কিভাবে সে আলোচনা অনেকটা করেছি। তবু আরও আলোচনার প্রয়োজন। পুরুষের দৃষ্টি নারীর চোখ ও দেহ কোষের ওপর পতিত হলে এক রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয়। ফলে নারীর দেহ-মনে প্রবল ঝড় বইতে থাকে এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গর্ভবতী মেয়েদের ব্যাপারে এটা এত অধিক ক্রিয়াশীল হয় যে এর প্রতিফলিত রশ্মি শুধু দেহ কোষেই নয়—জরায়ুর অভ্যন্তর ভাগ ভেদ করে গর্ভস্থ সন্তানদের ওপরও পতিত হয়। কেননা এ সময় নারীদেহের দুর্বলতার জন্য প্রতিরোধ শক্তি (Resistibility) অত্যন্ত কমে যায়। এ জন্য গর্ভ অবস্থায় নারী–মনে যে ছবি দাগ কাটে, গর্ভস্থ সন্তান তদনুরূপই হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় স্বামী-স্ত্রী দুজনই সুশ্রী হওয়া সত্ত্বেও স্বন্তান অনেক সময় কালো ও কুৎসিত হয়।

নারী চুম্বকধর্মী, আর পুরুষ বিদ্যুৎধর্মী। নারীর ধর্ম আকর্ষণ করা, আর পুরুষের ধর্ম বিকাশ করা। তাই দৃষ্টি যেখানে পতিত হয় নারী সেখান থেকেই কিছুটা সংগ্রহ করে। চাঁদ, সূর্য, ফুল, সুন্দরী নারী, সুন্দর পুরুষ যে মনোরম বস্তুতে নারীর দৃষ্টি পতিত হলে গর্ভস্থ সন্তান সেই রূপই ধারণ করে। অর্থাৎ নারীর চিন্তাধারার ওপর ভবিষ্যৎ সন্তানের সৌন্দর্য, রূপ-গুণ ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে। হিন্দুরা গর্ভস্থ নারীকে সুন্দর সুন্দর ছবি ও মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি ও তাঁদের জীবনচরিত পড়তে দেয়। মুসলমানদের মতে হাদিস, কোরআন, পয়গম্বর ও মহামনীষীদের জীবন আলোচনা, সুন্দর জিনিস দেখা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নামাজ, রোজা ইত্যাদি করা বিধেয়। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা যদি সব সময় অটুট থাকে তাহলে একটি সুন্দরী, রোগা কুৎসিত নারীর পেট থেকেও বলিষ্ঠবান, মেধাবী ও ধার্মিক ছেলের জন্ম হয়। পর্দার বাইরে গেলে নারী তার এ সুচিন্তা হারিয়ে ফেলে। এছাড়া অনাবৃত নারীর দেহের ওপর অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টি এত প্রখরভাবে পতিত হয় যে তা নারীর দেহ-কোষে এক বিবর্তন

সৃষ্টি করে। ফলে নারী তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট করে। এজন্যই দেখা যায় যে পর্দানশীলা নারী বেপর্দা নারীর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী, লাবণ্যময়ী ও আকর্ষণকারিণী হয়ে থাকে। তাই কোরআনে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দেহকে আবৃত রাখতে ও দৃষ্টিকে অবনমিত করতে।

প্রয়োজনবশত যখন নারীকে ঘরের বাইরে যেতে হয় তখন তাকে বিশেষভাবে এ নিয়ম মেনে চলতে হবে; নইলে নারী তার নারীত্ব হারিয়ে পুরুষের স্বভাব ও চরিত্র পেতে থাকবে। দেহের পেলবতা ও কমনীয়তা হারিয়ে নারীত্বের অবমাননা করে বিকর্ষণ সৃষ্টি করবে। উৎকৃষ্ট উদাহরণ গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি নারী। পর্দাপ্রথা মেনে চললে, দেহকে ঢেকে রাখলে পুরুষের দৃষ্টি নারী দেহে কোন ক্রিয়া করতে পারবে না।

যে নারী পর্দার অন্তরালে থেকে নিজ দেহ ও সতীত্ব বজায় রাখে সে নারীর পেট থেকে নবী, পয়গম্বর, ওলি, গাউস, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, জজ, ব্যারিস্টার, কবি-সাহিত্যিক ও প্রফেসারের জন্ম হয়। প্রতিটি মনীষীর জন্মবৃত্তান্ত নিলে দেখা যায় যে তাঁদের মায়েরা কেমন সতী-সাধ্বী, স্বাস্থ্যবতী, দানশীলা, ন্যায়পরায়ণা ছিলেন। এমন কোন ইতিহাস আছে কিনা জানি না যে, ব্যভিচারিণী, পর্দাহীনা নারীর পেট থেকে কোন সুসন্তান জন্মলাভ করেছে।

যে কারখানা হতে মূল্যবান জিনিস তৈরি হয় সে কারখানার যদি যত্ন নেওয়া না হয়, এর কলকব্জা যদি বিকল হয়, অযত্নে যদি রোদ-বাদলে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে দেওয়া হয় তাহলে এর Productive Capacity যেমন নষ্ট হয়ে যায় তেমনি নারীকে পর্দা থেকে বের করলে তার মূল্যবান কারখানাটিও মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যায়।

হীরা, জহরত, মণি-মুক্তাকে ঘরের নিভৃত কোণে বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে সুন্দর আবরণের মাঝেই রাখা হয়। লোহা, তামা ও সীসার মতো উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা হয় না। কারণ, যার যেমন মূল্য তার রক্ষাব্যবস্থাও তেমনি সুন্দর। চাকচিক্যকে রক্ষা করতে, গুণাগুণের মূল্য দিতে সাবধানতারই প্রয়োজন। অসাবধানতা সৌন্দর্যকে যেমন বিনষ্ট করে, উন্মুক্ততা মানকে যেমন হেয় করে, স্পর্শতা বিশুদ্ধতাকে যেমন ধ্বংস করে, তেমনি নারীর অসাবধানতা, উলঙ্গতা ও পর্দাহীনতা নারীকে তার মূল্য, রূপ ও গুণাগুণ হতে বঞ্চিত করে।

মানুষ ও জীবজন্তু মাত্রই এক অবলুপ্ত ধ্বংসকারী কীট দ্বারা আক্রান্ত হয়, যা দেহ–অভ্যন্তরে ধীরে এবং সঙ্গোপনে কাজ করে। এ জন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, আস্ফালন ও কুচিন্তা মাথায় আসে। নর-নারীর দেহ এ কীট থেকে মুক্ত নয়। মানসিক অশান্তি, দুর্বলতা, অস্থিরতা, পঙ্গুত্ব, ভয়-ভীতি এসব কীটেরই ক্রিয়া। আর এগুলোর সৃষ্টি হয় দর্শন থেকে। যখন কোন নারী বা পুরুষ একজন অন্যজনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন দুজনের দেহে যে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয় তা মস্তিষ্কের কোষসমূহে মৃদু মৃদু আঘাত হানে। ফলে স্বভাবতই এক আকর্ষণ আসে—এ আকর্ষণ থেকে কুচিন্তার সৃষ্টি হয়। এ কুচিন্তার ফলেই কীটগুলো সবল হয়। তাই মানসিক ব্যাধি ধীরে ধীরে এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পায়। পর্দাই একমাত্র ওষুধ যা নর-নারীকে এ অশুভ বিদ্যুৎ খেলা থেকে মুক্ত রাখে। গোপনীয়তা যেমন মূল্যবৃদ্ধি করে, তেমিন মান-সম্ভ্রম ও সৌন্দর্যকেও অটুট রাখে। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বাস্তব জগতে ও সৃষ্টি বৈচিত্র্যেও আমরা তাই দেখতে পাই।

যে টাকশাল দিয়ে টাকা তৈরি করা হয় তা যদি সর্বসাধারণের জন্য খোলা রাখা যেত, তাহলে জাল টাকায় যেমন দেশ ভরে যেত, তেমনি নারীর দেহ মেশিনটি হাটে-বাজারে সস্তায় পাওয়া গেলে জারজ সন্তানেও এ পৃথিবী ভরে যেত। জাল টাকা যেমন আসল টাকার মান নষ্ট করে দেয়, জারজ সন্তানও তেমনি মূল্যবান মানবের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফুলের পাপড়ী যেমন ভাবী ফলকে ঢেকে রাখে এবং রোদ-বাদলের হাত থেকে রক্ষা করে, তেমনি সৃষ্টির শুরু থেকেই একটি পর্দার আবরণে জরায়ুর অভ্যন্তরে শুক্রকীট ও ডিম্বাণুকে শীত, গ্রীষ্ম, আলো-বাতাস ও বিষাক্ত বস্তুর স্পর্শ থেকে মুক্ত রাখে। তাই ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সুন্দর মানুষরূপে বের হয়। এমন বৈজ্ঞানিক কৌশল সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউ জানেন না। তাঁরই নির্দেশ, মানুষ সৃষ্টির এ সুন্দর ও মূল্যবান কারখানাটিকে যত্নে, অতি যত্নে ও গোপনে সংরক্ষণ করবে। তবেই হবে মহান স্রষ্টার সুন্দর ফ্যাক্টরিতে সুন্দর মানুষ।

ব্যভিচার

নারী-পুরুষের অবৈধ মিলনের নামই ব্যভিচার। এ ব্যভিচার চলে আসছে জন্ম-জন্মান্তর থেকেই। রোধ কেউ করতে পারে নি। সমাজের কঠোর শাসনে, আইনের চাপে, ধর্মের প্রবল বাধায় হয়তো কোন দেশ বা জাতির মধ্যে কম দেখা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিলোপ পেয়েছে এমন ইতিহাস আমি জানি না। তবে একথা নিশ্চয়ই জানি যে, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে যে হারে ব্যভিচার চলছে তার তুলনায় প্রতীচ্যের দেশে তুলনামূলক কম গতিতে চলছে। আর এ প্রসঙ্গে এটাও আমাকে বলতে হচ্ছে যে, অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলমান জাতির মধ্যে ব্যভিচারের মাত্রা আরও অনেক কম। কেননা অন্যান্য জাতির তুলনায় মুসলমানগণ অবাধ মেলামেশার সুযোগ কম দিয়ে থাকে। তাছাড়া পর্দাপ্রথা মেনে চলা এবং ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী মান-সম্ভ্রম বজায় রাখাকেও কৃতিত্ব মনে করে।

ব্যভিচারের শাস্তি বাইবেল ও কোরআনে একইরূপ। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আল্লাহর বিধান ও হজরতের বিধানকে অত্যন্ত ভয় করে। কিন্তু খ্রীষ্টানেরা যীশুখ্রীষ্টের অন্য সব উপদেশ কিছুটা মেনে চললেও ব্যভিচার সম্বন্ধে 'রজম' করার যে নির্দেশ দিয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। ব্যভিচারকে তারা কিছুই দোষণীয় বলে মনে করে না। তাই ব্যভিচারের মাত্রা খ্রীষ্টানের মধ্যে যেমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে অন্য কোন জাতির মধ্যে তেমনভাবে পায় নি। পরিণত বয়সে ছেলেমেয়েদের মিলনকে তারা উৎসাহিত করে। স্কুল-কলেজে এ বিষয়ে শিক্ষাও দেওয়া হয়। আইনের মাধ্যমেও যৌন মিলনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, জানায়-অজানায়, যার যেরূপ ইচ্ছে সে সেরূপ ছেলে বা মেয়ে পছন্দ করে খেলাধুলা করে, নৃত্য করে ও যৌন-তৃষ্ণা মেটাতে সঙ্গম করে। এসব তাদের জন্য অপরাধ নয়।

হিন্দু সমাজে ব্যভিচারের মাত্রা মুসলিম সমাজের চেয়ে অনেক বেশি। ব্যভিচারের নানা ধরণ, ভঙ্গি ও কৌশল দেখলে সত্যি দুঃখ হয়। কেননা পরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের ব্যভিচার অপরাধজনক হলেও প্রকৃতিগত বলতে হয়। কেননা ঐ সময় যে কোন জাতির যে কোন নর-নারীই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং ধর্মের শাসন, সামাজিক শাসন ও আইনের দণ্ডকে ভুলে যায়। নারী-পুরুষের যৌনাকর্ষণ দুজনকেই উন্মাদ করে তোলে। তাই ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। কিন্তু একটি গোটা সমাজে ধর্মের নামে ভয় দেখিয়ে যে ব্যভিচার চলতে পারে এ তত্ত্ব আমার জানা ছিল না। আজই আবুল হাসানাৎ সাহেবের যৌনবিজ্ঞান পড়ে যেমন অবাক হয়ে গেলাম, তেমনি আনন্দও পেলাম। সৃষ্টি-রহস্য বুঝে কার সাধ্য! একই মাটিতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে। অথচ কৃষ্টি, সাধনা, ধ্যান, ধারণা, ধর্ম-কর্ম সবই পৃথক।

প্রাচীন ভারতে অশিক্ষিত হিন্দু-সমাজে ধর্মযাজকগণ নব-বিবাহিতা পরস্ত্রীকে ভালভাবে উপভোগ না করে স্বামীর হাতে দিত না। ধর্মের নামে পরস্ত্রীকে সেবাদাসী করে রাখা, সন্তান জন্মাবে এই মিথ্যা আশায় বন্ধ্যা ও সুন্দরী যুবতী নারীদের সঙ্গে ইচ্ছামতো সঙ্গম করা, কুমারী নারীদের সত্ত্বর বিবাহ হবে এই কুহক মন্ত্রে বিশ্বাসিনী করে ব্যভিচার করাই ছিল তাদের প্রচলিত রীতি। অনেক জায়গায় ধর্মের নামে এমন ব্যভিচার তাদের মধ্যে আজও চলছে। কোন ধর্মের দুর্নাম করা আমার উদ্দেশ্য নয়। শত্রুতার সৃষ্টি করে একটা দেশে বিশৃঙ্খল পরিবেশ টেনে আনবার পক্ষপাতি আমি নই। ভালকে ভাল বলবই; কিন্তু মন্দকে ভয়ে বা লজ্জায় ভাল বলব এ স্বভাব আমার নেই। ব্যভিচার নারী-পুরুষ, সে মুসলমানের মধ্যে হোক, খ্রীষ্টানদের মধ্যেই হোক, আর হিন্দুর মধ্যেই হোক—ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অনাদৃত হওয়াকেই আমি প্রশংসা করি। সমাজে শৃঙ্খলা ও শান্তি আনতে হলে, দাম্পত্য জীবনকে মধুময় করে গড়ে তুলতে হলে, ব্যভিচার প্রথাকে চিরতরে নির্মূল করতে হবে। ব্যভিচারী সে শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, আলেম হোক, পুরোহিত হোক, মঠাধ্যক্ষ হোক বা ব্যাপটিস্ট হোক একই প্লাটফরমে তুলে ধর্মবিধি অনুযায়ী 'রজম' করতে হবে। 'রজম' কি সেটা পরে উল্লেখ করছি। এর পূর্বে দেখি এসব ভণ্ড ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের কাণ্ডকীর্তি। শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর প্রণীত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এ লিখেছেন—"একশত বৎসর পূর্বেও মেদিনীপুর জেলায় গুরুপ্রসাদী' প্রথা ছিল। অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যাকে প্রথমবার শ্বশুর বাড়ি পাঠাইবার পূর্বে তাহাকে গুরুর কাছে পাঠাইয়া 'প্রসাদ' করিয়া দেওয়া হইত। জামাতা গুরুর প্রসাদ পাইতেন।"[১]

শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' এরূপ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—"তাহাতে গুরু শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া অন্দরমহলে ভক্তিমতি নারীদের সহিত বস্ত্রহরণ প্রভৃতি বাছা বাছা লীলা অভিনয় করিতেন।"[২]

এমন প্রথা গুজরাট, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে 'বল্লভ আচারী বৈষ্ণব' সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও চালু আছে।

সেনগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—"দশ মহাবিদ্যার প্রতীক রূপে দশটি অজাত ঋতু বালিকাকে স্নান করিয়ে বিবস্ত্রবেশে বিস্রস্ত কেশে মৃত্তিকা নির্মিত ছোট ছোট বেদিতে বসানো হয় এবং ফুল, বিল্বপত্র ও আতপ চাউল সহযোগে তাদের যোনীদেশের পূজা করা হয়। এইভাবে তাদের যোনীদেশে গৌরীপীঠের প্রতিষ্ঠা হলে শিবরূপী এক ভৈরব তাদের কৌমার্য হরণ করেন। এই ভৈরবের উত্থিত লিঙ্গকে দুধ ও গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করা হয়—তারপর তিনি নির্মল চিত্তে শিব মহিমায় সমাবিষ্ট হয়ে প্রত্যেকটি মহাবিদ্যার গৌরীপীঠে শিব প্রতীক সন্নিবিষ্ট করেন। সাধারণত একজন ভৈরবের পক্ষে এতগুলি গৌরীর কৌমার্য ভেদ সম্ভব নয় বলে তিনি প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। অর্থাৎ তাঁর প্রিয় অনুচরদের কারুর লিঙ্গদেব স্পর্শ করে দেন। তখন একদিকে অপরিণত বালিকাদের আর্তনাদ, অন্যদিকে শিবানুচরদের সংকীর্তন শুরু হয়। আর তারই ভেতর গৌরীগমন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই অনুষ্ঠানের রক্তে নিসিক্ত ন্যাকড়া সিদ্ধ বস্ত্ররূপে সমাজে চলে। রোগবিনাশ, শত্রুনিপাত, মামলা জয়, পরীক্ষা পাস ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ ফলপ্রদ বিশ্বাসে অনেকে তা সংগ্রহ করে রাখেন। মাদুলিতেও ধারণ করেন। কিন্তু জিনিসটা কি তা হয়তো অনেকেই জানেন না।"[৩]

মহামনীষী, জ্ঞানী-গুণী, হিন্দু লেখক ভাইয়েরাই তাঁদের সমাজের এ করুণ চিত্র তুলে

---

১ ও ৩। সংগৃহীত—আবুল হাসানাৎ কর্তৃক লিখিত যৌনবিজ্ঞান। অষ্টম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৮৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধরেছেন। এমন অযাচিত, বর্বরোচিত ও ঘৃণিত প্রথা অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায় না। বীর্যকে সরবত করে সুধা পান করা, শিবলিঙ্গ পূজা করা, নাবালিকা মেয়েদের ধর্ষণ করে রক্তাক্ত করা, ঋতুসিক্ত ন্যাকড়াকে 'বস্ত্র' বলে একতারাতে এঁটে গান গাওয়া নাকি পুণ্য ও ধর্মের কাজ। হিন্দু ভাইদের কাছে এ প্রথা আদরণীয় ও ধর্মীয় বলে গণ্য হলেও কোন জাতির কোন মনীষীই তার স্বীকৃতি দেবে না বা এর প্রশংসা করবে না।

খ্রীষ্টান ও ইহুদিদের মধ্যেও ব্যভিচার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কিন্তু নাবালিকা নারীদের নিয়ে এমন বীভৎস কাণ্ড করতে শোনা যায় না। বরং খবরের কাগজে দেখা যায় যে, নাবালিকা নারী ধর্ষণ করলে দেশের আইন তাদের ছাড়ে না। গুরুতর দণ্ডই তাদের ভাগ্যে জোটে।

হিন্দু ধর্মপ্রণেতাদের মতে, ব্যভিচারে নারীদের সতীত্ব নাশ হয় না। কারণ তারা দেবীতুল্যা। তাদের ধর্মগ্রন্থ এর সাক্ষি। যাজ্ঞবল্ক বলেছেন—

"স্ত্রী ন দুষ্যতি জারেন নাগ্নিদর্হন কর্মনা।
নাপো মুত্র পুরীবাভ্যাং ন দ্বিজো বেদকর্মনা।"[১]

অর্থাৎ "অগ্নি যেমন দহনকর্মে দুষ্ট হয় না, মলমূত্রের স্পর্শে যেমন জল দুষ্ট হয় না, ধর্মকার্য ব্যপদেশে (হিংসাদি দ্বারা) যেমন দ্বিজ দুষ্ট হয় না, তেমনি জার অর্থাৎ প্রেমিকের মিলনের দ্বারাও স্ত্রীর দোষ হয় না।"

অন্যত্র বলা হয়েছে—"স্ত্রীগণ স্বভাবপবিত্র, কোন কিছুতেই তারা দূষিত হয় না। মাসে মাসে তাদের রজঃ সমস্ত দুষ্কৃতির অবসান ঘটায়।"

"মাসি মাসি রজস্তাসং দুষ্কৃতান্য পকষিত
ব্যভিচারা দৃতৌ শুদ্ধিঃ।"[২]

অর্থাৎ "ঋতু পুনরাবির্ভাবেই ব্যভিচারের দোষ কাটিয়া যায়।"

আমি বুঝতে অক্ষম, ধর্মের নামে এমন নির্দেশ কিভাবে দেওয়া হয়। ধর্মগুরু ও ধর্মপ্রণেতাদের ওপরই নির্ভর করে সমগ্র জাতির উন্নতি ও অবনতি, পাপ ও পুণ্য, পরকালের সুখ ও দুঃখ। ধর্মের বাঁধন ও কড়াকড়ি না মানা পৃথক কথা কিন্তু ধর্মের নামে ব্যভিচার সত্যি দুঃখজনক।

শুধু ভারতেই যে এমন প্রথা বিদ্যমান তা নয়। অন্যান্য দেশেও এমন কুপ্রথা ছিল। জানি না এখন আছে কিনা। গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে ধর্মযাজকগণ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ও নারীদের নিয়ে যদৃচ্ছভাবে উপভোগ করতে এমন সব উদ্ভট প্রথা আবিষ্কার করতো, যা শুনলে সভ্য মানুষ ঘৃণা না করে পারবে না। হেরোডোটাস ব্যাবিলনে সংঘটিত এমন সব ঘটনার কিছু লিখেছেন। তাঁর লেখা হতে জানা যায় যে, মাইলিতা (ব্যাবিলনীয়দের রতিদেবী) দেবীর মন্দিরে প্রতিটি নারীকেই একবার যেতে হতো। সেখানে গিয়ে তারা মন্দির প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধভাবে বসে থাকত। অসংখ্য পুরুষ সেখানে ভিড় জমাতো এবং এসব নারীদের মধ্য হতে যাকে যার ভাল লাগে তাকে সে পছন্দ করত। পছন্দ করবারও একটি ধারা ছিল। ইশারা-ইঙ্গিতে নয়, হাত ধরে নয়। একটি রূপার টাকা যাকে পছন্দ হতো তার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলত, 'তোমার ওপর মাইলিতা দেবীর অনুগ্রহ হোক'। একথা বলার পর নারীটি খুশি হয়ে পুরুষের হাত ধরে নির্জন স্থানে চলে যেত এবং ইচ্ছামতো

১ ও ২। সংগৃহীত—আবুল হাসানাৎ কর্তৃক লিখিত যৌনবিজ্ঞান। দশম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৬১।

ব্যভিচার করত। এতে নাকি তাদের সমস্ত পাপ মার্জনা হতো। ব্যাবিলনীয়েরা এ অনুষ্ঠানকে সাড়ম্বরে পালন করত এবং এর মর্যাদা দিত। যেহেতু এটা তাদের জন্য বৃহৎ এক ধর্মানুষ্ঠান, তাই পছন্দ-অপছন্দের কোন বালাই ছিল না। কালো, কুৎসিত যে ধরনের পুরুষই রৌপ্যমুদ্রা কোলের ওপর নিক্ষেপ করবে, রাণী হলেও তাকে সাদরে গ্রহণ করতেই হবে এবং মাইলিতা দেবীর সম্মানে ব্যভিচার করে স্বর্গের পথ উন্মুক্ত করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত কোন কুৎসিত বা বৃদ্ধা নারীর ভাগ্যে এ আশীর্বাদ জুটবে না, বছরের পর বছর হলেও নারীকে ঐ মন্দিরেই অপেক্ষা করতে হবে—এটাই ছিল নিয়ম। এ নিয়মই ছিল ধর্ম। আর এ ধর্মই ছিল মহা আনন্দের। ধর্মের নামে এমন ব্যভিচার আরও কত দেশে যে চলছে কে তার খোঁজ রাখে?

কোন ধর্মগুরু বা নবী পয়গম্বর ব্যভিচারকে সম্মান করেন নি। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—"অন্তঃকরণ হইতে সমস্ত কুচিন্তা, নরহত্যা, লাম্পট্য, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য ও নিন্দা বাহির হইয়া আসে এই সকলই মানুষকে অপবিত্র করে। অধৌত হস্তে মানুষকে অপবিত্র করে না।"

(বাইবেল ঃ মথি, ৫/১৯-২০)

অনুরূপ একটি উপদেশ আমরা দেখতে পাই তৌরাতে, সেখানে হজরত মুসা (আঃ) বলেছেন—'নরহত্যা করিও না। ব্যভিচার করিও না। চুরি করিও না। তুমি প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীতে লোভ করিও না। প্রতিবেশীর গৃহে, কি ক্ষেত্রে কিংবা তাহার দাসে বা দাসীতে কিংবা তাহার গরুতে বা গর্দভে, প্রতিবেশীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।"[১]

হজরত মুহাম্মদ বলেছেন—

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন আমি নবী (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে রসুলুল্লাহ! কোন্‌টি আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা গর্হিত পাপ? তিনি বলিলেন, 'যদি তুমি আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন কর। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' সে বলিল, অতঃপর কি? তিনি বলিলেন, 'যদি তুমি তোমার সন্তানকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা কর।' সে বলিল, অতঃপর কি? তিনি বলিলেন, 'যদি তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার কর।'[১]

ওপরে বর্ণিত বাণীটির শেষোক্ত লাইনটি ধরে অনেকেই হয়তো অপব্যাখ্যা করে বলতে পারেন যে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে হজরত ব্যভিচার করতে নিষেধ করেছেন; তাই কুমারী নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে দোষ নেই। এ অপব্যাখ্যা যাঁরা করেন, তাঁরা মারাত্মক ভুল করবেন। কেননা আপন স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোন নারীর সঙ্গে তা স্বজাতি হোক, বিজাতি হোক, কুমারী হোক বা বিবাহিতা হোক, সধবা হোক বা বিধবা হোক, সঙ্গম করলেই তা ব্যভিচার হবে; ব্যভিচারের ওপর হজরত (দঃ)-এর বিভিন্ন বাণী ধরে বিশ্লেষণ করলেই তার জবাব পাওয়া যায়। পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত বাণীগুলো এর সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন—

(১) "নর-নারীর অবৈধ সম্মিলনের নামই ব্যভিচার।"[২]

(২) "যে ব্যক্তি আমার জন্য শ্মশ্রু ও গুম্ফের মধ্যবর্তী জিনিস অর্থাৎ মুখ এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিস অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গ সম্বন্ধে জামিন থাকে, আমি তাহার জন্য বেহেশ্‌তের জামিন থাকি।"[৩]

১। তৌরাত (বাইবেল)—দ্বিতীয় বিবরণ। মোশীর দ্বিতীয় বক্তৃতা পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৫/১৭-২১।
১। সহীহ বুখারী—তর্জমা পূর্বে বর্ণিত। কোরানের ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ১৫৭/৫৮।
২ ২-৩। সংগৃহিত হাদিসে র আলো। ২য় খণ্ড।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবশ্য এ কথাও আমাকে বলতে হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে যারা ধর্মে বিশ্বাসী তারা যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন ব্যভিচারের সমর্থন যোগাবে না। হিন্দুদের মধ্যেও যারা আভিজাত্যকে বজায় রেখেছে, মান-ইজ্জতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে, শিক্ষার মর্যাদা দিয়েছে, মহাভারত ও বেদবাণীকে সম্বল করেছে তাঁরা বৈষ্ণব, সহজিয়া, বামাচারিতান্ত্রিক, কর্তাভজা, কাঁচুলিয়া, বিন্দুসাধক প্রভৃতি সাধারণ ও নিচু শ্রেণীর হিন্দু-সমাজের প্রথাকে মেনে নেয় নি। তাদের মেয়েদের এমন অত্যাচার করার সাহসও গুরুদেবদের হয় নি এবং আজও হচ্ছে না। সতীত্বের মর্যাদা এদের কাছে অনেক বেশি। সীতা, সাবিত্রী ও বেহুলাকে স্মরণ করে তারাও সতীত্বকে বজায় রাখে; রাজপুত রমণীরা সতীত্বকে বজায় রাখতে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, অভিজাত বংশের মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছে। এখনও দেখা যায়, স্বামীর মৃত্যুর পর মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্য পরিত্যাগ করে, আত্মাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে তারা সতীত্ব টিকিয়ে রাখে। মহাভারতের মহা উপদেশ ও বেদ অনুযায়ী ব্যভিচার নিষিদ্ধ।

মনু বলেছেন—"স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি ব্যভিচার করিবে না। সংক্ষেপে ইহাই তাহাদের পরম ধর্ম। বিবাহ হইবার পর স্বামী-স্ত্রী বিয়োগপ্রাপ্ত হইলেও যাহাতে কেহ কাহারো প্রতি ব্যভিচার না করেন সে বিষয়েও তাহারা নিত্য যত্ন করিবেন।"[১]

এবারে আমরা সর্বধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহান আল্লাহর নির্দেশ দেখি। তিনি বলেছেন—

(১) "হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! ইহা তোমাদের জন্য বৈধ নহে যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদিগের উত্তরাধিকারী হও।"[২]

(২) "নিশ্চয়ই, বিশ্বাসীবৃন্দ সুফল প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহরা স্বীয় নামাজে বিনীত হয় এবং যাহারা অসত্য হইতে বিমুখ হয় এবং যাহারা জাকাত প্রদান করে এবং যাহারা স্বীয় গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণ করে তাদের সহধর্মিনীগণের ও তাহাদের দক্ষিণহস্ত যাহাদের অধিকারী তাহাদের সমক্ষে ব্যতীত, অনন্তর তাহারা তিরস্কৃত হইবে না।"[১]

ব্যভিচারের প্রকারভেদ

বৈধ স্ত্রী বা বৈধ দাসী ছাড়া অপর নারীর সঙ্গে সঙ্গম বা বৈধ স্বামী বা বৈধ প্রভু ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হওয়াকেই জেনা বা ব্যভিচার বলা হয়। 'জেনা' শব্দটি 'জানি' বা 'জানিয়া' হতে নেওয়া হয়েছে। 'জানি' অর্থ ব্যভিচারী পুরুষ এবং 'জানিয়া' অর্থ ব্যভিচারিণী নারী।

অবৈধভাবে নারী-পুরুষের দৈহিক মিলন ছাড়াও জেনা হতে পারে, যেমন কু-দৃষ্টিতে তাকালে চোখের জেনা হয়। হাত দ্বারা কামভাবে নারীদেহ স্পর্শ করলে হাতের জেনা হয়; আমাদের নবী (দঃ) বলেছেন—"পরপুরুষ ও পরনারীর মধ্যে কামভাবে স্পর্শ করা, পরস্পরের উদ্দেশে কু-কথা বলা এবং পরস্পরের সম্বন্ধে অন্তরে কু-ভাব পোষণ করাও জেনার পর্যায়ভুক্ত।" তাই এ সমস্ত দুশ্চিন্তা ও দুষ্কর্ম হতে তিনি বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন।

১। মনুসংহিতা। সংগৃহীত, যৌনবিজ্ঞান, কৃত পূর্বে বর্ণিত। পৃষ্ঠা ৩৬৩।
২। কোরআন ঃ সূরা নেসা, আয়াত ১৯।

সমমৈথুন ঃ নর-নারীর অবৈধ মৈথুন ছাড়াও মৈথুন হতে পারে। যেমন, পুরুষে পুরুষে মৈথুন। একে বলে পুংমৈথুন বা সমমৈথুন। এ প্রথা আমাদের দেশের চাইতে পাশ্চাত্য দেশেই বেশি ঘটে থাকে। এছাড়া যে দেশের নারী পর্দানশীলা বা দুষ্প্রাপ্য, সেখানে পুরুষে পুরুষে মৈথুন খুব বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে। হোটেলের বয়-বাবুর্চি ও সৈনিকদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এ প্রথা চলে আসছে। ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে হজরত লুত পয়গম্বরকে আল্লাহ্পাক পাঠিয়েছিলেন মানুষকে অশ্লীলতা ও অনাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে। কোরআন এর সাক্ষী—

"এবং লুত যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা কেন এরূপ অশ্লীলতা করিতেছ—পৃথিবীতে যাহা কেহই তোমাদের পূর্বে করে নাই? নিশ্চয়ই তোমরা কু-প্রবৃত্তির বশে নারীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষদিগের প্রতি উপনীত হইতেছ: বস্তুত, তোমরা এক অপকর্মী সম্প্রদায়। এবং এতদ্ব্যতীত তাহার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল না যে তাহারা বলিয়াছিল তোমাদের পল্লী হইতে উহাদিগকে বিহর্গত করিয়া দাও। নিশ্চয় তাহারা পবিত্রতা অন্বেষণ করিয়া থাকে। অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তদীয় বংশাবলীকে উদ্ধার করিয়াছিলাম কারণ সে পশ্চাদ্বর্তীদিগের অন্তর্গত ছিল। এবং আমি তাহাদের উপর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়াছিলাম। অতঃপর দেখ পাপীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে।"

(সূরা আরাফ, আয়ত ৮০-৮৪)

কোরআনের উদ্ধৃত বাণী হতে দেখা যায় যে হজরত লুত (আঃ)-এর পূর্ববর্তী যুগে পুরুষে পুরুষে মৈথুন হয় নি। কিন্তু তাঁর সময় হতেই এমন কদর্য ও অশ্লীল কার্য হতো যার জন্য আল্লাহ হজরত লুত (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন।

হজরত লুত (আঃ) ছিলেন হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সমসাময়িক এবং তাঁরই বংশজাত ভ্রাতুষ্পুত্র। বাইবেলে হজরত লুতকে কোথাও সৎকর্মশীল ও সত্যপরায়ণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আবার তৌরাত ও ইঞ্জিলের বিভিন্ন অংশে তাঁকে ব্যভিচারী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন পয়গম্বরের সম্বন্ধে এরূপ মতবাদত ও জঘন্য উক্তি চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রাণেই আঘাত হানবে।

কোরআনের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই আমরা হজরত লুত (আঃ)-এর আবির্ভাব ও তাঁর কার্য-পদ্ধতির ব্যাখ্যা করব।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সময় তাঁরই একজন প্রতিনিধি হিসাবে সদোমবাসী ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অত্যাচারী ও ব্যভিচারী সম্প্রদায়কে সুপথে আনবার জন্যই তাঁকে নবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল। সে সময় পুরুষগণ নিজ নিজ স্ত্রী রেখে অন্য পুরুষের সঙ্গে মৈথুন করাতেই বেশি আনন্দ পেত। এ মৈথুনের প্রতি তারা এমন লোভী হতো যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। নারীগণ পুরুষের এহেন কার্যে মনোব্যথা পেত, তেমনি পুরুষের দ্বারা যৌন-ক্ষুধা মেটাতে না পেরে অসহ্য জ্বালায় দিন কাটাত। হজরত লুত (আঃ) পুরুষের এই অবৈধ আচরণ ও নারীদের মনঃকষ্ট দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ঐ দুষ্কৃতকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রচার করলেন যে পুরুষে পুরুষে মৈথুন নিতান্তই ঘৃণিত ও জঘন্যতম অপরাধ। এমন ঘৃণিত কাজ ইতিপূর্বে কোন সম্প্রদায়ই করে নি। হজরত লুত (আঃ)-এর সতর্কবাণীতে তারা জ্ঞানলাভ করা দূরে থাক, তাঁকে সপরিবারে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবার সংকল্প করল।

পশু সম্প্রদায়ের এমন নিষ্ঠুর সংকল্প দেখে আল্লাহ্ সহ্য করবেন কেন? সৃষ্টজগতে একটি ধারাবাহিক সুশৃঙ্খল নিয়ম আছে। পুরুষের জন্য জোড়া করে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষের আনন্দ ও প্রেমের খোরাক জোটাতেই নারীর বুকে প্রেম ও চোখে-মুখে অভিনয়ের ভঙ্গি দিয়ে পাঠানো হয়েছে। সে নারী পুরুষের সান্নিধ্য পাবে না, পুরুষের আকর্ষণে নিজেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধন্য করবে না, এটা প্রকৃতির যেমন বরখেলাপ, সৃষ্টিকর্তার নিকটও তেমনি অসহনীয়। তাই তিনি সমুচিত শাস্তি প্রদান করতে তিনজন ফেরেশতাকে সদোম ধ্বংসের জন্য পাঠালেন। ফেরেশতাগণ মানবরূপ ধারণ করে তথায় উপস্থিত হন এবং দুপুর বেলায় হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর নিকট সদোম ধ্বংসের সংবাদ প্রদান করেন। তিনি হজরত লুত (আঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের কথা জিজ্ঞাসা করলে ফেরেশতাগণ বললেন যে, লুত (আঃ) ও তাঁর পরিবারের মধ্যে পাঁচজন ধার্মিক ব্যক্তি ছাড়া বাকি সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এরপর ফেরেশতাগণ সদোম পৌছে হজরত লুত (আঃ)-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন; সুশ্রী কয়েকজন বিদেশী যুবক হজরত লুতের গৃহে অতিথি হয়েছে এ সংবাদ শুনে পাপিষ্ঠ সদোমবাসী হজরত লুতের বাড়িতে এসে হামলা করল এবং ঐ যুবকদের সঙ্গে মৈথুন করার ইচ্ছে প্রকাশ করল। হজরত লুত (আঃ) এ নরপশুদের হাত থেকে অতিথিদের রক্ষার জন্য তাদের নিকট বিনীতভাবে অনুরোধ জানালেন। ধনসম্পত্তি দেবার অঙ্গীকার করলেন। স্বীয় কন্যাগণকে অর্পণ করতেও রাজি হলেন। কিন্তু সে কথায় তারা কর্ণপাত না করে ঘরের দরজা ভেঙে হজরত লুত (আঃ)-কে আক্রমণ করল। ফেরেশতাগণ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং নিজ নিজ পাখার আঘাতে পাপিষ্ঠ শয়তানদের অন্ধ করে দিলেন। এরপর ফেরেশতাগণ হজরত লুত (আঃ)-কে বললেন, তাঁর পরিবারের লোকজনদের সদোম হতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে। বিশ্বাসী কয়েকজন লোক ব্যতীত আর কেউ লুত (আঃ)-এর কথা বিশ্বাস করল না। এমনকি তাঁর অবিশ্বাসিনী স্ত্রীও নিজ গৃহ হতে সরলেন না। পরদিন প্রভাত হবার পূর্বেই সদোম ধ্বংস হয়ে গেল। সমগ্র শহর ওলট-পালট হয়ে বিভীষিকাময় অগ্নির সঙ্গে প্রস্তর ও গন্ধক বর্ষণ হতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে সদোমবাসী ধুলোর সঙ্গে মিশে গেল। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) প্রভাতে উঠে সদোম ধ্বংসের এ লীলা সচক্ষে দর্শন করলেন।

(তঃ হক্কানী)

বাইবেলে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।[১] নিম্নে তা বর্ণিত হলো।

সদোম ও ঘমোরার বিনাশ

লোটের শেষ গতি

১৯। (১) পরে সন্ধ্যাকালে ঐ দুই দূত সদোমে আসিলেন। তখন লোট সদোমের দ্বারে বসিয়াছিলেন। আর তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের নিকট যাইবার জন্য উঠিলেন এবং ভূমিতে মুখ দিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,

(২) হে আমার প্রভুরা! দেখুন বিনয় করি, আপনাদের এই দাসের গৃহে পদার্পণ করিয়া রাত্রিবাস করুন ও পা ধুউন; পরে প্রত্যুষে উঠিয়া স্ব-যাত্রায় অগ্রসর হইবেন। তাঁহারা কহিলেন, না আমরা চকেই রাত্রিযাপন করিব।

(৩) কিন্তু লোট অতিশয় আগ্রহ দেখাইলে তাঁহারা তাহার সঙ্গে গেলেন ও তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহাদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করিলেন ও তাড়িশূন্য রুটি পাক করিলেন।

১। বাইবেল ঃ আদি পুস্তক আব্রাহাম ও লোটের বিবরণ পরিচ্ছেদ, ১৩/১৩, এতে বলা হয়েছে, সদোমের লোকেরা অতি দুষ্ট ও সদা প্রভুর বিরুদ্ধে অতি পাপিষ্ঠ ছিল।

(৪) আর তাঁহারা ভোজন করিলেন। পরে তাঁদের শয়নের পূর্বে ঐ নগরের পুরুষেরা, সদোমের আবাল-বৃদ্ধ সমস্ত লোক চতুর্দিক হইতে আসিয়া তাহার বাটী ঘিরিল এবং লোটকে ডাকিয়া কহিল।

(৫) অদ্য রাত্রিতে যে দুই ব্যক্তি তোমার বাটীতে আসিল, তাঁহারা কোথায়? তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া আমাদের নিকটে আন, আমরা তাঁহাদের পরিচয় লইব।

(৬) তখন লোট গৃহদ্বারের বাহিরে তাঁহাদের নিকট আসিয়া আপনার পশ্চাৎ কপাট বন্ধ করিয়া কহিলেন,

(৭) ভাইসকল! বিনয় করি এমন কুব্যবহার করিও না।

(৮) দেখ পুরুষের পরিচয়-অপ্রাপ্তা আমার দুইটি কন্যা আছে, তাহাদিগকে তোমাদের নিকট আনি, তোমাদের দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহা কর, কিন্তু সেই ব্যক্তিদের প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এই নিমিত্তে তাঁহারা আমার গৃহের ছায়ায় আশ্রয় করিয়াছেন।

(৯) তখন তাহারা কহিল সরিয়া যাও। আরও কহিল, এ একাকী প্রবাস করিতে আসিয়া আমাদের বিচারকর্তা হইল; এখন তাহাদের অপেক্ষা তোর প্রতি আরও কুব্যবহার করিব।

(১০) ইহা বলিয়া তাহারা লোটের উপরে ভারি চড়াও হইয়া কপাট ভাঙিতে গেল। তখন সেই দুই ব্যক্তি হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের মধ্যে আপনাদের নিকটে টানিয়া লইয়া কপাট বন্ধ করিলেন।

(১১) এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ও মহান সকল লোককে অন্ধতায় আহত করিলেন। তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে খুঁজিতে পরিশ্রান্ত হইল।

(১২) পরে সেই ব্যক্তিরা লোটকে কহিলেন, এই স্থানে তোমার আর কে কে আছে? তোমার জামাতা ও পুত্র-কন্যা যতজন এই নগরে আছে, সে সকলকে এই স্থান হইতে লইয়া যাও।

(১৩) কেননা আমরা এই স্থান উচ্ছিন্ন করিব; কারণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে এই লোকদের বিপরীত মহাক্রন্দন উঠিয়াছে, তাই সদাপ্রভু ইহা উচ্ছিন্ন করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।

(১৪) তখন লোট বাহিরে গিয়া, যাহারা তাহার কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছিল, আপনার সেই জামাতাদিগকে কহিলেন, উঠ, এ স্থান হইতে বাহির হও, কেননা সদাপ্রভু এই স্থানকে উচ্ছিন্ন করিবেন; কিন্তু তাহার জামাতারা তাহাকে উপহাস করিয়া অজ্ঞান করিল।

(১৫) পরে প্রভাত হইলে সেই দূতেরা লোটকে সত্বর কহিলেন, ওঠ, তোমার স্ত্রীকে ও এই যে কন্যা দুইটি এখানে আছে, ইহাদিগকে লইয়া যাও, পাছে তোমরা নগরের অপরাধে বিনষ্ট হও।

(১৬) কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার সদাপ্রভুর স্নেহ প্রযুক্ত সেই ব্যক্তিরা তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর ও কন্যা দুইটির হস্ত ধরিয়া নগরের বাহিরে লইয়া রাখিলেন।

(১৭) এইরূপে তাহাদিগকে বাহির করিয়া তিনি লোটকে কহিলেন, প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন কর, পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিও না; এই সমস্ত অঞ্চলের মধ্যেও দাঁড়াইয়া থাকিও না; পর্বতে পলায়ন কর, পাছে বিনষ্ট হও।

(১৮) তাহাতে লোট তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে আমার প্রভু; এমন না হউক।

(১৯) দেখুন আপনার দাস আপনার কাছে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে; আমার প্রাণরক্ষা করাতে আপনি আমার প্রতি আপনার মহা দয়া প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমি পর্বতে পলায়ণ করিতে পারি না; কি জানি সেই বিপদ আসিয়া পড়িলে আমিও মরিব।

(২০) দেখুন, পলায়নের জন্য ঐ নগর নিকটবর্তী, উহা ক্ষুদ্র; ওখানে পালাইবার অনুমতি দিন, তাহা হইলে আমার প্রাণ বাঁচিবে; উহা কি ক্ষুদ্র নয়?

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২১) তিনি কহিলেন, ভাল, আমি এ বিষয়ে অনুগ্রহ করিয়া ঐ যে নগরের কথা কহিলে, উহা উৎপাটন করিব না;

(২২) শীঘ্রই ঐ স্থানে পলায়ন কর। কেননা তুমি ঐ স্থানে না পৌঁছিলে আমি কিছু করিতে পারি না। এই হেতু সেই স্থানের নাম সোয়র, ক্ষুদ্র হইল।

(২৩) দেশের উপরে সূর্য উদিত হইলে লোট সোয়রে প্রবেশ করিলেন।

(২৪) এমন সময় সদাপ্রভু আপনার নিকট হইতে, গগন হইতে, সদোমের ও ঘমোরার উপরে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষাইয়া সেই সমুদয় নগর, সমস্ত

(২৫) অঞ্চল, নগরনিবাসী সকল লোক ও সেই ভূমিতে জ্ঞাত সমস্ত বস্তু উৎপাটন করিলেন।

(২৬) আর লোটের স্ত্রী তাহার পিছন হইতে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিল আর লবণ স্তম্ভ হইয়া গেল।

(২৭) আর অব্রাহাম প্রত্যুষে উঠিয়া, পূর্বে যে স্থানে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন তথায় গমন করিলেন।

(২৮) এবং সদোম ও ঘমোরার দিকে ও সেই অঞ্চলের সমস্ত ভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আর দেখ, ভাটির ধূমের ন্যায় সেই দেশের ধূম উঠিতেছে।

(২৯) এইরূপে সে অঞ্চলে স্থিত সমস্ত নগরের বিনাশকালে ঈশ্বর অব্রাহমকে স্মরণ করিয়া, যে যে নগরে লোট বাস করিতেন, সেই সেই নগরের উৎপাটনকালে উৎপাটনের মধ্য হইতে লোটকে প্রেরণ করিলেন।

(৩০) পরে লোট ও তাহার দুটি কন্যা সোয়র হইতে পর্বতে উঠিয়া গিয়া তথায় থাকিলেন; কেননা তিনি সোয়রে বাস করিতে ভয় করিলেন আর তিনি ও তাহার দুই কন্যা গুহামধ্যে বসতি করিলেন।

[হজরত লুত (আঃ)-কে বাইবেলের ভাষায় লোট বলা হয়েছে। হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে বলা হয়েছে অব্রাহাম। হজরত ইউনুস (আঃ)-কে যোহন বলে উল্লিখিত করা হয়েছে।]

সদোমকে ইংরেজিতে Sodom বলে। এই Sodom শব্দ হতে Sodomy যার অর্থ পুংমৈথুন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

পুংমৈথুন প্রথা হজরত লুত (আঃ)-এর সময় হতেই চলে আসছে। আজও সারা পৃথিবীব্যাপী চলছে। ইতিহাস খুললে দেখা যায় যে, অ্যাসিরীয় ও মিশরীয় দেবতাদের চরিত্রের একটা শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল পুংমৈথুন। উদাহরণস্বরূপ হোরাস ও সেট নামক দেবতাদের কথা বলা চলে—যারা পুংমৈথুনে কৃতিত্ব অর্জন করে পূজিত হতো। ডরিয়ান, সিদিয়ান ও রোমানগণ পুংমৈথুন বীরত্ব, কৃতিত্ব ও পৌরুষত্ব বলে ধারণা করত। গ্রীকদের মধ্যে পুংমৈথুন প্রথা এমন ব্যাপক আকারে সংক্রমিত হয়েছিল যে তারা পুংমৈথুনকে সভ্যতা ও কৃষ্টিকলার এক চরম নিদর্শন বলে ভাবত। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, পণ্ডিত কেউ এ কৃষ্টিকলার সৌন্দর্য থেকে বিরত থাকেন নি। স্বনামধন্য সক্রেটিস, মহাদার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল সবাই সমমৈথুন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন। আরব, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, চীন, ভারত, জার্মান তথা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার কোন দেশই এ প্রচলিত অভ্যাস থেকে মুক্ত ছিল না—আজও নেই। ইউরোপের সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে বায়রন, নেপোলিয়ন, ল্যাটিন, সেক্সপিয়ার, মারে, মার্লো, অ্যাঞ্জেলা, বেকন, অস্কার ওয়াইল্ডের মতো মহাপণ্ডিত ও কবি-সাহিত্যিকরাও এ ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। বর্তমান সভ্যতার যুগে এর প্রসার কমা তো দূরে থাক, আও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছ। শুধু তাই নয়, অনেক দেশে অবাধ লাইসেন্স নিয়ে

পুরুষেরা বেশ্যাবৃত্তি করছে। শুধু জার্মানির বার্লিন শহরেই বিশ হাজারেরও বেশি পুরুষকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। উত্তর ভারতের বহু স্থানেও সুশ্রী বালকগণ এ বেশ্যাবৃত্তি করে বহু অর্থ উপার্জন করছে। লন্ডনে তো কথাই নেই। পুরুষ বেশ্যার আখড়া একটি দুটি নয় বহু। ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় এদের দেখা যায় পার্কে, রেলওয়ে স্টেশনে, ক্যান্টনমেন্টে। পয়সার বিনিময়ে এদের বিনা চেষ্টায়ই পাওয়া যায়।

নারীতে-নারীতে মৈথুন ঃ

পুরুষের ন্যায় সমকামী নারীরাও একত্র হয়ে মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়। এ স্বভাব শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, জীব-জন্তুর মাঝেও দেখা যায়। গাভীতে-গাভীতে মুরগিতে-মুরগিতে, ইঁদুরে-ইঁদুরে, কবুতরী-কবুতরীতে সমজাতীয় পশুরা বিপরীত লিঙ্গের সাথী না পেলে যৌন প্রবৃত্তির তাড়নায় সমমৈথুনে অভ্যস্ত হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা হোস্টেলে অবস্থানকালে অথবা একত্র শয়নে যখন কামভাবে অস্থির হয়ে পড়ে তখন একে অন্যের ওপর উঠে এ মৈথুন করে। এতে সাময়িক উত্তেজনার অবসান হয়। যৌনবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে শতকরা ৩২ জন নারী সমমৈথুনে অভ্যস্ত। অবশ্য এটা আমাদের দেশের হিসাবে নয়, পাশ্চাত্য দেশের হিসাব অনুযায়ী। তবে এ অভ্যাস শুধু পাশ্চাত্য দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবার কথা নয়। যৌন-ক্ষুধার তাড়নায় পশু-পাখিরা যদি সমমৈথুন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, তবে পুরুষ অথবা নারী-তা যে কোন দেশেরই হোক, একই প্রকার কামভাবে দংশিত হতে থাকে। আর এ দংশনের জ্বালা হতে সাময়িক রেহাই পাবার ইচ্ছাতেই এমন ঘটনা ঘটে। হিন্দু শাস্ত্রমতে জানা যায় যে, ভারতের দিলীপ রাজার দুই মহীষীর সঙ্গমে অর্থাৎ ভগে ভগে মিলনের ফলেই যে সন্তান জন্মলাভ করে তার নাম 'ভগীরথ'। অবশ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না। তবে এ কথা সত্য যে, নারী নারীর ওপর উপগত হয়ে সঙ্গম করতে পারে এবং সর্ব দেশেই তা করে থাকে। এ প্রথা আজও চলছে এবং চলবে।

যাই হোক নারীদের বেলায় এটা অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায় না। এ অভ্যাস সাময়িক। বিবাহের পরেই শতকরা একশ' জন নারীই আমার মনে হয় এ অভ্যাস ছেড়ে দেয়। কিন্তু পুরুষের পক্ষে এটা মারাত্মক ক্ষতিকর ও অশ্লীলতা। এ অভ্যাস একবার হলে পুরুষেরা স্ত্রী রেখে পুংমৈথুনের জন্য ছোটাছুটি করে। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আপন যুবতী স্ত্রী ঘরে রেখে যারা এমন দুষ্কর্ম করে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। ধৈর্যশীলা নারী না হলে তারাও অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে। এতে সংসার অশান্তিময় হয় ও ছেলেমেয়েরা চরিত্রহীন হয়। যে কোন কদর্য অভ্যাস, অশ্লীলতা, অনাচার ও ব্যভিচারকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এর সাক্ষি—

কোরআন ঃ (ক) "তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অশ্লীলতার আদেশ করেন না।"[১]

(খ) "এবং কোন প্রকাশ্য কিংবা প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হইও না।"[২]

বাইবেল ঃ "স্ত্রীর ন্যায় পুরুষের সহিত সংসর্গ করিও না। তাহা ঘৃণার্হ কর্ম।"[৩]

১। সূরা আরাফ, আয়াত ২৮-এর অংশ।
২। সূরা আনআম, আয়াত ১৫১-এর অংশ।
৩। লেবীয় পুস্তক ঃ অশুচি সহবাস পরিচ্ছেদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যভিচারের কারণ ঃ

(১) উপযুক্ত বয়সে বিবাহ না হওয়া ঃ পরিণত বয়সে বিবাহ না হলে ছেলেমেয়েদের মানসিক অবস্থা কি দাঁড়ায় এ নিয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি। মনের বাঁধ যখন ভেঙে যায়, যৌবন যখন শরীরের অণু-পরমাণুতে দংশন শুরু করে, তখন মান-ইজ্জতের ভয় থাকে না। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যেও বিশেষ তফাত থাকে না। জাত-বিজাতের প্রশ্ন থাকে না। সঙ্গমের নেশায় পাগল হয়ে ওঠে। পশু-পক্ষীদের দেখলেই এর পরিচয় মেলে। মুসলিম-সমাজে এ জন্য বাল্য-বিবাহকেও সমর্থন করেছে। চিরকুমার ও চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মের যুবক-যুবতীদের মধ্যে এ ব্যভিচার চলে। ইসলাম এ প্রথার বিরোধী। বরং বিবাহিত জীবনকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বলা হয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমে পুণ্য হয়, মানব বংশধারা বৃদ্ধি হয়, জীবনের পরম সুখ উপভোগ করা হয় এবং মন, ঈমান ও বুদ্ধি পরিপক্ক হয়। এ বিষয়ে রসুল (দঃ)-এর একটি হাদিস বর্ণনা করছি—

"সমগ্র পৃথিবীটাই সুখ ভোগের বস্তু এবং যাবতীয় সুখ ভোগের সামগ্রীর মধ্যে নারীরাই সর্বোৎকৃষ্ট।"[৪]

(২) অবাধ মেলামেশা ঃ এর ওপর পূর্বে অনেক আলোচনা করেছি। এখানে শুধু একটি হাদিস ও দুজন মহামনীষীর উক্তি তুলে ধরছি। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) বিবি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"স্ত্রী জাতির পক্ষে কোন্ কার্য সর্বাপেক্ষা উত্তম?"

বিবি ফাতিমা তদুত্তরে বললেন—"মেয়েদের পক্ষে ইহাই উত্তম যে কোন পরপুরুষ তাহাদিগকে এবং তাহারা কোন পরপুরুষকে দেখতে না পায়।"

এতদ শ্রবণে রসুলুল্লাহ (দঃ) তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বললেন—

"তুমি আমার কলিজার টুকরো।"[৫]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন—"কালির ঘরে যত সাবধানে থাক না কেন গায়ে দাগ লাগবেই লাগবে। যুবতীর কাছে অতি সাবধান হয়ে থাকলেও কিছু না কিছু কামভাব জাগবেই জাগবে।"[১]

জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে বলেছেন—"নারীকে পুরুষের সাথে মেলামেশার অবাধ সুযোগ দিলে মেয়েদের প্রজনন-শক্তি শীঘ্রই নিস্তেজ হয়ে যাবে। ফলে এমন একদিন আসবে, যেদিন পৃথিবী হতে মানব বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"[২]

অবাধ মেলামেশা যে সমাজের কি সর্বনাশ করে, নৈতিক চরিত্রের কেমন অধঃপতন ঘটায়, জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে কেমন ক্ষতিকর, তার বিশ্লেষণ কিছুটা 'নারী স্বাধীনতা' পরিচ্ছেদে ইনশাল্লাহ্ উল্লেখ করব।

(৩) অসুখী দাম্পত্য জীবন ঃ যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয় অথবা বেশিদিন ধরে মনের গরমিল থাকে তখন দুজনেই পরস্পরের ওপর বিশ্বাস ও ভালবাসা হারিয়ে ফেলে। ঠিক এ সময়েই অন্য পুরুষ অথবা অন্য নারীর সামান্য সহানুভূতি ও ভালবাসা পেলে মোহিত হয়। এ সুযোগ কিছুদিন ভোগ করার পরই মিলনের সাধ জাগে ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

৪। হাদিস—মুসলিম ১৮/২২।

৫। কিমিয়ায়ে সা'আদত—ব্যবহার খণ্ড। তর্জমা মাওলানা নূরুল রহমান, এম. এম.। পৃষ্ঠা ৩৬।

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশাবলী। পৃষ্ঠা ৭০।

২। সংগৃহীত নিয়ামূল কোরআন, ২৫৩।

(৪) যৌন-অক্ষমতা ঃ স্বামী অথবা স্ত্রী যে কোন একজনের যৌন-ক্ষমতা না থাকলে অন্যজন অধীর হয়ে ওঠে। যত ধৈর্যশীলা নারীই হোক না কেন, সবল, সুস্থ ও সুন্দর পুরুষ দেখলে তার মনে তখন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবেই। এ মানসিক চাঞ্চল্যই ব্যভিচারের নেশা জাগিয়ে দেয়। অনেক নারী চোখ-মুখ বুজে অসহ্য জ্বালা নিয়েও জীবন কাটাতে পারে; কিন্তু খুব কম পুরুষ দেখা যায়, যারা এমন জ্বালা বুকে নিয়ে সৎ থাকে। এরা একটু ফাঁক পেলেই অন্য নারীর প্রেমে পড়ে অথবা বেশ্যালয়ে গমন করে। এজন্যই ইসলাম বহু বিবাহে সমর্থন দিয়েছে।

(৫) ধর্মের নামে ব্যভিচার ঃ ধর্মের নামে প্রতিটি দেশে, প্রতিটি জাতির মধ্যে যেভাবে ব্যভিচার চলে তা সত্যি মর্মান্তিক। অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও মূঢ় ব্যক্তিরা ধর্মের নিয়ম-কানুন ও বিধান জানে না। তাদের যেভাবে বুঝান যায় ঠিক সেভাবেই বুঝে। টাকা-পয়সার শ্রাদ্ধ করে, নিজেদের মান-ইজ্জত বিক্রি করে, গরু-ছাগল, উট-দুম্বা, যৌতুক দিয়েও তারা চায় পীর-পুরোহিত, সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ-ব্যাপটিস্ট, পোপ-পল ও মঠাধ্যক্ষদের খুশি করতে। তাদের ধারণা, এরা জান্নাত এনে দেবে, স্বর্গে বাসস্থান কিনে দেবে, হেভেন-এ সোজাসুজি তুলে দেবে। শিষ্যকে শিক্ষা দিতে গিয়ে শস্য বানিয়ে তারা উদরস্থ করে। মুরিদকে মুর্দা করে তার স্ত্রীর সঙ্গে তপস্যায় বসে। সাধুর সঙ্গে মধুর আলাপের লোভ দেখিয়ে যাজকেরা কুমারীদের বুকে টানে—এসব ঘটনা অবাস্তব নয়। আর এসব ঘটনাই জন্ম দেয় ব্যভিচারের। অবশ্য একথা সত্য যে, সব ধর্মবিদ পণ্ডিতই এমন নিকৃষ্ট কাজ করেন না। যাঁরা প্রকৃতপক্ষেই ধার্মিক, ধর্মের সুন্দর পথ দেখানোই যাদের উদ্দেশ্য, তাঁরা সমাজে আছেন বলেই আজও মানব সমাজ টিকে আছে। সবাই তাঁদের শ্রদ্ধা করবে, তা যে কোন ধর্মের মনীষীই তিনি হোন না কেন। এরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পণ্ডিতও আমি অনেক দেখিছি ও পেয়েছি।

(৬) ব্যবসা ঃ অনেকেই উপার্জনের লোভে অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র ও অনাথা বালিকাদের ভরণ-পোষণ করে এই আশায় যে, তাকে অসামাজিক বৃত্তির মধ্যে নিমজ্জিত করে কিছু লাভবান হবে। আমাদের দেশে এরূপ প্রথা কম দেখা গেলেও অন্যান্য দেশে কম নয়। আরব দেশে নারী-ব্যবসা একটা প্রথা হয়ে সমাজে বিরাজমান ছিল। অনাথা বালিকারা বাধ্য হয়ে দেহ দান করত এবং উপার্জন করে তার গৃহস্বামীকে দিত। কোরআন এর সাক্ষ্য দেয়—

"এবং তোমরা স্বীয় তরুণী দাসীদিগকে অবৈধ বৃত্তির জন্য বাধ্য করিও না, যদি তাহারা পার্থিব জীবনে মর্যাদার সহিত সতীত্ব সংরক্ষণ করিতে চাহে। এবং যে তাহাদিগকে বাধ্য করিবে, তবে তাহাদের বাধ্য হওয়ার পর নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়।"[১]

নরপিশাচ প্রভুদের অত্যাচারে, পিতামাতার দারিদ্র্যতার অভিশাপে, দেশব্যাপী কুপ্রথার প্রচলনে কত লাখ লাখ তরুণী ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে এভাবে ব্যভিচারে বাধ্য হয়েছে কে তার হিসাব রাখে? এসব অসহায়া ক্রীতদাসী তরুণীদের ব্যভিচারের জন্য যে অপরাধ হয় মহান ও করুণাময় আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দেবেন এ ঘোষণা অসহায়দের জন্য সান্ত্বনা ও আশীর্বাদ। কিন্তু নির্মম ব্যবসায়ীরা? তারা কি ক্ষমা পাবে?

(৭) বিরহ ঃ বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী বেশিদিন ধরে একে অপরের নিকট হতে দূরে থাকলে দুজনেরই পদস্খলন হবার সম্ভাবনা থাকে। যার স্ত্রী কাছে নেই সে যেমন সারাদিন স্ত্রীর চিন্তা করে, তেমনি যার স্বামী কাছে নেই সেও প্রতি সেকেন্ডে স্বামীর চিন্তা করে। স্বামীর

১। কোরআন ঃ সূরা নূর, আয়াত ৩৩।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিরহ জ্বালায় তার বুক পুড়ে যায়। এ জ্বালা সে কাউকেই দেখাতে পারে না। পাগলা ঝড়ে মনকে সান্ত্বনাও দিতে পারে না। চায় স্বামী, প্রাণের প্রিয় সঙ্গী, যৌবনের ওষুধ, তৃষ্ণা নিবারক গরম পানি। কিন্তু নারী যখন তা পায় না তখন কারো পরোয়া না করেই তার মন ছুটে যায় পরপুরুষের দিকে। যার ফল দাঁড়ায় ব্যভিচার।

পুরুষকে বহির্জগতে যেতেই হয়। গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করার দিন এখন আর নেই। চাকরি ক্ষেত্রে, ব্যবসা ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে অথবা অন্য যে কোন কারণে যখন পুরুষ দূরে থাকে তখন তারা যৌন-তাড়নায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। তাই সঙ্গমের নেশায় পরনারী বা বেশ্যালয়ে গমন করে। যারা ধর্মের মধ্যে জীবন কাটায় তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু শতকরা ৫০ জন পুরুষ এবং ১০ জন নারী যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না একথা বলা চলে না। হজরত ওমর (রাঃ) তাঁর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "একজন বিবাহিতা নারী কতদিন পর্যন্ত স্বামীর বিরহ জ্বালা সহ্য করতে পারে?" কন্যা উত্তর দিয়েছিলেন, "তিন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ তিনটি ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত।"

হজরত ওমর (রাঃ) তখনই আদেশ দিলেন, "তিন মাসের অধিক কোন বিবাহিত সৈনিককেই আটকিয়ে রাখা যাবে না। তাকে ছুটি দিতেই হবে।"

জানি না বর্তমান যুগে এমন কোন শাসক আছেন কিনা যিনি একথা উপলব্ধি করেন। থাকলে 'Wife Serious' এমন মিথ্যা টেলিগ্রাম দেখিয়ে ছুটি নেবার হয়তো প্রয়োজন হতো না। স্বামীর মৃত্যুর পর অথবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিবাহ না করাও ব্যভিচারের আর একটি কারণ। হিন্দু সমাজে স্বামীর মৃত্যু হলে এক কিশোরী বালিকাকেও সারা জীবন বিধবা হয়ে কাটাতে হয়। সধবা ও বিধবার যৌন সাধ একই। বরং বলতে হয় যে, বিধবার যৌন-উত্তেজনা সধবার চেয়ে বেশি। কেননা যার ঘরে খাবার নেই তার ক্ষিধে বেশি। খাবার থাকলে ক্ষিধের জ্বালা কম হয়।

(৮) জাত স্বভাব ঃ পুরুষ প্রকৃতিগত ভাবেই নারীর চেয়ে বেশি কামুক ও স্বার্থপর। স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেও অন্য নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার আশায় থাকে। এক স্ত্রীতে সে মোটেই খুশি থাকতে চায় না। বহু নারীর বহু রূপ, ভাবভঙ্গি ও চালচলন তাকে এক নতুনত্ব দান করে। এই নতুনত্বের পূজা পুরুষের একটি স্বভাব। অবশ্য একথা বলে সমস্ত পুরুষকেই দোষারোপ করা চলে না। এর মধ্যে ব্যতিক্রমও অনেক আছে, শতকরা হিসাবে তাদের সংখ্যাও খুব কম। এ জন্যই পুরুষের জন্য কতকগুলো কড়া নির্দেশ ধর্মে রয়েছে।

"পরস্ত্রীর প্রতি কু-দৃষ্টির নামই ব্যভিচার।"[১]

"একমাত্র ব্যভিচার ৭০ বছরের এবাদতকে ধ্বংস করে।"[২]

যে জিনিস সবসময় মেলে তার ওপর সাধারণত আকর্ষণ আসে না। দুর্লভ জিনিস সবসময়ই মূল্যবান। একে লাভ করতে পারলেই একটা আত্মতৃপ্তি আসে। নিজের স্ত্রীকে সবসময় দেখে ও কাছে পেয়ে তার ওপর হয়তো না দেখার ও না পাওয়ার বেদনা থাকে না। পুরুষ বিজয়ের বেশেই নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। নিজ স্ত্রী রেখে অন্য নারীর প্রেমে পড়া, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে জড়িত থেকে অন্য নারীকে বুকে জড়িয়ে নেওয়াই তার স্বাভাবিক ধর্ম। এজন্যই এরা বহু নারীর প্রত্যাশী। যারা ব্যভিচারের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায়

১ ও ২। সগির। সংগৃহীত হাদিসের আলো। কৃত—পূর্বে বর্ণিত। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৮।

তারাই বহু পত্নী, উপপত্নী ও রক্ষিতা ঘরে রাখে। এছাড়া আত্মসংযমী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা প্রবৃত্তির সঙ্গে জেহাদ করে নিজেকে এ কুকর্ম হতে বাঁচায়।

পুরুষের শুক্রকীট সকর্মক ও গতিশীল। কিন্তু নারীর ডিম্ব অকর্মক ও স্থিতিশীল। এজন্যই পুরুষ সহজে উত্তেজিত হয় ও সঙ্গমের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে; কিন্তু নারীর বেলায় ঠিক এর উলটো। তার মনে চঞ্চলতার ভাব নিয়ে আসা ও সকর্মক করা সময় সাপেক্ষ। পুরুষের পেটে বাচ্চা হবার কোন ভয় থাকে না। সমাজের দুর্নামেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। ধন, মান ও স্বাস্থ্য থাকলে তারা বুক ফুলিয়েই চলতে পারে, কিন্তু নারী তা পারে না। অসতী নারী সমাজের কাছে নিন্দনীয়। ব্যভিচারকে তারা ভয় করে; তবু যারা একবার এ কাজে লিপ্ত হয়েছে তারা সুযোগ খুঁজবেই। যদিও এটা তাদের স্বভাব জাত নয়—এক পুরুষকেই ভালবেসে সারা জীবন আনন্দের মাঝে কাটাতে পারে। তবুও পরিবেশ যখন নষ্ট হয়ে যায়, অবাধ মেলামেশার সুযোগে যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে তখন ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। পাশ্চাত্য দেশের স্কুল-কলেজের মেয়েরা ও বেশ্যাগণ এর উদাহরণ।

ব্যভিচারের কুফল ঃ

হজরত (দঃ) বলেছেন—"ব্যভিচার দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, মুখের জ্যোতি হরণ করে এবং আয়ু হ্রাস করে।"[১]

হজরতের এ মহাবাণী বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়োজন পড়ে না। কেননা ব্যভিচারে লিপ্ত একটি মানুষের কি অধঃপতন ঘটতে পারে, সংসারে কেমন বিশৃঙ্খলা আনয়ন করতে পারে, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের কেমন ক্ষতি করতে পারে, তা কারো অজানা নেই। সোনার সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে যায়; ধন-দৌলত অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যায়, মান-সম্ভ্রম কর্দমাক্ত সলিলে মিশে যায়। রাজা রাজ্য হারায়, যোদ্ধা শক্তি হারায়, সম্মানী মর্যাদা হারায়, সংসারী ভিখারি হয়। এ দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই। ব্যভিচারের নেশায় পড়ে চুরি-ডাকাতি, খুন, জখম, হত্যা, পাশবিকতা, অত্যাচার-অবিচার ও পশুত্বের পর্যায়ে মানুষ নেমে আসে। ঐশ্বর্য বলে তার কোন কিছু থাকে না—সেটা ধনের ঐশ্বর্যই হোক, মানের ঐশ্বর্যই হোক বা পরকালের ঐশ্বর্যই হোক। মহানবী ঠিক বলেছেন—"ঐশ্বর্য এবং ব্যভিচার কখনও মানুষের সহিত সমসূত্রে থাকে না।"[২]

এবারে আমরা দেখবো ব্যভিচারে মুখের জ্যোতি কেন নষ্ট হয়। আমি পূর্বে লিখেছি যে, নারীর দেহ অম্লধর্মী। অম্লরসের আধিক্য হেতুই তার দেহের কমনীয়তা ও পেলবতা বজায় থাকে। নারী ব্যভিচারিণী হলে বিভিন্ন পুরুষের বীর্য তার জরায়ু অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুটি ক্রিয়া করে। প্রথমত, সমজাতীয় শুক্রকীটের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলতে থাকে, ফলে জরায়ু কোষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। সমজাতীয় শুক্রের সংঘর্ষে এক বিষের ক্রিয়া সাধিত হয়; ফলে শুক্রকীটগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে। এ জন্যই দেখা যায় যে, বেশ্যাদের সন্তান হয় না। আর বেশ্যাবৃত্তি পুরুষদেরও এসব রোগ হয়। যদি সিফিলিস, গনোরিয়া, চুলকানি, প্যাঁচড়া প্রভৃতি রোগে কেউ আক্রান্ত হয় তবে তার

১। সগির। সংগৃহীত—হাদিসের আলো। কৃত পূর্বে বর্ণিত।
২। সগির। সংগৃহীত (পূর্বে বর্ণিত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুখ ও দেহের লাবণ্যতা, কমনীয়তা, জ্যোতি, বল-বীর্য, শক্তি ও সাহস কেমন থাকবে তা চিন্তাশীল পাঠকগণ বিচার করে দেখুন।

নারীর অবস্থা কি হয়? আমরা কেমিস্ট্রিতে পড়েছি যে Acid ও Base একসঙ্গে মেশালে নিউট্রালাইজ হয়ে যায়। অর্থাৎ অম্লধর্মী ও ক্ষারধর্মী পদার্থ একত্রিত করলে অম্লত্ব আর থাকে না। একথা শুধু এ যুগের বৈজ্ঞানিকদেরই নয় মহা রসায়ন বিজ্ঞানী হজরতও তাই বলেছেন—

"সিরকা যেমন মধুর গুণকে নষ্ট করে তেমনি মানুষের কু-স্বভাবও পুণ্যরাশিকে সমূলে ধ্বংস করে।"

অম্ল ও ক্ষারজাতীয় পদার্থের মধ্যে ভয়ানক এক আকর্ষণ বিদ্যমান। যেহেতু নারীদেহে অম্লত্বের প্রভাব বেশি ও পুরুষের দেহে ক্ষারত্বের প্রভাব প্রবল, তাই এদের মধ্যে মিলনের আকাঙ্খাও চরম। স্বাভাবিক মিলনে দুজনেই কিছু হারায় ও কিছু গ্রহণ করে। এই দেওয়া ও নেওয়ার মাঝে দুজনের পকেটই ভারি হয়। অর্থাৎ Loss ও Gain হিসাব করে দেখা যায় Ultimate gain. এজন্যই বিবাহিত জীবনে দুজনই সুন্দর স্বাস্থ্য, কমনীয়তা ও শক্তি পায়। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে যা হবার ঠিক তাই হয়। একটি নারীর যতটুকু ক্ষার জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন তার চেয়ে যদি বহুগুণ বেশি পেয়ে যায় তাহলে নারীর দেহ হতে অম্লের অংশটুকু নিঃশেষ হতে বাধ্য। আর নিঃশেষ হবার অর্থই নারী তার নারীত্ব হারায়। অর্থাৎ পুরুষে রূপান্তরিত হওয়া। এজন্যই ব্যভিচারিনী নারী তার সৌন্দর্য, লাবণ্য, কমনীয়তা, লজ্জাশীলতা ও চৌম্বকত্ব শক্তি হারিয়ে ফেলে—এটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি। এর মধ্যে কোন ভুল নেই।

এ তো গেল ব্যভিচারিণী নারী ও পুরুষদের কথা। তাদের সংমিশ্রণে যে বাচ্চার জন্ম হয় তাদের কি অবস্থা হয়? এরা কি সুন্দর, সরল ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়? না, কোনদিনই তা হতে পারে না। হয় কানা, না হয় খোঁড়া, না হয় অন্ধ বা চর্মরোগ বিশিষ্ট হতে বাধ্য। ডাক্তারদের মতে, যেসব কারণে শিশুরা দৃষ্টিশক্তি হারায়, তার একটি হলো গর্ভবতী মা যদি গনোরিয়ায় ভোগেন, তবে শিশু ভুমিষ্ট হবার সময় তার কচি চোখ সংক্রমিত হয়ে পড়ে। ফলে নবজাত শিশুটি চোখ ওঠা নিয়ে জন্মে। পরে এই চোখের নরম কণিকায় ঘা হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়।

ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ উভয়কেই মানসিক ও দৈহিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোন মানব ধর্মেই ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি। মনের তাড়নায়, কু-প্রবৃত্তির বশে, পারিপার্শ্বিক চাপে নারী ও পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। পুরুষ সকর্মক বিধায় নারীর ওপর সাধারণত বলপ্রয়োগ করে ব্যভিচার করে। ব্যভিচারের পূর্বে ও পরে এবং ব্যভিচারকালীন সময়ে দুজনের মনেই ভয়, ভীতি, আতঙ্ক, জড়তা ও অস্থিরতা থাকে। এ সব কারণে শুধু আসক্তির অভাবই থাকে না—যৌনাঙ্গ, দেহকোষ ও মস্তিষ্কে ভয়ানক আঘাত পড়ে। ফলে শ্বাসযন্ত্র, হৃদক্রিয়ার গতিও অস্বাভাবিক হয়। এজন্যই এদের মনে আনন্দ তো থাকেই না, ভবিষ্যতের এক দুঃস্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে—যা মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়। এজন্য মুখের জ্যোতি ও দেহের শক্তি বৃদ্ধির পরিবর্তে নিস্তেজ হয়।

অন্য দেশের ব্যভিচারী পুরুষদের কথা আমি বলতে পারছি না, তবে আমাদের দেশের যতগুলো ছেলের সন্ধান জানি, তাদের মধ্যে যা লক্ষ্য করেছি, তা হলো এই—পোড়া চেহারা, কপালে কালো মেঘের মতো ছায়া, চোখ কোটরাগত, চোখের নিচে কালো দাগ, চর্মরোগে

আক্রান্ত, বদমেজাজি, রুক্ষ স্বভাব, অশান্তি ইত্যাদি। এসব লক্ষ্য করে বার বার মনে পড়ে রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর সেই অমিয় বাণী—যা যুগ যুগ ধরে অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকবে; আর মূঢ় মানব সমাজে দেখাবে সুন্দর ও আলোর পথ।

আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ ও আলেমদের অভিমত এই যে, ব্যভিচারের জন্যই কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দেয়। আর অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি ব্যভিচারেরই শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ পাক আমাদের দিয়ে থাকেন।

অনেকেই হয়তো বলতে পারেন যে, ব্যভিচারের জন্য যদি অনুরূপ শাস্তি আল্লাহ্ আমাদের দিয়ে থাকেন তবে ইংলন্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেখানে ব্যভিচারের তাণ্ডব-লীলা চলছে সেখানে এসব দুর্যোগ ঘটছে না কেন? কথাটি অবশ্য বড় জটিল। তবে ইতিহাস নিয়ে কিছুটা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এদের চেয়েও প্রভাবশালী, রোমান ও পারসিক জাতির পতন ঘটেছে নির্মম ও নিদারুণভাবে। কয়েকদিন পূর্বেই আমেরিকায় শীতল বায়ুপ্রবাহে কি ঘটে গেল তা স্মরণ থাকবার কথা নয় কি? জন কার্টার এ ভয়াবহ দুর্যোগ দেখে ধর্মযাজকদের কি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বলেন নি? রান্নাঘরে চার ইঞ্চি বরফে ঢেকে সত্তর বছর বয়স্কা রমণীর শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ কি খবরের কাগজের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে নি? তারা যে সারা জীবন চারশ' ফুট উঁচু স্থানে বাস করে বিজয় ডঙ্কা ওড়াবে, এর কি কোন সনদপত্র আছে। এরা যে দুনিয়ার বড় জাতি হয়ে টিকেই থাকবে, এর কি কোন গ্যারান্টি আছে? দেখুন আল্লাহ্ কি বলেন—

"আমি তাহাদের পূর্বে বহু যুগ-যুগান্ত হইতে ধ্বংস করিয়াছি; তখন তাহারা আর্তনাদ করিলেও পরিত্রাণের সময় ছিল না।" (৩৮ ঃ ২ ঃ ৩)

ব্যভিচারের শাস্তি ঃ

প্রতিটি ধর্মেই ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীদের জন্য কঠোর শাস্থির ব্যবস্থা রয়েছে। আমি মুসলমান বলেই একথা বলব না যে, আমাদের বিধানই সবচেয়ে উত্তম। খ্রিষ্টান ধর্মে ব্যভিচারের শাস্তি 'রজম' অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে নিহত করা। ইসলামের বিধান অর্ধ-প্রোথিত অবস্থায় নির্দয়ভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। হিন্দু ধর্মে লৌহদণ্ড আগুনে লাল করে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে প্রাণে বধ করা। কোন্‌টি সোজা এবং কোন্‌টি নিকৃষ্ট ব্যবস্থা?

মহাপুরুষদের বাক্যকে অবহেলা করা, আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করা, না মানা ও না শোনার রীতিটাই আমাদের নিকট অতি সোজা ও উত্তম সামাজিক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন শাসকের বিচার তেমনি মোড়লদের ব্যবস্থা। দেখুন পূর্ব যুগের মুসলিম শাসকগণ কেমন বিচার করেছেন।

একদা হজরত ওমর (রাঃ)-এর পুত্র আবু শামা ব্যভিচার করল। সাক্ষি প্রমাণ নিয়ে হজরত ওমর (রাঃ) আদেশ দিলেন—আবু শামাকে একশ' বেত্রাঘাত করতে। খলিফার পুত্র, এজন্য দয়া দেখাতে হবে বা মাফ করতে হবে এমন কথা বলবার সাহস কারো হলো না। যা হুকুম তাই। নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত শুরু হলো। আট-দশটি আঘাতের পরই আবু শামা অজ্ঞান হয়ে পড়ল এবং শেষে মৃত্যু বরণ করল, কিন্তু আইন তাকে ছাড়ল না। পিতার অপত্য স্নেহ প্রিয় পুত্রকে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না। কেমন সুন্দর বিধান! কেমন নিরপেক্ষ বিচার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আছেন কি বিশ্বে এমন শাসক, যিনি ন্যায় ও সত্যের তুলাদণ্ডে হজরত ওমর (রাঃ)-এর মতো সঠিক বিচার করতে পারেন? পারেন না জানি। কেননা এ বিচার করতে হলে নিজেকে ধার্মিক হতে হবে। পুণ্যবান হতে হবে। আল্লাহর ভয়ে চোখ থেকে অশ্রু ঝরাতে হবে। আর বিচার শুরু করতে হবে নিজের ঘর থেকে। তাই এ বিচার অতি সোজা নয়। পরের ছেলের বুকে গুলি চালিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা সহজ কিন্তু নিজ ছেলের বুকে অপরাধের দায়ে গুলি চালিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করা সহজ নয়। কঠিন—আমাদের নিকট খুবই কঠিন।

ব্যভিচারের অভিযোগ রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট অনেক এসেছে। তিনি নিজ হাতে বিচারও করেছেন। নিম্নে এর দু-একটি প্রমাণ উথাপন করছি।

(ক) আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত—"একজন ইহুদি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, তাহাদের মধ্যে এক পুরুষ ও এক স্ত্রী জেনা করিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা তৌরাতে 'রজম'[১] সম্বন্ধে কি পাও?" [মা তাজিদুনা ফি তাওরাতে ফি শানে রজম?] তাহারা বলিল, "আমরা জেনাকারীদের তিরস্কার করি এবং তাহাদের দোররা মারা হয়।" ইহা শুনিয়া আবদুল্লাহ বিন সালাম বলিলেন, "তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। উহাতে রজমের কথা আছে।" তখন তৌরাত আনিয়া খোলা হইল। এবং তাহাদের এক ব্যক্তি 'রজমের' আয়াতের ওপর হাত চাপা দিয়া উহার পূর্বে ও পরের কথা পড়িল। তখন আবদুল্লাহ বিন সালাম ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, "তোমরা হাত ওঠাও।" তখন সে তাহার হাত উঠাইল এবং দেখা গেল ঐ স্থানে রজমের আয়াত রহিয়াছে। তখন ইহুদি বলিল, "সে সত্য বলিয়াছে। হে মুহাম্মদ, উহাতে রজমের আয়াত রহিয়াছে।" তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর আদেশে ঐ দুই ব্যক্তিকে "রজম করা হইল।"

(খ) সহল বিন সাদ হতে বর্ণিত—একদা উয়াইমির রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট গিয়া বলিল, "এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত অপর একজনকে দেখিল, সে কি তাহাকে হত্যা করিবে, তারপর আপনারা তাহাকে হত্যা করিবেন, না হয়তো সে কি করিবে?" রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "খোদা আয়াত নাজেল করিয়াছেন তোমার ও তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে এবং তাহাদের আদেশ দিলেন পরস্পরকে লা'ন করিতে যেরূপ খোদা নির্দেশ দিয়েছেন কোরআনে।' তখন সে লা'ন করিল তাহার স্ত্রীকে এবং তারপর বলিল, "হে রসুলুল্লাহ, যদি আমি তাহাকে রাখিয়া দেই তবে অত্যাচার করিব তাহার প্রতি।" এই হেতু সে তালাক দিল তাহাকে এবং ইহাই হইল লা'নকারী স্বামী ও স্ত্রীর ব্যাপারে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "দেখ, সে যদি জন্ম দেয় কালো চক্ষু, বড় মাথা ও লম্বা জঙ্ঘাওয়ালা বাচ্চা তবে আমি মনে করি উয়াইমির সত্য বলিয়াছে, আর যদি জন্ম দেয় কিছুটা লাল রংয়ের বাচ্চা, গিরগিটের মতো, তবে আমি মনে করিব উয়াইমির মিথ্যা বলিয়াছে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে।" অতঃপর সে বাচ্চা দিল ঐ বর্ণনানুযায়ী, যাহা রসুলুল্লাহ (দঃ) উয়াইমির পক্ষে দিয়াছিলেন এবং অতঃপর ঐ বাচ্চাকে সম্পর্কিত করা হইয়াছিল উহার মায়ের সহিত।

[তজরীদুল বুখারী; কোরআনের ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদ। তর্জমা পূর্বে বর্ণিত।
পৃষ্ঠা ২১৫-২১৭]

ইহুদিদের মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি কিরূপ তৌরাত বা পুরাতন বাইবেল হতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে এর একটি মাত্র উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

১। রজম অর্থ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইস্রাইলীদের দেব পূজা ও ব্যভিচার

"পরে ইস্রায়েল শিটীমে বাস করিল, আর লোকেরা মোয়াবের কন্যার সহিত ব্যভিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই কন্যারা তাহাদিগকে আপনাদের দেবপ্রসাদ ভোজনে নিমন্ত্রণ করিল, এবং লোকেরা ভোজন করিয়া তাহাদের দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিল। আর ইস্রায়েল বাল্-পিয়োর (দেযের) প্রতি আসক্তি হইতে লাগিল। অতএব ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। সদাপ্রভু মোশীকে কহিলেন, তুমি লোকদের সমস্ত অধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে সূর্যের সম্মুখে উহাদিগকে টাঙাইয়া দাও। তাহাতে ইস্রায়েল হইতে সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ নিবৃত্ত হইল। তখন মোশী ইস্রায়েলের বিচার-কর্তাগণকে কহিলেন, তোমরা প্রত্যেকে বাল্-পিয়োরের প্রতি আসক্ত আপন আপন লোকদিগকে বধ কর।

আর দেখ, মোশীর ও ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে এক পুরুষ আপন জ্ঞাতিগণের নিকটে এক মিদিয়নীয়া স্ত্রীকে আনিল, তৎকালে লোকেরা সমাগম-তাম্বুর দ্বারে রোদন করিতেছিল। তাহা দেখিয়া হারোন যাজকের পৌত্র ইলিয়াশরের পুত্র পীনহসমণ্ডলীর মধ্য হইতে উঠিয়া হস্তে বর্শা লইলেন; আর সেই ইস্রায়েলীয় পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া ঐ দুইজনকেই, সেই ইস্রায়েলীয় পুরুষকে এবং পেট দিয়া সেই স্ত্রীকে বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে ইস্রায়েল সন্তানগণ হইতে মারী নিবৃত্ত হইল। যাহারা ঐ মারীতে মরিয়াছিল তাহারা চব্বিশ সহস্র লোক।"[১]

কোরআনের মতে ঃ

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ইহাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। এবং আল্লাহর আদেশ সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি যেন তোমাদের মমতা আকৃষ্ট না হয়—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করিয়া থাক। এবং বিশ্বাসীগণের মধ্যে একদল যেন উভয়ের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[২] (২৪ ঃ ২)

আলোচ্য কোরআনের বাণীতে ব্যভিচারের যে শাস্তি নির্দেশিত হয়েছে তা সাধারণভাবে সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য—বিশেষভাবে অবিবাহিত নারী-পুরুষের জন্যই প্রযোজ্য, কিন্তু বিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তি এর চেয়ে ভয়ঙ্কর। 'রজম' অর্থাৎ প্রোথিত অবস্থায় নিহত করাই বিধান। তবে নারীদের ক্ষেত্রে কোরআনের নিম্নোক্ত বিধান কার্যকরী।

"এবং তোমাদের নারীগণের মধ্যে যাহারা অশ্লীলতা করে, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারিজন সাক্ষি উপস্থিত কর। অনন্তর যদি তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাহাদিগকে গৃহসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাহাদিগকে তুলিয়া লয় কিংবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কোন পথ প্রদর্শন না করেন।"[৩] (৪ ঃ ১৫-১৭)

অবশ্য ঐরূপ কঠিন শাস্তি প্রদানের পূর্বে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং বিশ্বাসী চারজন সাক্ষি উপস্থিত করতে হবে, যারা বলবে যে তারা সচক্ষে দেখেছে। যদি দুর্নাম রটানোর উদ্দেশ্যে অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থে ঐরূপ অপবাদ কোন সতী-সাধ্বী নারীর ওপর দিয়ে তামাসা দেখতে চায় তবে তারাই কোরআনের মতে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। নিম্নের বাণী সে কথার সাক্ষ্যও বহন করে।

১। বাইবেল ঃ গণনা পুস্তক, ২৫/১-৯।

২। কোরআন ঃ সূরা নূর, আয়াত ২।

৩। কোরআন ঃ সূরা নেসা, আয়াত ১৫-১৭।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"এবং যারা সতী-সাধ্বীগণের প্রতি অপবাদ প্রদান করিয়া পরে চারটি সাক্ষী আনয়ন না করে, তবে তাহাদিগকে আশি বেত্রাঘাত কর এবং কখনই তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না এবং ইহারাই দুষ্কার্যকারী।"[৪] (২৪ ঃ ৪)

ওপরে বর্ণিত আয়াতসমূহের মধ্য হতে আমরা আরও অনেক শিক্ষা নিতে পারি। এ বাণী পরিষ্কারভাবে নারীর মর্যাদা দিয়েছে; তাদের সম্মান রক্ষা করেছে; অপবাদকারী ও নিন্দুকদের সতর্ক করেছে। কত সোনার সংসার যে এ অপবাদকারীর দল পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে, কত সুখের দাম্পত্য জীবনকে যে এরা ভেঙে চুরমার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। হজরত আয়েশা (রাঃ)-এর মতো পূতপবিত্র-সতী-সাধ্বী, ধর্মপরায়ণা, বুদ্ধিমতী, পর্দানশীলা, সুতীক্ষ্ণ ও শিক্ষিতা রমণীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে এ পাষাণের দল ছাড়ে নি। তাই আল্লাহ্ পাক নিরীহ, শক্তিহীনা ও শান্তিদায়িনী নারীকে সসম্মানে সমাজে বসবাস করার জন্যই এমন কঠোর বাণী পুরুষের জন্য নাজেল করেছেন।

ব্যভিচার ও ব্যভিচারিণীদের শাস্তি দেবার পূর্বে আরও কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করবার আছে। যেমন দুজনেই অবিবাহিত কি না। মেয়েকে জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করা হয়েছে কি না? সে নাবালিকা বা সাবালিকা কি না। কেমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে ব্যভিচার হয়েছে-যেমন যুদ্ধে দখলকৃত দেশের নারীদের প্রতি অথবা নারীদের প্ররোচনায় পুরুষ বাধ্য হয়েছে কি না। ভয়-ভীতি অথবা জীবন রক্ষার্থে ব্যভিচার করা হয়েছে কি না—এগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে চারজন ঈমানদার লোকের সাক্ষ্য নিয়ে, এরপর কোরআন ও সুন্নার রীতি অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী যদি ভুল স্বীকার করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় তাহলে প্রথমবারের জন্য ক্ষমা করাই শ্রেয়। কেননা অজ্ঞতাবশত, পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে, যৌবনের প্রারম্ভিক উন্মাদনায় প্রায় নারী-পুরুষেরই পদস্খলন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভুল করে যদি কেউ নিজের ভুলকে বুঝতে পারে, তবে সে অনুতপ্ত হয়ে মহৎ হয়। এজন্য ক্ষমার নির্দেশ আল্লাহ্ পাক নিজেও দিয়েছেন। কোরআন সে কথারও সাক্ষ্য দেয়—"কিন্তু ইহার পরে ক্ষমা প্রার্থনা করেও সংশোধিত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়ী।"[১] (২৪ ঃ ৫)

এবং যদি তোমাদের মধ্যে দুইজন অস্বাভাবিকতা করে, তবে উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর, কিন্তু তাহারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সদাচারী হয়, তবে তদুভয় হইতে প্রত্যাবর্তিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, করুণাময়ী।"[২]

ওপরে বর্ণিত কোরআনের বাণী হতে বুঝা যায় যে, সংশোধিত হবার জন্য ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীকে ক্ষমা করে সময় দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে আমরা আর একটি বিষয় লক্ষ্য করে থাকি। তা হলো এই যে, স্বামী অন্যের কুমন্ত্রণায় অথবা নিজ নিজ স্ত্রীর নিকট হতে সন্তোষজনক ব্যবহার না পেয়ে অথবা ব্যভিচারের সন্দেহে দোষারোপ করে দাম্পত্য-জীবনে এক চরম অশান্তি নিয়ে আসে। এর প্রতিকার কি?

স্বামী নিজে ছাড়া যেখানে অন্য কোন সাক্ষী নেই অথবা স্বামী অন্যের প্রেমে পড়ে নিজ স্ত্রীকে অপবাদের আখ্যা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে চায়, সেক্ষেত্রে কি স্ত্রীকে 'রজম' করতে হবে, না ঘরের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত আবদ্ধ করে শাস্তি দিতে হবে? এক্ষেত্রে হবে সত্যবাদিতার পরীক্ষা। মানুষের সম্মুখে নয়,মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সম্মুখে যিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য

৪। কোরআন ঃ সূরা নূর, আয়াত ৪।

১। সূরা নূর, আয়াত ৫।

২। সূরা নেসা, আয়াত ১৬।

সবকিছুই দেখে থাকেন। স্বামীকেও যেমন আকাশের দিকে দৃষ্টি করে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, সে সচক্ষে তার স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখেছে, স্ত্রীকেও তেমনি সাক্ষ্য দিতে হবে যে, সে দোষিণী অথবা নির্দোষিণী। এরপর তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী বিচার হবে। আল্লাহ্ কি সুন্দর পন্থায়ই না এ পথনির্দেশ করেছেন তাঁর মহাবাণীতে।

"এবং যারা স্বীয় সহধর্মিণীগনের প্রতি অপবাদ প্রদান করে এবং তারা নিজেরা ব্যতীত তাহাদের জন্য অন্য সাক্ষীসমূহ না থাকে। তবে তাহাদের একজন আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া চারিবার সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, নিশ্চয়ই সে সত্যবাদিগণের অন্তর্গত। এবং পঞ্চমবার বলিবে যে, যদি সে অসত্যবাদী হয় তবে তৎপ্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হউক। এবং নারী হইতেও শাস্তি বিদূরিত হইবে—যদি আল্লাহকে সাক্ষি করিয়া চারিবার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, নিশ্চয়ই সেই পুরুষ অসত্যবাদিগণের অন্তর্গত। এবং পঞ্চমবার বলিবে যে, যদি সে অসত্যবাদিগণের অন্তর্গত হয় তবে ঐ নারীর প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত হউক। এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও তদীয় করুণা তোমাদের প্রতি না হইত—যেহেতু নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল বিজ্ঞানময়।"[১]

স্ত্রী যদি ব্যভিচারী বলে প্রমাণিত হয় তবে স্বামী ইচ্ছে করলে তাকে তালাক দিতে পারে। এ বিধান আল্লাহ্ এবং রসুল দিয়েছেন। কেননা ব্যভিচারিণী স্ত্রী নিয়ে দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে না। এছাড়া স্বামীর জীবনও থাকে সংশয়াপন্ন। যে কোন মুহূর্তে ব্যভিচারিণী স্ত্রী ব্যভিচারী পুরুষের পরামর্শে তার স্বামীকে অপমানিত করতে পারে অথবা জীবননাশ করতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্ত একটি দুটি নয়, হাজার হাজার। তাই চলুন, আমরা তালাক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি।

অপবাদকারী পুরুষের শাস্তি কি হতে পারে তৌরাতে এর সুন্দর বর্ণনা আমরা পাচ্ছি। সেখানে বলা হয়েছে—

"কোন পুরুষ যদি বিবাহ করিয়া স্ত্রীর কাছে গমন করে, পরে তাহাকে ঘৃণা করে এবং তাহার নামে অপবাধ দেয় ও তাহার দুর্নাম করিয়া বলে, আমি এই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছি বটে কিন্তু সঙ্গমকালে ইহার সতীত্বের (কৌমার্যের) চিহ্ন পাইলাম না। তবে সেই কন্যার পিতামাতা তাহার সতীত্বের চিহ্ন লইয়া নগরের প্রাচীনবর্গের নিকট নগরদ্বারে উপস্থিত করিবে। আর কন্যার পিতা প্রাচীনবর্গকে বলিবে, আমি এই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলাম, কিন্তু এ তাহাকে ঘৃণা করে; আর দেখ এ অপবাদ দিয়া বলে আমি তোমার কন্যার সতীত্বের চিহ্ন পাই নাই, কিন্তু আমার কন্যার সতীত্বের চিহ্ন এই দেখুন। আর তাহারা নগরের প্রাচীনবর্গের সাক্ষাতে সেই বস্ত্রবিস্তার করিবে। পরে নগরের 'প্রাচীনবর্গ' সেই পুরুষকে ধরিয়া শাস্তি দিবে। আর তাহার একশত (শেকল) রৌপ্যদণ্ড করিয়া কন্যার পিতাকে দিবে, কেননা সেই ব্যক্তি ইস্রাইলীয় এক কুমারীর ওপরে দুর্নাম আনিয়াছে। আর সে তাহার স্ত্রী হইবে, ঐ পুরুষ যাবজ্জীবন তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু সেই কথা যদি সত্য হয় কন্যার সতীত্বের চিহ্ন যদি না পাওয়া যায়, তবে তাহারা সেই কন্যাকে বাহির করিয়া তাহার পিতৃগৃহের দ্বার সমীপে আনিবে, এবং সেই কন্যাকে নগরের পুরুষেরা বধ করিবে, কেননা পিতৃগৃহে ব্যভিচার করাতে সে ইস্রাইলের মধ্যে মূঢ়তার কর্ম করিয়াছে, এইরূপে তুমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।"

১। কোরআন ঃ সূরা নূর, আয়াত ৬-১০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওপরে বর্ণিত বাণীর মধ্যে প্রাচীনবর্গের সাক্ষাৎ বলা হয়েছে। এখানে প্রাচীনবর্গ বলতে কি কোর্টের অভিজ্ঞ বিচারকের কথা বলা হয়েছে? যদি তাই হয়ে থাকে তবে বিচারক কোন্ পন্থায় নারীর কৌমার্য বা সতীত্ব প্রমাণ করবেন তা বুঝতে আমি অক্ষম। **'সতীত্বের বস্ত্র বিস্তার করিবে'**—এটার মূলতত্ত্ব কি সেটাও বোধগম্য নয়। বিচারক ও ডাক্তার ভাইগণ নারীর সতীত্ব প্রমাণের উপায় কি এ—বাণী হতে কি খুঁজে পাচ্ছেন?

ব্যভিচারের শাস্তি ঃ

যে কোন দেশের, যে কোন জাতির নারী ও পুরুষের অবৈধ মিলনকে ব্যভিচার বলে। আমাদের ধারণা, ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মান, জাপান প্রভৃতি দেশের নরনারীদের যে অবাধ মেলামেশা ও স্বাচ্ছন্দ্যে, যৌন-ক্রিয়া সাধিত হয় এতে তাদের কোন বাধা নেই। বিচার নেই। আইনের চোখে দোষ নেই। অবশ্য এ চিন্তাধারাটা অমূলক নয়। কেননা প্রকাশ্যভাবে অথবা অপ্রকাশ্যভাবে তাদের এ অবাধ মিলন ঘটছে। এ স্বাধীনতা বা অবাধ মিলন কি তাদের ধর্মে প্রশ্রয় দেয় তাদের ওপর কি নবীর আবির্ভাব হয় নি? হজরত মুসা (আঃ), হজরত ঈসা (আঃ), হজরত ইব্রাহিম (আঃ), হজরত ইউসুফ (আঃ), হজরত লুত (আঃ), হজরত দাউদ (আঃ), হজরত সোলায়মান (আঃ) প্রমুখ নবীরা তাঁদের দেশের জন্য, ঐ সব সম্প্রদায়ের জন্য আবির্ভূত হন নি? তাঁরা কি তাদের অবাধ মিলনের সনদ দিয়ে গেছেন? সৃষ্টিকর্তার নিকট হতে তাঁদের ওপর যে বাণী অর্পিত হয়েছিল সে বাণীতে কি ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর চরম শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয় নি? হয়তো অনেকেই বলবেন যে তবে কেন তারা এ অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়? কেনই বা তারা এমন গর্হিত ও অশ্লীল কার্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে? সমাজ কেন তাদের বাধা দেয় না? কেন বিচারের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়ায় না? এ উত্তর চাইতে গেলে আমাদের লজ্জিত হতে হয়। পরের মুখ দেখা যায়। নিজের মুখ দেখা যায় না। পরের দোষ চট্ করে চোখে পড়ে। নিজের দোষ বছরের পর বছর খেটেও বের করা যায় না। মনের জালে ধরা পড়ে না। কত মেয়েকে জোরপূর্বক ঘর থেকে টেনে বের করা হচ্ছে—কত স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা গায়েব হচ্ছে, কত বিবাহিত স্ত্রীকে স্বামীর বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে—এ হিসাব কি কেউ দিতে পারবেন? সবগুলো খবরের কাগজের পৃষ্ঠা খুলে দেখুন দিনে এরূপ ঘটনা কত ঘটছে! অবিবাহিত উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের দ্বারাই শুধু নয়, স্বনামধন্য পদবীধারী ও ধনীগোষ্ঠীর দ্বারা দৈনন্দিন কি ঘটছে দেখলে নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে মাথা নিচু হয়ে যায়! শাস্তির ব্যবস্থা আমাদের রয়েছে চরমভাবে। কোরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে দিয়েছি। কিন্তু এ আইনে মৃত্যুদণ্ড ক'জনকে দেওয়া হয়?

এবারে আসুন দেখি তাদের ধর্মগ্রন্থে ব্যভিচারের কি শাস্তির নির্দেশ রয়েছে।

(২২) "কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়নকালে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে; এইরূপে তুমি ইস্রাইলের মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিবে।

(২৩) যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগদত্তা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে তবে তোমরা সেই দুইজনকে বাহির করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে; সেই কন্যাকে বধ করিবে, কেননা নগরের মধ্যে থাকিলেও সে চিৎকার করে নাই, এবং সেই পুরুষকে বধ করিবে, কেননা সে আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করিয়াছে, এইরূপে

(২৪) তুমি আপনার মধ্যে দুষ্টাচার লোপ করিবে।

(২৫) কিন্তু যদি কোন পুরুষ বাগদত্তা কন্যাকে মাঠে পাইয়া বলপূর্বক তাহার সহিত শয়ন করে তবে তাহার সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ মাত্র হত হইবে;

(২৬) কিন্তু কন্যার প্রতি তুমি কিছুই করিবে না। সে কন্যাতে পাপদণ্ডের যোগ্য পাপ নাই, ফলত যেমন কোন মানুষ আপন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে প্রাণে বধ করে, ইহাও তদ্রূপ।

(২৭) কেননা সেই পুরুষ মাঠে তাহাকে পাইয়াছিল, ঐ বাগদত্তা কন্যা চিৎকার করিলেও তাহার নিস্তারকর্তা কেহ ছিল না।

(২৮) যদি কেহ অবাগদত্তা কুমারী কন্যাকে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া তাহার সহিত শয়ন করে ও তাহারা ধরা পড়ে, তবে

(২৯) তাহার সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ—কন্যার পিতাকে পঞ্চাশ রৌপ্য দিবে এবং **তাহাকে মানভ্রষ্টা করিয়াছে বলিয়া সে তাহার স্ত্রী হইবে, সেই পুরুষ তাহাকে যাবজ্জীবন ত্যাগ করিতে পারিবে না।"**

অতি সুন্দর ব্যবস্থা আমরা দেখলাম। বাইবেলে ও কোরআনে একই প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর জন্য। নিরপেক্ষ বিচারের জন্য এ ব্যবস্থা স্মরণ রাখা উচিত। [বাইবেল; তৌরাত, দ্বিতীয় বিবরণ। ২২/২২-২৯]

তালাক

হজরত বলেছেন, "বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না, কারণ উহাতে আরশ কম্পিত হয়।" (সগির)

দাম্পত্য-জীবনে অশান্তির যে সকল প্রতিকার রয়েছে তন্মধ্যে তালাকই সর্বশেষ প্রতিকার। এ ব্যবস্থা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। তালাক অর্থ বিচ্ছিন্ন, বন্ধনমুক্ত, বৈধতাকরণছেদ। তালাক শুধু পুরুষের জন্যই বৈধ নয়, স্ত্রীর জন্যও বৈধ। তাই স্ত্রী বা স্বামী একে অন্যকে দাম্পত্য জীবনের অশান্তি হেতু, চরম গরমিলের কারণে ব্যভিচারের দোষে তালাক দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। ইসলামের উদারনীতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রযোজ্য। ইহুদি, খ্রীষ্টান প্রভৃতি জাতি নারীর অধিকার তো দূরের কথা এদের আত্মার অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করত না। নারীকে শাস্তি দিয়ে, নারীকে পুতুল করে, নারীর মর্যাদা হরণ করে পুরুষ গৌরবান্বিত হতো। পুরুষ দস্যু হলেও দেবতা, চোর হলেও নমস্য, ব্যভিচারী হলেও পুজারী আর অক্ষম হলেও পরম সঙ্গম মনে করেই নারীকে দিন কাটাতে হবে—এটাই ছিল পূর্ব যুগের মানুষের ধারণা। ইসলাম এই অমূলক ধারণার মাথায় কুঠারাঘাত হানল, নারীর সম্মান দিল, মান দিল, সমভাবে পুরুষের মতোই অধিকার দিল। পুরুষের পছন্দ না হলে যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায়, তবে পুরুষকে পছন্দ না হলে নারীই বা তাকে তালাক দিতে পারবে না কেন?

তালাক প্রথাটা ঘৃণ্য কথা। কেউ এ প্রথাকে অভিনন্দিত করবে না, কেননা একটা ঘর বাঁধা খুব কঠিন, সময় সাপেক্ষ। অর্থবল, ধনবল, জনবল যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সময় ও ধৈর্য। কিন্তু সামান্য একটি দিয়াশলাই এর কাঠি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একে ভস্মীভূত করে দেওয়া যায়। ঠিক বিবাহ ও তালাক প্রথাও তেমনি। দুটি অজানা, অচেনা প্রাণ একত্র করে ঘর করা খুবই কঠিন। কিন্তু একে নষ্ট করা অতি সহজ। সামান্য কয়েকটি মাত্র কথা। তাই বৈধ হওয়া সত্ত্বেও এ প্রথাকে কোন জ্ঞানী মহাজ্ঞানী মনেপ্রাণে উৎসাহিত করেন নি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত ঈসা (আঃ) বলেছেন—"যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে, সে তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; আর স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আর একজনকে বিবাহ করে, তবে সেও ব্যভিচার করে।"

[বাইবেল ঃ মার্ক, যীশুর বিবিধ কর্ম ও শিক্ষা পরিচ্ছেদ (১০নং Verse)]

তালাক প্রথাকে আমাদের রসুল (দঃ) মোটেই উৎসাহিত করেন নি। তিনি বলেছেন যে, তালাক দিলে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কম্পিত হয়। তাঁর এ মহান বাণী হতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ নিজেও খুশি হতে পারেন না। আরশে যা কিছু আছে, এমনকি ফেরেশ্‌তাকুলসহ তালাকদাতাকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। এ জন্যই হজরত (দঃ) নারী ও পুরুষের প্রতি অনেক উপদেশ দিয়েছেন। নারীদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাদের পুরুষের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এদের স্বভাব বক্র। ক্ষমা করাই শ্রেষ্ঠ গুণ। ছেলেদের সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তত্ত্ব দিয়েছেন যা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। নিচে তার আর দু-একটি বাণী এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি ঃ

"বৈধ হওয়া সত্ত্বেও যা আল্লাহর নিকট অপ্রিয় তা হলো তালাক।" (আবু দাউদ)

"যে রমণী বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাকের জন্য প্রার্থনা করে, বেহেশ্‌তের সৌরভ তাহার জন্য হারাম।" (তিরমিজি, মিশকাত ও ইবনে মাজা)

"বিশেষ কোন অপ্রিয় কারণ না থাকলে স্ত্রীদিগকে তালাক দিও না। কারণ আল্লাহ্ স্বাদগ্রহণকারী পুরুষকে বা স্বাদগ্রহণকারিণী স্ত্রীলোককে ভালবাসেন না।" (সগির)

আমরা ওপরের বাণীগুলো হতে দেখতে পাচ্ছি যে, অপ্রিয় কারণ থাকলে যা স্বামী-স্ত্রীর জীবন বিষময় করে তোলে, একে অপরকে তালাক দিতে পারে। ইসলামের নিয়মানুযায়ী স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে তখনি, যখন তার স্বামী অত্যাচারী, লম্পট ও অধার্মিক হয় অথবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিতে স্বামী অপারগ হয় (মাতাল, নিরুদ্দেশ ইত্যাদি কারণে)। স্বামীও স্ত্রীর ব্যভিচারের অপরাধে, ব্যাধি, গরমিল, পিতামাতার প্রতি অসৎ ব্যবহার, জীবননাশের আশঙ্কা প্রভৃতি অপ্রিয় কারণে তালাক দিতে পারে। এখান থেকে বুঝা যায় যে শান্তি প্রতিষ্ঠাই তালাক প্রথার একমাত্র কারণ।

অন্যান্য জাতির মধ্যেও তালাক প্রথা আছে। জাপানি ও চীনারা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বে, ব্যভিচার, কর্কশতা, স্বামীর প্রতি অসৎ ব্যবহার, শ্বশুর-শাশুরির প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ ইত্যাদি কারণে তালাক দিয়ে থাকে।

ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে তালাক প্রথা নেই। স্ত্রী যত কর্কশভাষিণীই হোক, ব্যভিচারিণীই হোক বা উন্মাদিনীই হোক, বিচ্ছেদ হতে পারে না। স্বামীকে তালাক দিয়ে স্ত্রী কোন অবস্থাতেই অন্য স্বামীর দ্বারস্থ হতে পারে না। স্বামী ব্যভিচারী হোক, লম্পট হোক, দরিদ্র হোক, কুষ্ঠ রোগী হোক, দেবতা হিসাবেই আমরণ মানতে হবে। তাদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর পরও বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ হয় না। একদিকে এটা খুবই ভাল প্রথা। কেননা স্বামী স্ত্রী পরস্পর নিজেকে আপন করে নেবার প্রবৃত্তি মনের মাঝে গড়ে তোলে। যার ফলে সংসার সুখের হয়। কিন্তু প্রতিটি নারী-পুরুষই যে এই মনোভাবাপন্ন হবে, দুজনের যৌনকামনা একই ছাঁচে গড়া হবে, দুজনই যে সৎ ও সতী হবে এমন কোন গ্যারান্টি আছে কি? তাই দাম্পত্য জীবনে যখন ভাঙন ধরে, ব্যভিচারের নেশায় যখন স্বামী মাতাল হয়ে ওঠে, অত্যাচার উৎপীড়নে স্ত্রীর জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে অথবা স্ত্রী স্বামীর অক্ষমতায় ব্যভিচারিণী হয়ে অন্য পুরুষের অজ্ঞাশায়িনী হয় তখন বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক প্রথা কি হিন্দু, কি জৈন, কি খ্রিষ্টান সবার পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য দেখা দেয়। সর্ব জাতির জন্য যদি এ প্রথা মঙ্গলজনক বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে হিন্দুদের জন্য মঙ্গল নেই এ কথা কি কোন সুস্থ চিন্তাবিদ যৌনবিজ্ঞানী মেনে নিতে পারেন? অন্যায়কে কেউ মেনে নিতে পারে না। খ্রিষ্টানেরা আদালতের বিচারে এখন এ বিচ্ছেদ প্রথা সম্বন্ধে রায় দিচ্ছে—

"স্বামী যদি অন্য নারীকে নিয়ে ব্যভিচার করে, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মারধর করে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে অসমর্থ হয়ে ওঠে বা স্ত্রীকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় তবে সে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে। অনুরূপভাবে স্ত্রীও যদি ব্যভিচারিণী হয় বা অনুরূপ দোষে দোষিণী হয় তবে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে।"

এবারে আমরা দেখব কোন কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া চলে না। এ বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ কি সেটাও সর্বজাতির জানা প্রয়োজন। তাই সর্বধর্মের মতামত পৃথকভাবে উল্লেখ না করে শুধু তার বিধিনিষেধই তুলে ধরছি। আশা করি, সর্বজাতির রক্ষক, সকল দেশের সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা, দেশী-বিদেশী, সাদা কালো সকল নারী পুরুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর বিধান খুশির সঙ্গে সবাই মেনে নেবেন। তিনি বলেছেন—

"যাহারা স্বীয় পত্নীগণ হইতে পৃথক থাকিবার শপথ করে, তাহারা চারিমাস প্রতীক্ষা করিবে। অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়, এবং যদি তাহারা তালাক প্রদানের ইচ্ছা করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। এবং তালাক-প্রাপ্তাগণ নিজেদের জন্য তিন ঋতু পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে, এবং তাহারা যদি আল্লাহ্ ও পরকাল বিশ্বাস করে, তবে আল্লাহ্ তাহাদের গর্ভে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে। এবং ইহার মধ্যে যদি তাহারা সন্ধি কামনা করে তবে তাহাদের স্বামীই তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে সমধিক স্বত্ববান; এবং নারীগণের উপর তাহাদের যেরূপ স্বত্ব আছে, নারীগণেরও তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব আছে। এবং তাহাদের ওপর পুরুষগণের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময়।"[১]

পূর্বকালে আরবে একটা প্রথা ছিল যে, স্বামী স্ত্রীর ওপর বিরাগভাজন হয়ে স্ত্রীকে পৃথক করে রাখত কষ্ট দিত। তালাকও দিত না অথচ তার ভরণ-পোষণও করত না। এতে স্ত্রীর ভয়ানক কষ্ট হতো। আরববাসীদের এই শপথকে 'ঈলা' বলা হতো। আল্লাহ্ এই ঈলার সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন চার মাস। এই চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর মানসিক অবস্থার পরির্তন হতে পারে। সুদীর্ঘ চার মাসের বিচ্ছেদে যে কোন নারীই স্বামীর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ার কথা। কেননা স্বামীহীন জীবন মেয়েদের জন্য অভিশাপ। এছাড়া বিবাহিতা নারী যারা স্বামীর সঙ্গে সহবাস করেছে তারা কিছুতেই বাবা-মার বাড়িতে বেশিদিন কাটাতে পারে না। পুরুষগণ যেমন উতলা হয়ে পড়ে, নারীরাও তেমনি হাঁফিয়ে পড়ে। দাম্পত্য-জীবনের অশান্তি হেতু স্বামী অথবা স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু দীর্ঘদিনের এমন কারাবাস উভয়ের মনকেই তোলপাড় করে তোলে। স্ত্রী যেমন নিজের ভুল বুঝে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, স্বামীও তেমনি নিজ চরিত্রের দোষ কিছুটা অনুভব করে স্ত্রীর গুণাগুণ দেখতে পায়। শুধু আরবদেশেই এমন ঘটনা ঘটে নি। সব দেশেই সর্বযুগে এমন ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ বড় সুন্দর এবং সুস্পষ্ট। এই সময়ের মধ্যে দুজন যদি সংশোধিত হয় তবে আবার তারা বিনা দ্বিধায় দাম্পত্য-জীবন শুরু করতে পারে। এটা তালাকের মধ্যে গণ্য হবে না। শুধু শপথভঙ্গের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা অথবা আলেমদের মতে কাফ্‌ফারা দিতে পারে। আর যদি কোনক্রমেই মিলনের সম্ভাবনা না থাকে—স্ত্রীর অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বভাব এ চার মাসেও বিনষ্ট না হয়ে থাকে তবে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে।

১। কোরআন ঃ সূরা বাকারাহ, আয়াত ২২৬-২৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তিরই বিবেচ্য বিষয়। তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তাদের তিনটি ঋতু পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না। তিন ঋতু পার হবার পর অর্থাৎ এই তিনটি ঋতুর সময় উত্তীর্ণ হবার পরই কেবল নারী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। এরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। কেননা ক্ষণিক উত্তেজনা, সাময়িক কলহ ও অসঙ্গত কারণে যদি কেউ তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে এই সময়ের মধ্যেই তা বুঝতে পারবে এবং স্বামীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে। তালাক নিবারণের এটা একটা উৎকৃষ্ট সুযোগ। তিনটি ঋতু সম্বন্ধে যে নির্দেশ দেওয়া আছে তার বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। পুরুষের যে বীর্য নারীর জরায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয় তা জরায়ু অভ্যন্তর হতে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ হবার এটাই সর্বোচ্চ সময়। যদি এ সময়ের মধ্যে অন্য কোন পুরুষের বীর্য আবার তার জরায়ুতে প্রবেশ করে, তবে সমজাতীয় বীর্যের সংঘাতে জরায়ু আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। গনোরিয়া ও সিফিলিসের এটাই একমাত্র কারণ। দ্বিতীয়ত, যদি পূর্ব-স্বামীর সহবাসে নারীর পেটে বাচ্চার জন্ম হয়ে থাকে তবে তিন মাস সময়ের মধ্যেই তা প্রকাশ পাবে। আর প্রকাশ পেলে বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত ঐ নারীর বিবাহের প্রশ্নই আসে না। ইতিমধ্যে স্বামী যদি ঐ নারীর পেটে বাচ্চার জন্ম হয়েছে জানতে পারে তবে তাকে আবার গ্রহণ করতে পারে। আর যদি স্বামী তাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে তার দাবিই সমধিক। কোরআন এটা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে। **তালাক দেওয়া হলেও এ ক্ষেত্রে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ না দিয়েও ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করা চলবে।**

এই প্রতীক্ষা কালকে 'ইদ্দত' বলা হয়। পূর্বকালে তালাকপ্রাপ্ত নারীদের এই 'ইদ্দত' বা সময়সীমা ছিল না। মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর তারা নারীদের বিবাহ না দিয়ে ধরে রাখত এই ভয়ে যে, তালাকদাতা ঐ স্ত্রীকে পুনরায় দাবি করতে পারে। এমন অবিচার ও একতরফা নিয়মে নারীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তখন আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখত না। অথবা চরিত্রকে জলাঞ্জলি দিয়ে দাসীবৃত্তি বা ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। তাই আল্লাহর কঠোর বাণী পুরুষদের ওপর নিক্ষিপ্ত হলো এবং নারী-সমাজ জন্ম-জন্মান্তরের জন্য রক্ষা পেল।

কোরআনের শেষোক্ত বাণীতে নারী পুরুষের স্বত্ব বা অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর বিশ্লেষণও ব্যপক। এখানে ধন-সম্পত্তির অধিকার বা কর্তব্যের অধিকার নিয়ে আলোচনা করছি না। শুধু বিবাহ সম্বন্ধে ও বিবাহ বিচ্ছেদের ওপরই দু'একটি কথা বলছি। যখনই স্বামী-স্ত্রী বিবাহ সম্বন্ধে এক আত্মা হয়ে গেল তখন দুজনের ওপরই দুজনের সমান অধিকার। মান-সম্ভ্রম, খাওয়া-পরা, ছেলেমেয়েদের মানুষ করা, সংসারের যাবতীয় বস্তুর ওপরই তাদের সমদায়িত্ব। তবে পুরুষকে নারীদের থেকে বেশি অধিকার দেওয়া হয়েছে। কেননা এদের অধিকার বেশি না হলে সংসার অচল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। এছাড়া বুদ্ধি-বৃত্তি, শক্তি-সাহস সবকিছুই যেখানে নারীর চেয়ে পুরুষের বেশি, সেখানে অধিকার আপনা-আপনিই বেশি হতে বাধ্য। যে সংসারে নারীর অধিকার পুরুষের চেয়ে বেশি তার ধ্বংস অনিবার্য।

এবারে তালাক বা বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন। স্বামী যেমন নির্দিষ্ট কারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, স্ত্রীও তেমনি অনুরূপ কারণে স্বামীকে তালাক দিতে পারে। এবং 'ইদ্দত' কাল শেষে

সে নারী দ্বিতীয় স্বামীকে গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া স্ত্রী কিছু ধন-সম্পত্তি বা টাকা-পয়সা স্বামীকে দিয়ে তার নিকট থেকে তালাক নিতে পারে (শামা)। স্বামীকে সন্তুষ্ট করে স্ত্রী যে তালাক গ্রহণ করে শরীয়ত অনুযায়ী তাকে 'খোলা' বলা হয়। এ বিষয়ে কোরআন ও হাদিসের নির্দেশ হলো ঃ

"সাধিত-বিন-কাইসের স্ত্রী নবী (দঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, 'হে রসুলুল্লাহ! আমি সাধিত-বিন-কাইসের কোন দোষ পাই না চরিত্রের বা ধর্মে কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞতা করিতে চাই না ইসলামে থাকিয়া।'

রসুলুল্লাহ বলিলেন, 'তুমি কি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে চাও তাহার বাগান?' সে বলিল, 'হ্যাঁ।'

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "সাধিত তুমি ফিরাইয়া লও তোমার বাগান এবং তালাক দাও তাহাকে।"[১]

আল্লাহ্ বলেছেন, "এবং যদি তোমরা সম্মিলিত ও সংযমী হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়। এবং যদি তাহারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে আল্লাহ্ স্বীয় প্রাচুর্য হইতে তাহাদের প্রত্যেককে সম্পদশালী করিবেন এবং আল্লাহ্ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী।" (৪ ঃ ১২৯-১৩০)

স্ত্রী যদি স্বামীকে পছন্দ না করে, তার আচার-ব্যবহারে খুশি না থাকে, স্বামীকে দিয়ে যদি তার যৌন-পিপাসা না মেটে, তাহলে জোর করে তাকে স্বামীর ঘর করবার কোন বিধান আল্লাহ্ ও রসুল দেন নি। নর-নারীর শান্তিময় জীবন আল্লাহ্ ও রসুলের পছন্দ। হজরত (দঃ)-এর নিকট এরূপ অভিযোগ নিয়ে যে কত দম্পতি এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। এরূপ একটি ঘটনা হজরত (দঃ)-এর বাণীর মাঝেই খুঁজে পাই, যা নিম্নরূপ ঃ

ইবনে আব্বাস হতে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—"বরীরার স্বামী ছিল মুগীস নামে এক ক্রীতদাস। আমি যেন এখনও দেখিতেছি, সে বরীরার পিছনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিতেছে আর তাহার দাড়িতে অশ্রু ঝরিতেছে। অতঃপর নবী (সঃ) আব্বাসকে বলিলেন, "হে আব্বাস, তুমি কি আশ্চর্য হইতেছ না বরীরার প্রতি মুগীসের প্রেমে এবং মুগীসের প্রতি বরীরার ঘৃণায়?' নবী (সঃ) বরীরাকে বলিলেন, 'কি ভাল হইতে যদি তুমি ফিরিয়া যাইতে তাহার নিকট।' সে বলিল, 'হে রসুলুল্লাহ (দঃ)! আপনি আদেশ করেন আমাকে?' তিনি বলিলেন, 'না। আমি শুধু সুপারিশ করি।' সে বলিল, 'তবে আমার কোন প্রয়োজন নাই তাহাকে দিয়া।'[১]

শিক্ষার জন্য এমন দৃষ্টান্ত বিরল। জোর করে দাম্পত্য-জীবন গড়া যায় না। প্রেমহীন পরিণয় আত্মাহীন দেহের তুল্য। ইচ্ছার বিরুদ্ধে উদর ভর্তি করলে যেমন বমি আসে, মনের বিরুদ্ধে ভালবাসতে গেলেও তেমনি ঘৃণা আসে, একথা আমার রসুল (দঃ) জানতেন। তাই কঠোরভাবে আদেশ করলেন না বরীরাকে তার স্বামীকে নিয়ে ঘর করতে। বললেন, 'না, আমি শুধু সুপারিশ করি।' রসুল (দঃ) চেয়েছিলেন তাদের মিলন। কিন্তু যখন দেখলেন বরীরার অভক্তি ও ঘৃণা তার স্বামীর প্রতি, তখন তাদের মিলন ঘটাতে পারলেন না। কঠোর হতে পারলেন না। কেমন নবী (সঃ), কেমন তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি।

১। সহীহ বুখারী—তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ, তালাক পরিচ্ছেদ। হাঃ নং ৭/৬৯০।

১। সহীহ বুখারী—তর্জমা আবদুর রহমান খাঁ, তালাক পরিচ্ছেদ। হাঃ নং ৮/৬৯০।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তালাকের বিধিনিষেধ ঃ

"তালাক দুইবার, তৎপর তাহাকে নিয়মানুযায়ী রাখিতে পার অথবা সৎভাবে পরিত্যাগ করিতে পার এবং যদি উভয়ে আশঙ্কা করে যে তাহারা আল্লাহর সীমাসমূহ স্থির রাখিতে পারিবে না, তবে তোমরা তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহা হইতে কিছু প্রতিগ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে; অনন্তর যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তাহারা আল্লাহার সীমাসমূহ স্থির রাখিতে পারিবে না, তবে স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় প্রদান করে তাহাতে উভয়ের কোন দোষ নাই। ইহাই আল্লাহর সীমাসমূহ। অতএব উহা অতিক্রম করিও না। এবং যাহারা আল্লাহর সীমাসমূহ অতিক্রম করে বস্তুত তাহারাই অত্যাচারী। অনন্তর যদি সে তাহাকে তালাক প্রদান করে, **তবে ইহার পরে অন্য স্বামীর সহিত বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে তাহার জন্য বৈধ হইবে না**। তৎপর সে তাহাকে তালাক প্রদান করিলে যদি উভয়ে মনে করে যে আল্লাহর সীমাসমূহ স্থির রাখিতে পারিবে তখন যদি তাহারা পরস্পর প্রত্যাবর্তিত হয় তবে উভয়ের পক্ষে কোন দোষ নাই। এবং ইহাই আল্লাহর সীমাসমূহ, তিনি অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য উহা ব্যক্ত করেন। এবং যখন তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তালাক দাও পরে তাহারা স্বীয় নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয় তখন তাহাদিগকে নিয়মিতভাবে রাখিতে পার অথবা নিয়মানুযায়ী পরিত্যাগ করিতে পার। এবং তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিবার জন্য আবদ্ধ রাখিও না। তাহা হইলে সীমালঙ্ঘন করিবে এবং আল্লাহর নির্দেশাবলীকে বিদ্রূপচ্ছলে গ্রহণ করিও না; এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তোমাদিগকে উপদেশ দানের জন্য গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হইতে তিনি যাহা অবতরণ করিয়াছেন তাহা স্মরণ কর; এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী"। (২ ঃ ২২০-৩১)

পূর্বকালের মানুষ স্ত্রীকে তিন তালাক নয়, শত শত বার তালাক দিত। এমনও শোনা যায় যে, হাজার হাজার বার তালাক শব্দ উচ্চারণ করত। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এরূপ বিধি ছিল বলে হাদিস ও তফসীরে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এমন কু-প্রথা বিদ্যমান থেকে নারীদের জীবন মূল্যহীন হয়ে যেত বলেই আল্লাহ্ স্বয়ং বিধান দিলেন—তালাক দুবার। এটাই সীমাবদ্ধ নিয়ম। অপরিহার্য কারণবশত যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে হয় তবে দুটি ঋতুর মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ যখন স্ত্রী সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ থাকে তখনি মাত্র এক তালাক দিতে হবে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মধ্যবর্তীকালে যদি তারা দুজনেই সংশোধিত হয়ে মিলিত হয় তবে স্ত্রী গ্রহণযোগ্য হবে। দ্বিতীয় তালাক দেবার প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু যদি এর মধ্যে মনের মিল না হয় তবে দ্বিতীয় তালাক ঐ সময়ের মধ্যে দিতে হবে। দ্বিতীয় তালাক দেবার পর স্বামীর অধিকার থাকবে স্ত্রীকে গ্রহণ করার। এরপর তৃতীয় 'মহরে' অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ ঋতুর মধ্যবর্তী সময়ে তিন তালাক দিয়ে সৎভাবে স্ত্রীকে বিদায় দিতে হবে—এটাই অনেকের মত। কিন্তু কোরআনের মতে দু তালাকের সীমাই শেষ।

একই সঙ্গে দুই বা তিন তালাক নিষিদ্ধ। এছাড়া একই ঋতুকালের মধ্যেও দুই বা তিন তালাক চলে না। রসুল (দঃ) এটা নিষেধ করেছেন। এরও গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আছে। একসাথে তিন তালাক দিলে ঐ স্ত্রীকে সংশোধনের সময় দেওয়া হলো না। এছাড়া স্বামীও 'রুজু'[১]

১। রুজু অর্থ প্রতিগ্রহণ, প্রত্যাবর্তন বা পুনর্মিলন। প্রতীক্ষাকালের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার নাম 'রুজু'।

করবার অধিকার পেল না। আমি পূর্বেই বলেছি যে, মিলনের সুযোগ ঘটলে আত্মার সন্তুষ্টি ঘটে। আত্মার সন্তুষ্টি ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই ভালবাসার জন্ম হয়। তাই তালাকের সীমা যদি দীর্ঘ না হয়, তিনটি ঋতু কমপক্ষে অতিক্রম না করে, তবে এ সুযোগ ঘটবে না। দুজনে সংশোধিত হয়ে আবার চিনবারও সুযোগ পাবে না। সমাজে তালাকের দুর্ঘটনা যেন না ঘটে, সংশোধনের জন্য যেন প্রচুর সময় মেলে, এজন্যই ইসলামে এ সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রচলিত। তাই একসঙ্গে স্ত্রীকে দুই বা তিন তালাক দিয়ে বিতাড়িত করা পশুত্ব ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিবাহের সময় স্ত্রীকে যে মহর প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়, তালাকের পূর্বে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া **স্ত্রীকে যেসব গয়নাপত্র বা সম্পত্তি বিবাহের পর দেওয়া হয় সেগুলো ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়**। কেননা কোরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে—"তবে তোমরা তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহা হইতে কিছু প্রতিগ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে।" স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট হতে তালাক নেয় তবে স্বামীর পক্ষে অর্থগ্রহণ বা ঐসব জিনিসপত্র যা স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছিল তা খুশি হয়ে দিলে স্বামী গ্রহণ করতে পারে। এটা বৈধ। অথবা স্ত্রীর অবাধ্যতা, অন্যায়, ব্যভিচার ইত্যাদির ব্যাপারে যদি 'খোলা' সম্পন্ন হয় অর্থাৎ স্ত্রী তালাক গ্রহণ করে তবে অর্থগ্রহণ অসিদ্ধ হবে না। কিন্তু স্বামীর নির্যাতন, অত্যাচার বা প্রাণের ভয়ে যদি স্ত্রী বাধ্য হয়ে তার অলঙ্কার বা অর্থ প্রদান করে তালাক নেয়, তাহলে স্বামীর ঐ সকল গ্রহণ করা শরীয়ত অনুযায়ী হারাম।

আল্লাহর পবিত্র বাণী এর সাক্ষ্য দেয়—

"এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা কর এবং তাহাদের একজনকে ধনরাশি প্রদান করিয়া থাক, তথাপি তন্মধ্য হইতে কিছু প্রতিগ্রহণ করিও না; তবে কি তোমরা অপবাদ প্রয়োগ এবং প্রকাশ্য পাপ করিয়া উহা গ্রহণ করিবে? এবং কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে? বস্তুত তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে এবং তাহারা তোমাদের নিকট সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিল।" (৪ ঃ ২০-২১)

বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করাই আল্লাহ্ রসুলের বিধান। দোষ-ত্রুটি স্বাভাবিক। এর মিশ্রণেই মানব জীবন। কেউ বলতে পারবে না শতকরা একশ' ভাগ গুণ নিয়ে কেউ জন্মলাভ করেছে। একজনের রূপ আছে, গুণ নেই। একজনের গুণ আছে কিন্তু রূপ নেই। কেউ শান্ত, কেউ উচ্ছৃঙ্খল। আকৃতিতে সুন্দর না হলেও প্রকৃতিতে সুন্দর। তাই স্বামীর উচিত বিবাহিত স্ত্রী সে যত অসুন্দরী হোক, কম বুদ্ধিমতী হোক অপর এক নতুন অপরিচিতা সুন্দরীর চেয়ে অনেক গুণ ভাল। কারণ স্বামী স্ত্রীর যৌন-মিলনের ফলে অন্তরে বাইরে যে প্রেম-প্রীতি গড়ে ওঠে তা নতুনভাবে অন্য নারীর নিকট হতে পাওয়া কঠিন। তবুও একান্তই যদি স্ত্রীকে বর্জন করতে হয় তাহলে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে নয়, ভয়-ভীতি দেখিয়ে নয়। ধন-সম্পদ, অলঙ্কার, কাপড়-চোপড়, জমি-জমা—যা তাকে বিবাহের পর লিখিত অথবা অলিখিতভাবে অর্পণ করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণই তাকে বিদায় দেবার সময় দিতে হবে। এর মধ্য হতে কিছুই ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না। কোরআনের উপর্যুক্ত বাণী এরূপ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তালাকদাতা পুরুষদের জন্য সাবধান বাণী হিসাবেই ঘোষণা করেছে। যে নারী দেনমোহরের বিনিময়ে দেহ দান করেছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে, সে দেনমোহর পরিশোধ না করে যেমন তালাক দিতে পারে না—তেমনি তার প্রদত্ত জিনিসপত্র ফিরিয়ে নিতেও পারে না। যদি কেউ এ নির্দেশ ভঙ্গ করে সে আল্লাহর নিকট হতে কঠিন শাস্তি পাবে। বিচারকদের একথা মনে রাখা উচিত—যেন তাঁরা বিচারে অন্যথা না করেন।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে প্রথা চলছে তা সম্পূর্ণই গর্হিত, অনিয়মতান্ত্রিক, অসামাজিক ও কোরআন-হাদিসের বিপরীত। বিবাহের সময় মেয়েকে তার মূল্যায়ন স্বরূপ নগদে ও বাকিতে অলঙ্কার ও টাকায় (যে কোন অঙ্কের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে) পরিশোধ করতে হবে—এ প্রথাই যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। বিগত কয়েক যুগ ধরে এর বিপরীত অবস্থা চলে আসছে। এখন মেয়ের পক্ষ হতে তার বাবা-মাকে ছেলের জন্য এ মোহরানা দিতে হয়। ছেলেকে আংটি, ঘড়ি, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, কাপড়-চোপড়, খাট-পালঙ্ক, বিছানাপত্র, নগদে মোটা টাকা অথবা সজ্জিত দালান-কোটা ও ভূ-সম্পত্তি দান না করলে সমাজ রক্ষা হয় না। ছেলের মর্যাদা বাড়ে না। তার শিক্ষা ও বুদ্ধির মূল্যায়ন করা হয় না। ছোঁয়াচে রোগের মতো ধনী-গরিব সবাইকে আক্রান্ত করেছে। এ প্রথাটি একমাত্র হিন্দু-সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা মেয়েরা পিতার সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত হতো। এজন্যই মেয়ের পিতা তার সম্পত্তি বিক্রি করে অথবা নগদে বরকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে খুশি করত। মেয়ের আর দাবি থাকত না পিতার সম্পত্তির। বর এ অনুদান পেয়ে খুশি হতো। তার স্ত্রীকে আশীর্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করত। শান্তিতে দুজনে মিলে ঘর হতো। স্ত্রীকে কোন কারণেই অত্যাচার করে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে বাড়ি হতে চিরবিদায়ের তালাকনামা দিত না। স্বামী কালো হোক, গরিব, হোক, শ্বশুর-শাশুরি, দেবর-ভাসুর অত্যাচারী হোক মেনে নিতেই হবে। মেয়ের উপায় নেই—অধিকার নেই, সমাজের বিধান নেই, ম্যারেজ রেজিস্টারের ক্ষমতা নেই মেয়ের পক্ষ হতে ডিভোর্স নেবে। তাই বাধ্য, স্বামীর ঘর করতে। ছেলে-মেয়ের আশায় দিন গুনতে। কিন্তু মুসলিম-সমাজে স্বামী অথবা স্ত্রী দুজনেরই অধিকার রয়েছে অত্যাচার, গরমিল, যৌন-অক্ষমতা, উৎপীড়ন, ভয়াবহ রোগ, অশান্তির কারণে একজন অন্যজনকে তালাক দিতে পারে। এখন কথা হলো বিবাহের সময় যে যৌতুক দিয়ে ছেলেকে ও তার বাবা-মাকে কন্যার বাবা খুশি করেছিল—সে যৌতুক তার স্ত্রীকে তালাক দেবার পর সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দিতে হবে কি না? বিচারকগণ কি রায় দেবেন?

ছেলে যদি স্বার্থের লোভে, চরিত্রের দোষে, অন্য নারীর প্রেমে পড়ে অথবা যৌন-অক্ষমতার কারণে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে যে যৌতুক নিয়েছিল—তার পাই-ক্রান্তি পর্যন্ত তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

আর মেয়ে যদি অন্য পুরুষের প্রেমে পড়ে অথবা স্বামীকে কটাক্ষপাত করে তার সুমহান চরিত্রে কলঙ্ক দিয়ে বা স্বামীর দারিদ্র্যতার কারণে, দ্বিতীয় বর কামনা করে স্বামীকে ডিভোর্স করে, তবে ঐ নারী তার পিতার দেওয়া জিনিসপত্র ফিরে পাবে না। কেননা সে যে অশান্তির সৃষ্টি করল, সংসারে আগুন ধরিয়ে দিল তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে ঐ হতভাগা স্বামীর হৃদয় শান্ত করতে পারবে না।

তালাকপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্ত ঃ

তালাকের তিনটি অবস্থা বিদ্যমান। প্রধানত, তালাকপ্রাপ্তা রমণীকে 'ইদ্দত' সময়ে রুজু বা প্রতিগ্রহণ করা। দ্বিতীয়ত, প্রতিগ্রহণ না করলে প্রতীক্ষাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা। প্রতীক্ষাকাল শেষে স্ত্রী স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্ত্রী ইচ্ছা করলে পূর্ব স্বামীকে কিংবা অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু তিন তালাকের পর স্বামী-স্ত্রী চিরবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এসব নারীদের অন্যত্র বিবাহ না হলে পূর্ব-স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না—এটাই হলো চরম প্রায়শ্চিত্ত। ভুল বুঝার অবসান হলেও, পূর্ব-স্বামীর প্রতি মায়া-মমতা হলেও, প্রেমের পুরানো ইতিহাস মনে পড়ে যৌন-জীবনের মূল্যগুলো স্মৃতিপটে দোলা দিলেও কোন উপায় নেই। প্রতীক্ষাকালে যেহেতু স্বামীকে খুশি করে পুনর্মিলিত হবার সুযোগ গ্রহণ করে নি ও স্বামীর প্রাণে ঢুকে তার ভুল স্বীকার করে নি, তাই অন্য পুরুষের দ্বারা ধর্ষিতা তাকে হতেই হবে। মান-ইজ্জত ও সম্মানের কোন দোহাই চলবে না। কঠোর সামাজিক এ বিধি। এ বিধিকে ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা কোন কিছুর বিনিময়েই খণ্ডন করা চলবে না। দেখুন এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন মানুষের নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)।

হজরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত—"রিফায়া কুরায়ীর স্ত্রী রসুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আসিয়া বলিল, 'হে রসুলুল্লাহ, রিফাইয়া আমাকে তালাক দিয়াছে এবং বাইন তালাক দিয়াছে। তারপর আমি আবদুর রহমান-বিন-যবীর কুরায়ীকে বিবাহ করিয়াছি। কিন্তু তাহার পুরুষাঙ্গ কাপড়ের ঝালরের মতো।"

তিনি বলিলেন, "তুমি হয়তো ফিরিয়া যাইতে চাও রিফাইয়ার নিকট কিন্তু তাহা হইতে পারে না, যতক্ষণ না সে স্বাদ গ্রহণ করে তোমার কিছু মধু আর তুমি স্বাদ গ্রহণ কর তাহার কিছু মধু।"[১]

ওপরে বর্ণিত হাদিস হতে দেখা যাচ্ছে যে, যতদিন পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী ঐ নারীর স্বাদ গ্রহণ না করবে অর্থাৎ তার সঙ্গে সঙ্গম না করবে ততদিন পর্যন্ত ঐ স্বামীকে পরিত্যাগ করে পূর্ব-স্বামীকে গ্রহণ করতে পারবে না। এর চেয়ে শাস্তি, এর চেয়ে অপমান নারীর জীবনে আর কি হতে পারে? রাজা, বাদশা, মন্ত্রী বা যে কোন সুযোগ্য লোকের মেয়েই হোন না কেন, এ শাস্তি, এ গুরুতর প্রায়শ্চিত্য তাকে করতেই হবে।

তালাক নেওয়া খুব সোজা কথা নয়। ইচ্ছে করে স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য পুরুষের স্বাদ গ্রহণ করার লালসাও তত সোজা নয়। দ্বিতীয় স্বামী গরিব, অত্যাচারী ও পুরুষত্বহীন হলেও আবার পূর্ব-স্বামীকে ফিরে পাবার কল্পনাও দুর্গম গিরির মতো কঠিন, খুবই কঠিন। এমন ব্যবস্থা সমাজে না থাকলে ধনাঢ্যা, অভিমানিনী, গর্বিনী ও আত্ম-অহঙ্কারিণী নারীরা বছরে পাঁচ দশবার স্বামীকে তালাক দিয়ে মধুগ্রহণ করতে পারত। কিন্তু সে সুযোগ দেওয়া হয় নি। তবে হ্যাঁ, একটা সুবিধে তবুও আল্লাহ্‌পাক দিয়েছেন—দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হলে অথবা তার নিকট থেকে তালাকপ্রাপ্তা হলে প্রথম স্বামীকে আবার বিবাহ করতে পারে। এর চেয়ে দুঃখে হোক, দারিদ্র্যে হোক প্রথম স্বামীকে নিয়ে জীবন কাটানই কি গৌরবের নয়?

১। তজরীদুল বুখারী, তর্জমা পূর্বে বর্ণিত, ৫/৩৬৮।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুরুষের প্রায়শ্চিত্তও ঠিক নারীর অনুরূপই। প্রতিক্ষাকালের মধ্যে যদি সে দোষ-ত্রুটি চোখে না দেখে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, এরপর অনুতপ্ত হয়ে অথবা স্ত্রীর গুণাগুণ মনে পড়ে আবার গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে তাকেই বা কি করে বিনা প্রায়শ্চিত্তে সে নারীকে গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া চলে? যদি একান্তই সে তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নেবার সাধ করে তবে তাকে জানতেই হবে এবং উপযুক্ত সাক্ষী গ্রহণ করতেই হবে যে ঐ নারী দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস করেছে। এ জানা ও শোনাই হবে তার চরম শাস্তি। নিজের স্ত্রী অন্যের দ্বারা ধর্ষিতা হচ্ছে, অন্যের কাছে তার আত্মা বিক্রি করেছে, একথা শোনবার মতো চরম অবমাননা পুরুষের জীবনে আর কিছু নেই। তাই তার মানসিক শাস্তি হিসাবেই এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, অন্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তালাকপ্রাপ্তা হবার পর যদি ঐ নারী পূর্ব-স্বামীকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়, তবেই তাকে বিবাহ করতে পারবে, নতুবা নয়। খেয়াল-খুশি মতো স্ত্রীকে তালাক দেবে আবার তাকে নিয়েই ঘর-সংসার করবে—এমন বিশৃঙ্খল নিয়ম আল্লাহ্ ও রসুল দিতে পারেন না। যারা ধর্মের বাঁধন মানে না, যারা ইচ্ছামতো যে কোন নারীকে ধর্ষণ করতে চায়, তাদের কথা ভিন্ন। স্ত্রীও যেমন দশ বিশটা পুরুষের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে, পুরুষও তেমনি শত শত নারীর সর্বনাশ করতে পারে।

ঘন ঘন স্বামী পরিবর্তন, ঘন ঘন স্ত্রী পরিবর্তন ও পরিত্যাগ করার ফ্যাশান বহু দেশে এখনও প্রচলিত আছে। সাহারা মরুভূমির নারীরা এক স্বামীকে নিয়ে জীবন কাটানোকে ঘৃণার চোখে দেখে। গ্রীক, জার্মান ও রোমান জাতির মধ্যে ঘন ঘন স্ত্রী পরিত্যাগের ব্যবস্থা ছিল। সবচেয়ে সভ্যজাতি বলে আমরা যাদের আখ্যায়িত করি তাদের কথা আরও স্বতন্ত্র। যাকে যখন চোখে ভাল লাগে তখনি বিবাহ করে। আবার একটু ব্যতিক্রম ঘটলেই তালাক দেয়। কথাটি হয়তো গাঁজাখুরি বলে মনে হচ্ছে। তাই প্রমাণ দিতেই একটি চিত্র তুলে ধরছি। এ চিত্রটি আমরা দেখতে পাই 'Review of Review' by Mr. Lurin, Volume 35-এ। তিনি লিখেছেন—আমেরিকার একটি অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৮৯৭ সালে দু'হাজার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। আর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে ৬৪১টি অর্থাৎ প্রতি তিনটি বিবাহের মধ্যে একটি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। তার রিপোর্টটি থেকে আরও জানা যায়—

"(১) যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট রাজ্যে প্রতি দশটি বিবাহে একটি তালাক। (২) ম্যাসাচুয়েটসে প্রতি একশ'টি বিবাহে একটি তালাক। (৩) রোসলান রাজ্যে প্রতি তেরোটি বিবাহে একটি তালাক। (৪) চিকাগোতে প্রতি আটটি বিবাহে একটি তালাক।"[১]

এই সুসভ্য দেশ আমেরিকার সুসভ্য নারীরা কোন সময় যে নতুন স্বামী গ্রহণ করে আর কোন সময় যে তার অভাগা স্বামী তালাক হয়ে যায় তার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, "মজার ব্যাপার এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই স্বামী যখন তাঁর স্ত্রী কর্তৃক তালাক গ্রহণের সংবাদ পায়, তখন হয়তো দেখা যায় তার স্ত্রী ইতিমধ্যেই নতুন স্বামী গ্রহণ করে ফেলেছে।"[২]

---

১ ও ২। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী—ফরিদ ওয়াজেদী আফিন্দী। বাংলা তর্জমা—হাফেজ আজিজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা নং ২৮১/২৮২।

এমন মজা শুধু যে আমেরিকার নারী পুরুষগণই করে থাকে তা নয়। গ্রীনল্যান্ডের অধিবাসীরা মাত্র ছয় মাসের জন্য বিবাহ করে। এরপর দু'জনই দু'জনের কাছে পুরনো হয়ে যায়। তাই নতুন কাপড় পরিধানের মতো নতুন স্ত্রী গ্রহণ করে। শিয়া সম্প্রদায় (ইশনা আসারিয়া দল) কয়েক ঘণ্টার জন্য বিবাহ করে—এর নাম 'মুতা বিবাহ'। এই মুতা বিবাহের মেয়াদ বৃদ্ধি করে নিরানব্বই বছরও করা হয়। ওয়ানডট্ সম্প্রদায়ের লোকেরা আর একটু উদারতা দেখিয়ে ঘণ্টার পরিবর্তে কয়েকদিনের জন্য বিবাহ করে এবং মজা উপভোগ করা শেষ হলে তালাক দেয়। বহু দেশের বহু জাতিই এমন মজা উপভোগ করে। শুধু মুসলমান সুন্নি সম্প্রদায় এবং ভারতীয় হিন্দুগণ এ দিকে অনেক পিছিয়ে। এরা তালাকের নাম শুনলে যেমন চমকে ওঠে, তেমনি নারীরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় রূপ বদলিয়ে পুরুষের গলার কাঠি হবে, এটা শুনলে সুস্থ নারীও হার্টফেল করবে। জানি না, কোন প্রথাটি সুন্দর আর কোনটাই বা অসুন্দর। সভ্য সমাজের সভ্য নীতি আমাদের মতো অসভ্য মানুষের জন্য ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অনাদৃত। হয়তো সেদিন দূরে নয়, যেদিন ওদের নীতিই সারা বিশ্বে সমাদৃত হবে। ইসলামের উদারনীতি, সুষ্ঠ ও সুন্দর সমাজব্যবস্থা নারীকে যেমন রক্ষা করেছে, পুরুষকেও তেমনি স্বাধীনতা দিয়েছে। নারীর ওপর পুরুষের যেমন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তেমনি নারীকেও পুরুষের সম অধিকারিণী বলে ঘোষণা করে নারীর মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। শুধু বাধা দিয়েছে নির্মম পরিহাসের সঙ্গে নারীকে ইচ্ছামতো তালাক দিতে ও ইচ্ছামতো গ্রহণ করতে। এ বিধি অভিনন্দিত না হয়ে পারে না, এ বিধি মঙ্গল না এনে পারে না। কেননা এটা সর্বজাতির স্রষ্টা মহান আল্লাহর বিধান।

কিভাবে তালাক হয়?

আমি পূর্বেই লিখেছি—গড়া কঠিন, কিন্তু ভাঙা খুবই সোজা। আমাদের অসতর্ক কথার মাঝে যে স্ত্রী তালাক হয়ে যায় এ জ্ঞান সাধারণ মানুষের কেন, অনেক এম. এ. পাস শিক্ষিত লোকেরও নেই।

ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রাগ, অভিমান, হাসি-কান্না, ভয়-ভীতি প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবেশে যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে 'তোমাকে তালাক দিলাম' তবে তখনি সে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। শুধু ব্যতিক্রম নাবালক, পাগল ও মতিবিভ্রম লোকদের বেলায়।

দুই বোনকে বিবাহ করলে, চার স্ত্রীর অধিক বিবাহ করলে তালাক হয়ে যাবে। কোন স্ত্রী তালাক হবে এটা অবশ্য হাদিস অনুযায়ী জানতে হবে।

আর একটি বিষয় অবশ্য আমাদের জানা উচিত। কেউ হয়তো বিবাহ করেছে এই ভেবে যে, তার স্ত্রী কুমারী। কিন্তু কিছুদিন পর জানা গেল যে, ঐ মেয়েটির অন্যত্র বিবাহ হয়েছে। তার স্বামী মরে যায় নি অথবা তালাকও দেয় নি। তাহলে কি হবে? ঐ মেয়েকে নিয়ে কি সংসার করা চলবে? না, আইনত সে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে যদি পরবর্তী স্বামীর সঙ্গে সঙ্গম হয়ে থাকে তবে ঐ মেয়েকে 'ইদ্দত' কাল পালন করতে হবে। (তিনটি ঋতুকাল—তিন মাস)

স্বামী-স্ত্রী একত্রে বাস করতে হলে, সুখী সংসার গড়ে তুলতে হলে খুব সতর্কতার মাঝেই করতে হবে। প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীকে ইসলামের নিয়ম-কানুন জানতে হবে, নইলে সামান্য অসতর্কতার মাঝেই বিপদে পড়ে হাবুডুবু খাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নারী-স্বাধীনতা

মুক্ত মনে, মুক্ত পরিবেশে ও মুক্ত চিন্তাধারার মাঝে জীবন অতিবাহিত করার নামই স্বাধীনতা। পাখিরা নিশ্চিন্তে আকাশে উড়ে বেড়ায়, বনের পশু মনের আহ্লাদে শিকার ধরে খায়, সমুদ্রের অথৈ জলে জীবজন্তু ঘোরাফেরা করে। বাধা নেই, বিপত্তি নেই, অধীনতার কোন চিন্তা নেই, খাবার চিন্তা নেই, ঘুমের চিন্তা নেই, বাসা-বাড়ির কোন ভাবনা নেই। এরাই হলো স্বাধীন, প্রকৃত স্বাধীন।

মানুষ কি এই স্বাধীনতা ভোগ করে? কেউ কি কারো অধীন নয়? জন্মের প্রথম থেকেই দেখা যায় মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী। শিশু মায়ের মুখাপেক্ষী, মাতা স্বামীর মুখাপেক্ষী, স্বামী তার প্রভুর মুখাপেক্ষী। প্রভু রাজার মুখাপেক্ষী। রাজা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। কি সুন্দর একটা বাঁধন! এ বাঁধনের অস্বীকার অর্থই প্রকৃতিকে অর্থাৎ আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করা। যদি কেউ বলে—না, আমরা তা মানি না, সবই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেউ কারো অধিকারে নয়। শিশু মায়ের মুখাপেক্ষী নয়, নারীও পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়। নিজ ক্ষমতা ও বুদ্ধির ওপরই নির্ভরশীল। এটা কি হাস্যাস্পদ কথা হবে না? কোন বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতি কি একথা স্বীকার করবে? শিশুর স্বাবলম্বীর কথা কেউ তুললে তাকে ঢিল ছুঁড়বে। নারীরা হয়তো বলবে যে শিশু নির্ভরশীল হলেও আমরা নির্ভরশীল নই। আমাদের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, কাজ করার ক্ষমতা আছে। পুরুষের সমতালেই আমরা শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করছি। মিল-ফ্যাক্টরিতে কাজ করছি। রাজ্য শাসন করছি, করছি না কি? আমাদের স্বাধীনতা দিলে, পর্দার বাইরে টেনে এনে বুদ্ধি বিকাশের সুযোগ দিলে, উপার্জনের, আবিষ্কারের সুযোগ দিলে পুরুষের চেয়ে কম দক্ষতা দেখাব না! বেশ কথা, পাশ্চাত্য দেশের নারীদেরও তো শতকরা একশ' ভাগ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কই, ক'জন নারী নব আবিষ্কার দ্বারা জগৎ স্তম্ভিত করেছে? ক'জন নারী সৈনিক বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে রাজ্য জয় করেছে? কোন্ নারী সমুদ্রের তল থেকে মুক্তা আহরণ করেছে? নাবিক হয়ে দেশ-দেশান্তরে পাড়ি জমিয়েছে? কে আকাশ ভ্রমণ করে বিজয়মাল্য নিয়েছে? কে সাহস করে হিমালয়ের শৃঙ্গে অভিযান করেছে? গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে কে সিংহ, গণ্ডার, হাতি, বাঘ ও অজগরের কান ধরে খাঁচায় পুরেছে? যত সব অসাধ্য, দুঃসাধ্য কঠিন কাজগুলি পুরুষকে দিয়ে করানো আর অধিকারের বেলায় সমান দাবি এ দাবি কে মানবে? পুরুষ চাষ-আবাদ না করলে খেতে পাবেন না, কঠিন পাথর না ভাঙলে ইমারতে থাকতে পারবে না, ভূগর্ভে গিয়ে খনিজ দ্রব্য আহরণ না করলে চুলা জ্বালাতে পারবে না, অলঙ্কার করতে পারবে না। আপনি স্বাধীন হতে চাইলে প্রকৃতি কি আপনাকে স্বাধীনতা দেবে? পুরুষের শরীরের শক্তি কেড়ে নিতে পারবেন? পুরুষের সাহস, বলবীর্য কি আপনি চুরি করতে পারবেন? পুরুষের পেটে কি বাচ্চা দেবার ব্যবস্থা করে আপনি রেহাই পাবেন? এদের পৌরুষত্বের দাড়ি গোঁফ নিয়ে আপনি শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবেন? ভেবে দেখুন আপনাদের যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যে স্বাধীনতা আপনারা ভোগ করছেন তা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। পুরুষ আপনাদের জন্য কি না করে? জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিলিয়ে দিয়ে জীবন

সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দৈহিক ও মানসিক শ্রম দিয়ে আপনার মুখে হাসি ফোটায়। সারাদিনের পরিশ্রমিক বিনা দ্বিধায় আপনার হাতে তুলে দেয়। আপনার পেটের ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আপনার ক্ষুধার উপশম করতে চুরি করে, ডাকাতি করে, বাঘের মুখ থেকে হরিণ ছিনিয়ে নেয়। আকাশে-বাতাসে-পাতালে-সলিলে আপনার জন্যই অভিযান করে। নইলে এত বেশি হাড়ভাঙা খাটুনি, নিন্দা, অপমান সইবার তার কি প্রয়োজন ছিল? যা কিছু সে অর্জন করে তা দিয়ে খেয়ে-পরে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারে। জীবন-সংসারে আপনারাই সুখী ও স্বাধীন। পুরুষ বরং আপনাদেরই গোলাম।

পুরুষ তার এ পরিশ্রমের বিনিময়ে চায় শুধু আপনার হাসি, আপনার খুশি, আপনার আনুগত্য ও সেবা। এটা পূরণ করতে না পারলে দেখা দেবে দাম্পত্য-জীবনে অশান্তি, চরম অশান্তি।

নারীর কি অধিকার ছিল, কিরূপ স্বাধীনতা ছিল ইতিহাসের পাতা খুলে একবার দেখুন। নারী-চরিত্র বিশ্লেষণ করে যুগে যুগে দার্শনিক, পণ্ডিত, নবী ও পয়গম্বরগণ এ জন্যই নারী স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। নারীদের সম্মান রক্ষার্থেই পর্দার ব্যবস্থা করে অন্তঃপুরে বাস করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আমরা যদি সে উপদেশ মানতাম তবে সমাজে কোনদিনই দ্বন্দ্ব কোলাহল হতো না। বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে নারী পুরুষকে আদর্শচ্যুত করত না। প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আল্লাহর বিধানকে সম্মুখে রেখেই এসব মহাজ্ঞানী ও মহামনীষীরা আমাদের জন্য উপদেশ রেখে গেছেন। হজরতের বাণী ধরেই আমরা পর্দার আলোচনা শুরু করেছি এবং কিছুটা আলোচনা করেছি। এবারে কয়েকজন অমর দার্শনিকের নারী স্বাধীনতার ওপর তাঁদের যে মন্তব্য ছিল তা তুলে ধরছি। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ, সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ডক্টর প্রোডন তাঁর 'ইবতে কারুন নিযাম' গ্রন্থে লিখেছেন—"প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান, কর্ম ও ন্যায়পরায়ণতা—এই তিনটি উপাদানে সমাজ সংগঠিত হয়। এখন বিচার করে দেখুন যে, উক্ত তিনটি উপাদানে নারী ও পুরুষের কতটুকু অংশ আছে এবং উভয়ে কতটুকু পরস্পর বিরোধী। সমাজ-জীবন আমাদের বলে দিচ্ছে যে, জ্ঞান, কর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক পার্থক্যের অনুরূপ। কাজেই যারা নারীর জন্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবি করে, প্রকৃতপক্ষে তারা নারীদের পাপের বন্দিশালার চাইতে কোন অংশে কম নয়।"[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর নক্ষত্র স্যামুয়েল স্মাইলস, যিনি ইংলন্ডের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছেন এবং যাঁর গ্রন্থাবলী বাইবেলের মতো পবিত্র মনে করে ইউরোপের প্রতি ঘরে ঘরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থান পেয়েছে—তিনি ইংলন্ডের স্বাধীন নারীদের চরিত্র পর্যালোচনা করে লিখেছেন—"আদিম যুগে রোমীয়গণের মধ্যে ভণ্ড সংসারধর্মিণী নারীর যে গুণটিকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হতো তা ছিল এই যে, তারা গৃহের মধ্যে বাস করুক এবং বাইরের হাঙ্গামা হতে দূরে থাকুক। আমাদের বর্তমান যুগেও বলা হয়ে থাকে যে নারীর ভৌগোলিক জ্ঞান অর্জন করা এজন্যই আবশ্যক, যাতে তারা স্ব স্ব

১-৩। সংগৃহীত 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী'। বঙ্গানুবাদ—হাফেজ আজিজুল ইসলাম। পৃষ্ঠা ১৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

গৃহের নির্ভুলভাবে জানালা তৈরি করে নিতে পারে এবং পদার্থ বিজ্ঞান আয়ত্ত করা এজন্যই প্রয়োজন যেন রান্নাকালে তারা ফুটন্ত হাড়ি রক্ষা করতে সক্ষম হয়। কেননা লর্ড বায়রন নারীদের প্রতি এরূপ অভিমত পোষণ করেন যে নারীদের পাঠাগারে 'বাইবেল' ও 'পাক-প্রণালী' ছাড়া অন্য কোন পুস্তক থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।"[২]

মনস্তাত্ত্বিক দর্শনশাস্ত্রের প্রধান, সামাজিক শৃঙ্খলার উদ্ভাবক পণ্ডিত 'আগস্ট কোল্ট' তাঁর 'মনস্তাত্ত্বিক দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী রাজনৈতিক শৃঙ্খলা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—"আমাদের যুগে যেমন নারীদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বহুবিধ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি সকল যুগেই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়ে আসছে; কিন্তু প্রকৃতির যেসব মৌলিক বিধান নারীদের গার্হস্থ-জীবনের জন্য নির্দিষ্ট করে, সেগুলিতে কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় নি। এই ঐশী বিধানটি এতই সুষ্ঠু ও প্রতিষ্ঠিত যে এর বিরুদ্ধে অগণিত ভ্রান্ত মতবাদ গড়ে ওঠা সত্ত্বেও এই বিধানটি কোনরূপ পরিবর্তন বা কাটছাঁট ব্যতিরেকেই সর্বদা সবকিছুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।"[৩]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "নারীর বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের নিকট যে সকল পার্থিব উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য দাবি করছে তৎসমুদয়ই অবাস্তব এবং অসম্ভব; কেননা তা উল্লিখিত প্রাকৃতিক আইন ও ঐশী বিধানের সঙ্গে খাপ খেতে পারে না। আর যেহেতু এরূপ আকাঙ্ক্ষা ঐশী বিধানের পরিপন্থী এবং ঐশী নির্দেশকে রদ করতে চায়, সেহেতু সমাজের কোন অংশ বা শ্রেণীই এই স্বভাবগত অপরাধের মারাত্মক পরিণতি হতে নিরাপদ থাকতে পারে না।"[১]

একথা সবাই জানেন যে, পূর্ব-যুগে রোমীয় সভ্যতাই ছিল দুনিয়ার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা। কিন্তু কালচক্রে সে সভ্যতা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় কেন? এর কারণ কি? যখন সভ্যতা বিরাজ করছিল, দেশ-বিদেশে রোমের মর্যাদা বিস্তার লাভ করছিল, তখন তাদের নারী-সমাজ পর্দার অন্তরালে ছিল। নারী নিয়ে কোন হৈ চৈ হয় নি। আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে একে অপরের সংহারের চিন্তা করে নি। সবাই ছিল কর্মব্যস্ত। বুদ্ধি বিকাশের সুযোগ ছিল প্রচুর। কিন্তু নারীরা যখন অবাধ গতিবিধির আওয়াজ তুলল, পর্দার অন্তরাল থেকে বহির্বাটীতে এসে দাঁড়াল, রাজনীতির চক্রে আবর্তিত হলো তখনি শুরু হলো আত্মঘাতী সংগ্রাম। নারীদের পর্দাহীনতা, বিলাসপ্রিয়তা ও রূপচর্চার মোহে পুরুষ হারিয়ে ফেলল তার নিজ সত্তা, শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। পদস্থ কর্মচারী ও রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ চঞ্চলা, চপলা, বিলাসপ্রিয় রমণীদের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। এ সুযোগে অন্তঃপুরবাসিনী নারীরাও ঘরের বাইরে এসে গোপনে বেশ্যাবৃত্তি শুরু করল। চলল ব্যভিচারের তাণ্ডবলীলা—সার্কাস, মেলা, তীর্থস্থান ও শহরের রাস্তায় নারীর ভিড়। যে যাকে পছন্দ করে সঙ্গে নিয়ে রাত কাটায়। নারী পুরুষের উলঙ্গ স্নান করার প্রথা প্রবর্তিত হলো। ইতালির সমস্ত হাম্মামখানাগুলো ব্যভিচারের কেন্দ্ররূপে পরিণত হলো। পুরুষেরা তাদের আয়ের অধিকাংশই এ প্রমোদ বিহারে ব্যয় করে সর্বশান্ত হতে লাগল। নারীরা তা সদ্ব্যবহার করে আমোদ-আহ্লাদ ও অর্থে পুষ্ট হতে লাগল।

১। সংকলিত 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী'। বঙ্গানুবাদ—হাফেজ আজিজুল ইসলাম। পৃষ্ঠা ১৬।

তাছাড়া প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে তারা রাজা-বাদশাহদের পদচ্যুতি ঘটাতে শুরু করল। বিশ্বকোষই এর প্রমাণ—

"রোমান সম্রাটদের রাজত্বকালেই নারীদের মধ্যে বিলাসপ্রিয়তা এবং রূপচর্চার প্রতি উন্মাদনাকর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। নতুবা রোমান সাম্রাজ্য যখন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল এবং তাহারা বাড়িতে বসিয়া সূতা কাটিয়াই অবসর বিনোদন করিত। কিন্তু পরবর্তীকালে সেখানে বিলাসিতার প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত খ্যাতনামা দার্শনিক 'কটন' তাঁহার স্ব-জাতিকে তাহাদের অনিবার্য ধ্বংসের ইঙ্গিতবাহী এই মহাশঙ্কা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।"[১]

নারীরা যখন প্রকাশ্যে দাবি করে বসল, "তোমরা পুরুষগণ যেমন শাসকর্তা নির্বাচনের অধিকার ভোগ করিয়া থাক, তেমনি অধিকার আমাদেরও দেওয়া হউক। আমাদের ভোটও গ্রহণ করা হউক। আমরা ইহাও চাই যে আমাদের খরচপত্র ও সাজ-সজ্জার উপকরণের যেন কোন সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া না হয়।"[২]

দার্শনিক 'কটন' রোমীয় নারীদের এ উদ্যত আচরণ অহেতুক দাবি ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভয়াবহ রূপ দেখে সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর চোখের সম্মুখে জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠল রোমের অবনতি। দুর্দশা চরম অবস্থা, পরাজয়ের সকরুন এক চিত্র। তাই স্বজাতির এক বৃহৎ সমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"হে রোমের বাসিন্দাগণ! তোমরা কি মনে কর যে, সমস্ত বন্ধন রমণীকুলকে পূর্ণ স্বাধিকার না দিয়া বরং তাহাদিগকে নিজ নিজ স্বামীর অনুগত থাকিতে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছে। রমণীকুলকে ঐ সকল বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার দানের পর তাহাদের অবদান রক্ষা করা এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা কি সহজসাধ্য হইবে? অথচ বর্তমানে এই সমস্ত বন্ধন থাকা সত্ত্বেও আমরা রমণীকুল দ্বারা তাহাদের উপর অর্পিত অপরিহার্য ও দায়িত্বসমূহ অতিকষ্টেও পালন করাইতে পারিতেছি না। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে রমণীকুল যে আগামীতে পুরুষদের সমকক্ষতাই দাবি করিয়া বসিবে এবং পুরুষদিগকেই একদিন রমণীদের অনুগত হইতে বাধ্য করিয়া ছাড়িবে—এ কথাটি কি তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না? তোমরাই বল দেখি, যে মহিলারা শোরগোল আরম্ভ করিয়াছে এবং এ ধরনের বিদ্রোহমূলক সমাবেশ ঘটাইতেছে তাহারা নিজেদের এই দোষ স্খলনের জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ দিতে পারে কি? হে রোমীয়গণ! তোমরা আমাকে প্রায়ই নারী ও পুরুষদের অপব্যয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিতে দেখিয়া থাকিবে এবং আমি সাধারণ লোকদের ছাড়াও স্বয়ং আইনবিদ এবং আইন প্রণেতাদের বিরুদ্ধে অপব্যয়ের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছি। তোমরা হয়তো আমার মুখে প্রায়ই একথা শুনিয়া থাকিবে যে, আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার দুইটি বিপরীতমুখী ব্যাধিতে আক্রান্ত। একটি কৃপণতা এবং অপরটি বিলাসপ্রিয়তা। স্মরণ রাখিও, এই দুইটি ব্যাধি অনেক বিরাট বিশাল সুসভ্য ও চরমোন্নত দেশকে ছারখার করিয়া দিয়াছে এবং তোমাদের ওপরও সেই দুর্দিনই ঘনাইয়া আসিতেছে।"[৩]

চিন্তাবিদ, মনীষী, দার্শনিক, পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক—তাঁরা যে কোন দেশের, যে কোন জাতির মধ্যেই হোন না কেন, স্মরণীয় ও বরণীয়। জাতি তাঁদের মহান আদর্শ ও চিন্তাধারার

১-২। Encyclopedia of Britanica, Nineteenth century.

৩। উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকোষ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মধ্যেই খুঁজে পায় ন্যায়, সত্য ও বাস্তব পথ। যারা তাঁদের অনুসরণ করে তারাই হয় ধন্য। আর যারা অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্যতার সঙ্গে পরিহার করে আপন খেয়ালখুশি-মাফিক চলে তাদেরই হয় পতন। খ্রিষ্টপূর্ব দু'শ বছর পূর্বে মনীষী 'কটন' রোমীয়দের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা বহুদিন পরে হলেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল, রোমীয়দের গৌরব মহিমা এমন নির্মমভাবে নির্লিপ্ত হতে পারে রোমান সম্রাজ্য এমন শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হতে পারে কোন চিন্তাবিদই তা কল্পনা করতে পারেন না। অথচ এর ধ্বংসলীলার ইতিহাস প্রতিটি নরনারীকেই স্তম্ভিত না করে পারে না।

আজ যারা সভ্য বলে দাবি করেন, নারীদের অবাধ স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়ে গৌরববোধ করেন, ইচ্ছামতো নারীদের ভোগ করে আত্মতৃপ্তি করেন, তারা ইতিহাসের সোনালি অক্ষর থেকে মুছে যাবেন এতে কোনই সন্দেহ নেই। কেননা ইতিহাস কাউকে ছাড়বে না। যে জাতি নারীকে বন্ধন মুক্ত করবে সে জাতিই ইতিহাসের নির্মম আবর্তে ঘুরপাক খাবে।

রোমীয় নারীদের দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরে নিয়েই আমরা বিশ্বের নারী সমাজের স্বাধীনতা ও অধিকার আলোচনা করব। পরাজয়ের পর রোমীয় নারীদের কি অবস্থা হয়েছিল? সেখানকার নারীরা কি পূর্বের মতো স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হয়ে গর্বের সঙ্গে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত? তারা কি পুরুষদের লাঞ্ছিত করে, পদচ্যুত করে গোলযোগ সৃষ্টি করত না? সে অধিকার তাদের ছিল না বরং পুরুষদের যে নির্মম কষাঘাতে তাদের দিন কাটাতে হতো তা বর্ণনা করার মতো নয়। নারীর স্বাধীনতা তো দূরের কথা—কথা বলা, হাস্য করা, পথেঘাটে চলা, মাংস ভক্ষণ করা সম্পূর্ণই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। শুধু তাই নয়, এদের বিশ্বাস না করে মুখে লোহার তালা দিয়ে আটকিয়ে দেওয়া হতো। এ ব্যবস্থা শুধু সাধারণ নারীদের জন্যই নয়।—ধনী-গরিব, ভদ্র-অভদ্র, শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা সবার জন্যই প্রযোজ্য ছিল। এদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দেবার জন্য যেসব অস্ত্র তৈরি করা হতো তার নাম শুনলে গা শিউরে ওঠে। পৈশাচিক পদ্ধতিতে অত্যাচারের যে নিয়ম নারীদের জন্য তৈরি করেছিল, তার নাম শুনলে নারী-জীবনেও আর স্বাধীণতার নাম মুখে তুলবে না। এদের শরীরে গরম পানি ঢেলে দেওয়া হতো। ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে হেচড়ানো হতো; ফলে হাড়গোড় ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। শরীরের রক্তমাংস, হাড় পুড়ে ছাই হয়ে যেত। একদিন নয়, দুদিন নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রোমীয়রা নারীদের ওপর এ ধরনের অত্যাচার করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও রোমের উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানী-গুণী মনীষীদের সমাবেশে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতো—"নারীর মধ্যেও কি প্রাণ আছে?"

নারীরা কোমল, লাজুক ও বুদ্ধিহীনা; পুরুষরা এদের নিয়ে কত খেলাই না খেলে! একবার খেলার পুতুল করে কত রং ঢং-এ সাজায়, আবার খেলা শেষ হলেই ভেঙে চুরে এর অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়। স্বার্থবাদী পুরুষের জাত একবার নারীকে পর্দার অন্তরাল থেকে টেনে বের করে আবার খাঁচায় পুরে নির্মমভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মারে। হতভাগিনী এ নারীর জাত পুরুষের মোহে পড়ে কিছুই টের পায় না। এরা যদি বুঝতো স্বাধীনতার অর্থ পুরুষের ভোগবিলাস, নারীর চরিত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, নারীকে অতল তলে ডুবিয়ে দেওয়া, তাহলে কোনদিন ঘর ছেড়ে বাইরে আসত না। আপন ঘরে রাজরাণী হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ লুটে নিত। পুরুষের কান ধরে বিলাসিতার উপকরণ আদায় করে ছাড়ত। গৃহিণী হয়ে আপন

হাতে খাবার তৈরি করে পেট পুরে খেত। পুরুষ যখন কঠোর রোদ-বাদলের হাতে মার খেত, তখন সে নিশ্চিন্ত মনে আপন শয্যার ওপর ঘুমাত।

ইসলামে নারীর অধিকার ঃ নারীর প্রাণ নেই, ইসলাম তা মানে না। নারীর স্বাধীনতা নেই, ইসলাম তাও স্বীকার করে না। নারী উলঙ্গভাবে চলবে, ইসলাম সেটাও বরদাস্ত করবে না। ইসলাম সাম্যের ধর্ম, মর্যাদার ধর্ম; নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের ধর্ম। তাই এতে জোর নেই, জুলুম নেই, অবিচার নেই, পক্ষপাতিত্ব নেই।

যুগে যুগে নারী ছিল লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও ঘৃণিত। তাদের পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার ছিল না, ধর্মকর্মের অধিকার ছিল না, শিক্ষা-দীক্ষার অধিকার ছিল না। মুখে তালা দিয়ে তাদের বাক্ স্বাধীনতা হরণ করা হতো। জীবিত কবর দিয়ে বাবা-মা পরিত্রাণ পেত।

আলো, বাতাস, মাটি, পানি, ফল, ফুল প্রভৃতিতে যেমন সকল মানুষের সমান অধিকার তেমনি ধর্ম, কর্ম, সহায়-সম্পত্তি, প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, শিক্ষা-দীক্ষা ও মান-মার্যাদাতেও নারী পুরুষের সমান অধিকার থাকাই বাঞ্ছনীয়। একথা মানুষের নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) যেমন উপলব্ধি করেছেন, ইতিপূর্বে অন্য কেউ তা করেন নি। তিনি বলেছেন—"তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেরূপ অধিকার, তোমাদের ওপরও তাহাদের তদ্রূপ অধিকার আছে। অতএব তাহাদের প্রতি ন্যায্য ও সদয় ব্যবহার কর।" (তিরমিজি)

স্বামীর তালাকে অধিকার ঃ অধিকারের প্রশ্ন বড় জটিল। এর মধ্যে থাকে সামাজিক অধিকার, মানসিক অধিকার ও ধর্মীয় অধিকার। পুরুষের সবগুলো অধিকারই আছে। পূর্বেও ছিল, পরেও থাকবে। কিন্তু পুরুষের ওপর নারীর এ অধিকার পূর্ব-যুগে ছিল না। পুরুষ নারীর প্রাপ্য হিসাবে যতটুকু ইচ্ছা ততটুকুই দিত তার বেশি নয়। ধর্মের নির্দেশ কড়াকড়িভাবে দিয়ে কেউ পুরুষের ওপর নারীর অধিকার আদায় করে নেবার ব্যবস্থাও করে দিতে পারে নি। তাই নারীরা শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের দুর্বলতাতেও ভুগত। স্বামী তার পুত্রের খাতিরে স্ত্রীকে ভালবাসত, প্রেমের খাতিরে নয়। ভোগের খাতিরে তাকে রান্নার অধিকার দিত, তৃপ্তির খাতিরে নয়। আকর্ষণের খাতিরে ডাকত, বিকর্ষণের ভয়ে নয়। মুখ ফুটে হাসবে, প্রাণ খুলে আলাপ করবে, দেহ ভরে অলঙ্কার পরবে, পেট পুরে ভোজন করবে—এ অধিকার কমই ছিল। স্বামী-স্ত্রী প্রকাশ্য প্রেম নিবেদন, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও হাসিগল্প ছিল গুরুজনের চোখে নিতান্তই বেহায়াপনা। হাড়ভাঙা খাটুনি, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা, মুখ বুজে চুপ থাকাই ছিল নারীর ধর্ম। এটাই ছিল তাদের সামাজিক অধিকার। স্বামীর ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্য্যবান হওয়া, পিতার সম্পত্তিতে অধিকারিণী হওয়া তাদের কপালে ছিল না।

ইসলাম এমন এক তরফা অধিকার মানে না। স্বামীর পছন্দ না হলে অন্য মেয়ের প্রেমে পড়বে, কুৎসিত হলে তালাক দেবে, স্ত্রীর যৌবন চলে গেলে রূপসী যৌবনার পিছে পিছে ঘুরবে, অত্যাচার, অবিচার ও লাঠিপেটা খেয়েও স্বামীর পায়ে পড়ে থাকবে, শ্বশুর ধনসম্পত্তি না দিলে স্ত্রীকে অবরুদ্ধ করে রাখবে, পুরুষের এমন নিষ্ঠুর অধিকারে স্ত্রী থাকতে পারে না। এ বিষয়ে স্ত্রীকে অধিকার দেওয়া হয়েছে স্বামীকে তালাক দিতে এবং স্বেচ্ছায় অন্যত্র বিবাহ করে সুখে জীবন কাটাতে। কোরআনের নিম্নোক্ত বাণী তার প্রমাণ দেয়—

pdf By Syed Mostafa Sakib

"যদি কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর অসদাচরণে ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তাহারা পরস্পর কোন সুমীমাংসায় সম্মিলিত হইলে তাহাদের উভয়ে কোন অপরাধ নাই এবং মীমাংসাই কল্যাণকর।" (৪ ঃ ১২৮)

সম্পত্তির অধিকার ঃ বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সমাজে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোন অধিকার নেই। অন্ধ যুগে আরবে, প্রাচীন ইউরোপে এ প্রথা বিদ্যমান ছিল। আজও ভারতে হিন্দুদের মধ্যে মেয়েরা পিতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত। আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, পিতার সম্পত্তি সবটুকু পুরুষ একা দখল করত। এতে মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না। স্বামী পিতা অথবা আশ্রয়দাতার নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর পর এদের কি অবস্থা দাঁড়ায় একথা প্রতিটি সুস্থ ব্যক্তি অনুভব করতে পারলেও নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থা তাদের বাধ্য করে নারীদের বঞ্চিত করতো। হজরতের সময় এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। তা হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন—

"আওস বিন সাবেত আনসারীর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী ও তিনটি কন্যা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাঁর পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি তদীয় উত্তরাধিকার ও আপন ভাই সোয়েদ ও আরফজা অধিকার করে নেয়। এই ঘটনায় আওসের স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখিত ও বিপদগ্রস্ত হয়ে রসুলুল্লাহর নিকট এসে অভিযোগ করে। তখন হজরত বললেন যে, এ সম্বন্ধে আল্লাহর যেরূপ ইচ্ছা সে অনুযায়ীই করতে হবে।"

এরপর কোরআনের বাণী তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়। "পুরুষদিগের জন্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যাজ্য বিষয়ে অংশ আছে এবং নারীগণের জন্যও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ আছে—অল্প বা অধিক নির্দিষ্ট পরিমাণ।"[১] (৪ ঃ ৭)

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারী-জাতি যে সমস্যায় জর্জরিত ছিল, উত্তরাধিকারিণীর প্রশ্নে পুরুষের সঙ্গে যে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধিকারের জন্য স্বাধীনতার যে আওয়াজ তুলেছিল তার সমাধান দিল ইসলাম। এ সমাধান যদি সারা পৃথিবীর মানবজাতি দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিত, তাহলে নারী-জাতি চিরমুক্তি পেত। স্বাধিকারের আওয়াজ তারা তুলত না। দুঃসময়ে পরের গলগ্রহ হয়ে একমুঠো ভাতের জন্য আত্মা বিক্রয় করত না।

চলুন, আমরা আল্লাহর বিধান দেখে নিই, কিভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া হয়।

(১১) "আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানগণ সম্বন্ধে নির্দেশ করিতেছেন যে, এক পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের তুল্য; কিন্তু যদি দুইয়ের অধিক স্ত্রীলোকই হয়; তবে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই-তৃতীয়াংশ। এবং যদি একই স্ত্রীলোক হয় তবে তাহার জন্য অর্ধাংশ; এবং সে যাহা পরিত্যাগ করিয়া যায়—তৎসহ যদি কোন সন্তান-সন্ততি থাকে তবে তাহার পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য উহার এক-ষষ্ঠাংশ; কিন্তু যদি তাহার কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে এবং পিতামাতাই যদি তাহার উত্তরাধিকারী হয়, তবে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; এবং যদি তাহার ভ্রাতা থাকে তবে সে যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছে সেই

১। কোরআন ঃ সূরা নেসা, আয়াত ৭।

নির্দেশ ও ঋণ অন্তে তাহার জননীর জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর উপকারী তাহা তোমরা অবগত নহ। ইহাই আল্লাহর নির্দেশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

(১২) এবং তোমাদের পত্নীগণের যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে; তবে তাহারা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যায়—তোমাদের জন্য উহার অর্ধাংশ; কিন্তু যদি তাহাদের সন্তান-সন্ততি থাকে, তবে তাহারা যাহা নির্দেশ করিয়াছে—সেই নির্দেশ ও ঋণ অন্তে তাহারা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে তোমাদের জন্য উহার এক-চতুর্থাংশ এবং যদি তোমাদের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে তবে তোমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে তাহাদের জন্য উহার এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান-সন্ততি থাকে তবে তোমরা যাহা নির্দেশ করিবে সেই নির্দেশ ও ঋণ অন্তে তোমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাদের জন্য উহার এক-অষ্টমাংশ। যদি কোন পিতা পুত্রহীন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার প্রদত্ত হয় এবং তাহার ভ্রাতা বা ভগিনী থাকে তবে তাহাদের উভয়ের প্রত্যেকের জন্য উহার এক-ষষ্ঠমাংশ। এবং তাহারা যদি একাধিক হয় তবে সে যাহা নির্দেশ করিয়াছে সেই নির্দেশ ও ঋণ অন্তে যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে—কাহারো অনিষ্ট না করিয়া তাহারা উহার এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে। ইহাই আল্লাহর নির্দেশ এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী সহিষ্ণু।" (আল কোরআন ঃ সূরা নেসা)

সূরা নেসার ১১নং আয়াতে **'সম্পত্তির অধিকার'**-এর বিষয় আল্লাহ্ পাক সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তবুও অনুবাদে বলা হয়েছে—"কিন্তু যদি দুইয়ের অধিক স্ত্রীলোক হয়, তবে তাহাদের পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই-তৃতীয়াংশ। 'স্ত্রীলোক'—শব্দটি এখানে ব্যবহার করায় একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আমি নিজেও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলাম। মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেবের তর্জমার Foot-Note বা টীকায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সম্পত্তি পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, বৈমাত্রেয় ভাই-বোন; বা তাদের অবর্তমানে অন্যান্য চাচাত ভাই বা আত্মীয়-স্বজনের কতটুকু অধিকার রয়েছে তা পরিষ্কার ভাবে সবাইকে জানার জন্য এক উকিল-মোক্তারদের বিষয়টি নির্ভুলভাবে নিষ্পত্তির জন্য এখানে তুলে ধরলাম। এখানে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকে, তবে তাহার ধন-সম্পত্তি হইতে পুত্র—কন্যার দ্বিগুণ। অর্থাৎ কন্যা পুত্রের অর্ধেক অংশ পাইবে। কিন্তু যদি একটি মাত্র কন্যা থাকে (পুত্র নাই) তবে সে (কন্যা) **'অর্ধাংশের'** অধিকারিণী হইবে। আর যদি দুইটির অধিক কন্যা বিদ্যমান থাকে—তবে তাহাদের সংখ্যা যতই বেশি হউক না কেন তাহারা সমবেতভাবে সমস্ত সম্পত্তির মাত্র **'দুই-তৃতীয়াংশ'** পাইবে। সন্তান-সন্ততি বিদ্যমানে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে পিতা-মাতা প্রত্যেকেই এক-ষষ্টাংশের অধিকারী। কিন্তু যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয় তবে মাতা এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা অবশিষ্ট অংশ পাইবে। (কোরআনের তর্জমায় পিতা অবশিষ্ট অংশের মালিক হবে একথা উল্লেখ নেই। এটা উহ্য রয়েছে বলে অনেকেই ধাঁধায় পড়বে)। আর যদি মৃতের ভ্রাতা বিদ্যমান থাকে তবে মাতা পাইবে এক-ষষ্ঠাংশ এবং অবশিষ্ট অংশের অধিকারী হইবে পিতা ও ভ্রাতা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিক উপকারী তাহা তোমরা অবগত নহ। ইহার তাৎপর্য এই যে—মৃতের জীবনের জন্য যাহারা যত বেশি উপকারী তাহারাই তত বেশি উত্তরাধিকারের স্বত্ববান—ইহাই সাধারণ নিয়ম। ভ্রাতা-ভগিনী ও কন্যা অপেক্ষা পুত্র ঐ জন্যই মৃতের ধনসম্পত্তির বেশি অংশ পাইয়া থাকে। কিন্তু পিতা ও পুত্রের স্থানে ঐ যুক্তি খাটিতে পারে না। কারণ শেষ জীবনে—অর্থাৎ বার্ধক্যে মানবের জন্য পুত্রের প্রয়োজন যত বেশি- প্রথম জীবনের শৈশব ও কৈশোরে পিতার প্রয়োজন পুত্রের জন্য একটুও কম নহে, বরং অধিক। পুত্র অপেক্ষা পিতার মর্যাদাও উচ্চ। কিন্তু তথাপি যে পুত্র পিতা হইতে অধিক সম্পত্তির অধিকারী হয় তাহার অন্য কারণ আছে। প্রথমত, বার্ধক্যে পিতা-মাতার বেশি ধনসম্পত্তির প্রয়োজন থাকে না। দ্বিতীয়ত, তাহাদের নিজস্ব ও পৈত্রিক সম্পত্তিও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু পুত্রের সে কিছুই থাকে না—অথচ প্রয়োজন থাকে তার সবচেয়ে বেশি। এ কারণেই পিতা অপেক্ষা পুত্র অধিকতর ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে।"

"১২ নং আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা প্রথমে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছেন। স্ত্রীর যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে, তবে স্বামী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির **অর্ধাংশ** এবং সন্তান-সন্ততি থাকিলে **এক-চতুর্থাংশ** পাইবে। ঐরূপ স্বামীর যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে তবে স্ত্রী তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির **এক-চতুর্থাংশ** এবং, সন্তান-সন্ততি থাকিলে এক-অষ্টমাংশ পাইবে। একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলেও মাত্র ঐ নির্দিষ্ট অংশ তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে। মৃত ব্যক্তির পিতা ও পুত্র যদি কেহই বিদ্যমান না থাকে—কিন্তু ভ্রাতা ও ভগিনী বিদ্যমান থাকে তবে এক সহোদর ভ্রাতা এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বা ভগিনী থাকিলে উক্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বা ভগিনী প্রত্যেকেই **এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে**। অবশিষ্ট **পাঁচ-ষষ্টাংশ** সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বা ভগিনীর সংখ্যা যদি একাধিক হয়, তবে তাহারা **এক-তৃতীয়াংশ** এবং সহোদর ভ্রাতা **দুই-তৃতীয়াংশ** পাইবে। ইহা আল্লাহর নির্ধারিত মূল নিয়ম।"

ফারায়েজ ঃ অন্ধ যুগের প্রথা আজও পৃথিবীর বহু দেশেই বিদ্যমান আছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে। নারীদের বঞ্চনা করে, এতিম বালক ও নাবালিকাদের সম্পত্তি হতে বিমুখ করে স্বার্থবাদীর দল সমাজে এক অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর এ বিধান সারা বিশ্বে কার্যকরী না হবে; সমস্ত জাতির মধ্যে 'ফারায়েজ' প্রথা দেয় ভাগ বন্টনের মূল-নীতিসমূহ প্রবর্তিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত নারী-পুরুষ এবং অনাথ-এতিমদের মধ্যে এ দ্বন্দ্ব চলবেই। এ জন্যই মহানবী তাঁর মহাবাণীতে বলেছেন—

"হে মুসলমানগণ, তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা কর এবং লোকদিগকে শিক্ষা দাও।"

এ শিক্ষা মুসলমানদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর। কেননা সংসার জীবনে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে সর্বদাই এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়।

অন্ধ যুগের মতো আজও হিন্দু-সমাজে দেখা যায় যে কেউ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার সমস্ত সম্পত্তি কোন বিশেষ কার্যে দান করা হয় অথবা দত্তক পুত্র রেখে নিজ উত্তরাধিকারী ভাই-ভাতিজা, স্ত্রী বা আপন পরিজনকে বঞ্চিত করা হয়। ইসলাম দানে নিষেধ

করেনি, কোন প্রিয়তম ব্যক্তিকে লিখে দিতে মানা করে নি, সৎ কার্যে ব্যয় করতেও বারণ করে নি। তবে এমন সুন্দর ব্যবস্থা দিয়েছে যা দ্বারা প্রত্যেকেই উপকৃত হবে। নিম্নে এর একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছি—

প্রথমত, ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তার জন্য 'দাফন কাফনের' অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সৎ কার্যের জন্য ব্যয় করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মৃত ব্যক্তির কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে।

তৃতীয়ত, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে কোন অসিয়ত বা অন্তিম ইচ্ছা জ্ঞাপন করে থাকলে তা পূর্বের দুটি কার্য শেষ করার পর যা অবিশষ্ট থাকবে তার তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা ঐ অসিয়ত পূর্ণ করতে হবে। বাকি যা থাকবে তা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন হবে। কিন্তু যদি দাফন কাফন ও ঋণ শোধ করে কিছুটা অবশিষ্ট না থাকে তবে তারা কিছুই পাবে না।

সূরা নেসার ১২নং আয়াতে স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন প্রভৃতির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নির্দেশ আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে—"স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী জীবিত থাকলে সে তার স্ত্রীর **এক-চতুর্থাংশ** পাবে যদি ঐ স্ত্রীলোক সন্তানহীনা হয়। ঠিক অনুরূপ ভাবেই স্বামী সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হলে স্ত্রী তার সম্পত্তির **এক-চতুর্থাংশ** পাবে। কিন্তু যদি সন্তান থাকে তবে মাত্র **এক-অষ্টমাংশ** পাবে। একাধিক স্ত্রী হলেও ঐ এক-অষ্টমাংশ সম্পত্তিই তাদের মধ্যে সমান ভাগে বণ্টিত হবে। মৃত ব্যক্তির যদি পিতা-পুত্র কেউ না থাকে কিন্তু ভ্রাতা ও ভগিনী বিদ্যমান থাকে তবে এক সহোদর ভ্রাতা ও এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বা ভগিনী প্রত্যেকেই **এক-ষষ্ঠমাংশ পাবে।** বাকি **পাঁচ-ষষ্ঠমাংশ** সহোদর ভ্রাতা পাবে। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা-ভগিনীর সংখ্যা একাধিক হলে তারা সকলে মিলে **এক-তৃতীয়াংশে** পাবে। বাকি **দুই-তৃতীয়াংশ** সহোদর ভ্রাতা পাবে।" এটাই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম।

প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ ও মমতা দিয়েই এ সংসার-জীবন। এর যে কোনটির অভাব ঘটলেই সংসার হয় বিষময়। নারী যদি পুরুষের মতো অধিকার না পায়, সংসার-জীবনে যদি ক্রীতদাসীর মতো স্বামীর নিকট ব্যবহার পায় তবে এ দুনিয়া তার নিকট দোজখ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভাল কিছু আশা করা যায় না। একই পিতার ঔরসে জন্মলাভ করে কন্যা চিরজীবন সম্পত্তি, স্নেহ ও মমতা হতে বঞ্চিত হবে ইসলাম তা স্বীকার করে না। পিতার চোখে ছেলে ও মেয়ে একই। এটাই ইসলামের শিক্ষা। আর এ শিক্ষাই পিতার জন্য চিরমুক্তি এনে দেয়। দেখুন ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) কি বলে গেছেন—

"যাহার কোন শিশুকন্যা আছে, সে তাহাকে জীবন্ত কবর দেয় না, অবহেলা করে না বা তাহার চেয়ে তাহার পুত্রসন্তানকে বেশি পছন্দ করে না, সে নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহে বেহেশ্তে যাইবে।" [আবু দাউদ]

সংসার-জীবনে নারীকে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। খাওয়া, পরা, কাজকর্ম, ছেলেমেয়ের প্রতিপালন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শ্বশুর-শাশুরি ও নিজ স্বামীর পরিচর্যাতে নারী স্বাধীন। পুরুষের এক্ষেত্রে বাধা দেবার অধিকার তো নেই-ই বরং নারী এগুলো সম্পাদন না করলে তাকে দায়ী হতে হবে। সংসারের উন্নতি ও শৃঙ্খলা এক কথায় বলতে গেলে পূর্ণ সংসারটাই নারীর হাতে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিক্ষার অধিকার ঃ সামাজিক জীবনে নারীর আর একটি অধিকারের প্রশ্ন আছে—সেটা হলো শিক্ষা। পুরুষের সমতালে কি নারীর শিক্ষা প্রয়োজন? এ চিন্তা বহু মনীষীর মাথায়ই আসে। কারো অভিমত—নারীর শিক্ষার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চাতে এদের নিমজ্জিত করলে দাম্পত্য-জীবন সুখের ও সুন্দর হয় না। কথাটি একদম ফেলে দেবার মতো নয় বা হাসি-রহস্যের মতো উড়িয়ে দেবারও নয়। কেননা বহু জ্ঞানী-গুণী সমাজবিজ্ঞানীরা বহু রিসার্চ করেই এমন সব কথা বলেছেন, যার উদ্ধৃতি আমি পূর্বে দিয়েছি। তবুও এ কথাটি আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, নারীদের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নারীরা যদি শিক্ষিতা না হয়, তাহলে তাদের পেট থেকে শিক্ষিত, ভদ্র, উদার, সৎ ও মহৎ পুত্রের আশা করা যায় না। যৌনবিজ্ঞান না শিখলে সে নারী স্বামীকে খুশি করতে পারে না। অপবিত্রতার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। ছেলেমেয়েকে সুশিক্ষা দিতে পারবে না। দাম্পত্য-জীবনে শান্তিও নিয়ে আসতে পারবে না। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা না করলে সংসারের উন্নতি করতে পারবে না। সংসারকে মধুময় করে তুলতেও পারবে না। ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষারও যে প্রয়োজন নেই তা নয়। জ্ঞান পুরুষকে যেমন উন্নত ও মহৎ করে, নারীকেরও তেমনি আলোকিত ও সুন্দর করে। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, প্রেম-প্রীতি শিক্ষারই অবদান। শিক্ষাবিহীন নারী কিভাবে পুণ্যের বিকাশ করে? কিভাবে আল্লাহ, রসুল ও সৃষ্টজীবের সঙ্গে পরিচিত হয় ও ঘনিষ্ঠ প্রেম গড়ে তোলে? তাই পুরুষের ন্যায় নারীরও শিক্ষার প্রয়োজন, অতীব প্রয়োজন। এ কথা আমাদের নবী (দঃ) ও বলে গেছেন—

"প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীর পক্ষে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।"

(হাদিস—মুসলিম বুখারী)

এখন তাহলে দ্বিমত থাকবার কথা নয় যে, নারীকেও পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তবে একটা প্রশ্ন তবুও থেকে যায় যে কোন ধরনের শিক্ষা নারীর জন্য অতীব প্রয়োজন? আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা, না ধর্মীয় শিক্ষা, না গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা? এর জবাবে আমরা বলব 'সুশিক্ষা'—তা যে কোন দেশের বা যে কোন জাতিরই হোক না কেন? শিক্ষার জন্য সুদূর চীনদেশে যাবার নির্দেশ আমাদের নবী দিয়েছেন এবং একথাও বলেছেন—"তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ কর এবং যেখান হইতেই তুমি উহাকে গ্রহণ কর না কেন তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই।"

সেখানে ইউরোপীয় শিক্ষাগ্রহণ করা চলবে না এ কথা বলা অন্যায় হবে। রেল, বাস, ট্রাম, উড়োজাহাজ, ঘড়ি, সাইকেল, বসন, বাসন, তেল, বিদ্যুৎ, ইঞ্জিন, পাখা, রেডিও, ট্রানজিস্টার, বাল্ব, কলম, প্রেস, মেশিন সবই যখন ব্যবহার করা চলে তখন সে সব তৈরির বিদ্যা অর্জন করা চলে না এমন গোঁড়ামির কথা আমাদের নবীও বলেন নি। আমরাও বলতে চাই না।[১]

১। আবু সাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন—

"তোমরা নিশ্চয়ই অনুসরণ করিবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে, যদিও তাহারা যাইয়া থাকে কোন গুই সাপের গর্তে—তোমরাও যাইবে উহাতে। আমরা বলিলাম —হে রসুলুল্লাহ পূর্ববর্তীরা ইহুদি ও খ্রীষ্টানগণ কী? নবী (দঃ) বলিলেন—নয়তো কে?"

[সহীহ বুখারী (তজরীদ) ২য় খণ্ড, তর্জমা—আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ সৃষ্টি প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা নং ২৫২]

সেখানে ইউরোপীয় শিক্ষাগ্রহণ করা চলবে না এ কথা বলা অন্যায় হবে। রেল, বাস, ট্রাম, উড়োজাহাজ, ঘড়ি, সাইকেল, বসন, বাসন, তেল, বিদ্যুৎ, ইঞ্জিন, পাখা, রেডিও, ট্রানজিস্টার, বাল্ব, কলম, প্রেস, মেশিন সবই যখন ব্যবহার করা চলে তখন সে সব তৈরির বিদ্যা অর্জন করা চলে না এমন গোঁড়ামির কথা আমাদের নবীও বলেন নি। আমরাও বলতে চাই না।[১]

জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়—অসীম। তাই একে আহরণ করতে হলে মহামনীষী ও বিজ্ঞানীদের পুস্তক, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গ্রহণ করা দোষণীয় নয়। তবে একথাই বিচার করতে হবে যে, সে শিক্ষার মাধ্যমে নারী অথবা পুরুষ পথভ্রষ্ট হয়ে সমাজের কলঙ্ক না হয়ে দাঁড়ায়। যে জ্ঞান মহান সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেয়, যে জ্ঞান সমাজ, দেশ ও জাতির বৃহত্তম কল্যাণে আসে, যে জ্ঞানে হৃদয় আলোকিত হয়, সে জ্ঞানই নারী-পুরুষের জন্য ফরজ।

পুরুষের মতো অসীম কষ্ট সহ্য করে দেশ-বিদেশে গিয়ে নারীর শিক্ষালাভ করা কঠিন। একে তো দৈহিক শক্তিতে নারী দুর্বল, তদুপরি সামাজিক শৃঙ্খলা ও পৃথক ব্যবস্থার অভাব হেতু স্বীয় মর্যাদা ও পর্দা রক্ষা করে নারীর বহির্জগতে শিক্ষালাভ করা কঠিন। তাই সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যেই যতদূর সম্ভব সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে প্রতিটি দেশের সরকার যদি সজাগ হতো, মেয়েদের জন্য পৃথক কারিগরী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্টা করত তাহলে তারাও আমাদের পাশাপাশি শিক্ষালাভ করতে পারত। এ ব্যবস্থা কঠিন নয়, শুধু রূপ দেবার মতো একটু বিপ্লবী প্রচেষ্টা প্রয়োজনমাত্র।

মানসিক অধিকার ঃ প্রতিটি জীবই চায় তার স্বাধীন মত অনুযায়ী চলাফেরা করতে ও বেঁচে থাকতে। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেই তার বিরুদ্ধে অত্যাচার করা হয়। মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার অধিকার সবার ওপরে। অথচ এ মানুষ একজন আর একজনের অধিকারকে নির্মমভাবে হরণ করে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। সমাজের সব সুযোগ, সুকীর্তি ও সুখ-সম্পদ লুটে নিতে চায়। ক্রীতদাসী প্রথা, সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা, আমরণ বৈধব্য প্রথা যুগ যুগ ধরে নারীদের প্রাণে যে অসীম জ্বালা দিয়ে এসেছে তার বিবরণ দেবার মতো ভাষা আমার নেই। তবু একটু আলোচনা না করে পারছি না। কেননা নারী স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করছি। তাই এর ওপর একটু আলোকপাত করে দেখতে চাই যে পূর্বে নারীর মনকে স্বীকার করা হতো কি না। তাদের মনের স্বাধীনতা ছিল কি না। মানসিক অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছিল কি না।

প্রাচীনকালে মিশর, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি দেশে রাজা-মহারাজা বা গণ্যমান্য কোন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাকে সমাধিস্থ করার সময় বা দাহ করার সময় তা স্ত্রী, দাসী, খাট-পালঙ্ক এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে দেওয়া হতে। তারা মনে করত পরপারে গিয়ে ঐ ব্যক্তি স্ত্রী, দাসী ও খাদ্যাভাবে ভয়ানক কষ্ট পাবে। যেসব হতভাগী নারী ও দাসী এসব খ্যাতনামা রাজা-

---

১। আবু সাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন—

"তোমরা নিশ্চয়ই অনুসরণ করিবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে, যদিও তাহারা যাইয়া থাকে কোন গুই সাপের গর্তে—তোমরাও যাইবে উহাতে। আমরা বলিলাম —হে রসুলুল্লাহ পূর্ববর্তীরা ইহুদি ও খ্রীষ্টানগণ কী? নবী (দঃ) বলিলেন—নয়তো কে?"

[সহীহ বুখারী (তজরীদ) ২য় খণ্ড, তর্জমা—আলহাজ্ব আবদুর রহমান খাঁ সৃষ্টির প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা নং ২৫২]

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাদশাদের মনের খোরাক জোটাত তাদের কি মনের স্বাধীনতা ছিল? তারা কি স্বাধীন ও প্রফুল্ল মনে স্বামীর কবরে শয্যা রচনা করত? জোর করে, জুলুম করে ও অত্যাচার করে এসব নারীর মানবিক অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে মানসিক স্বাধীনতার কবর দিত।

ঠিক এ প্রথারই ছোঁয়া লাগে প্রাচীন হিন্দুধর্মে। তাদের সময় সতীত্বকে প্রমাণ করতে মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর পর চিতায় তার গলা ধরে অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যেত এবং প্রমাণ করত যে তারা সতী। মানুষ কেন, পতঙ্গ ছাড়া এমন কোন সৃষ্ট জীব নেই, যারা আগুনে ভয় করে না। মেয়েরা রাগের বশবর্তী হয়ে, দুঃখে অসহ্য জ্বালা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গলায় ফাঁস ঝোলাতে পারে, পানিতে ডুবে মরতে পারে কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে মরতে পারে না। এমন দৃষ্টান্ত বিরল। উন্মাদিনী ছাড়া এ প্রবৃত্তি কোন নারীরই হয় না। অথচ এদের টেনে হেঁচড়ে স্বামীর চিতায় পোড়ানো হতো, তারা পালিয়ে রক্ষা পেত না। প্রাণ ফেটে কেঁদেও কোন মহাত্মার হৃদয় গলাতে পারত না। স্বামীর মৃত্যুর পর কি তাদের বেঁচে থাকবার ইচ্ছে হতো না? ছেলে-মেয়ে নিয়ে কি স্বামীর স্মৃতি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হৃদয়ে বহন করার বাসনা তাদের জাগত না? কত মেয়ে শুধু বাঁচার আশায় নিজেকে অসতী বলেও আখ্যায়িত করত অথচ নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থা এদের ছাড়ত না।

স্বামী বিদেশে প্রাণত্যাগ করলে, স্বামীর কাপড়-চোপড় চিতায় দিয়ে ঐ সঙ্গেই স্ত্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে পোড়ানো হতো। কেউ পারেন এ প্রথা রোধ করতে। সম্রাট আকবর—যার প্রতাপে সমগ্র ভারত কাঁপত, হিন্দু সম্প্রদায় যাকে ভয় ও ভক্তিতে দিল্লীশ্বর উপাধি দিয়েছিল; তিনিও এ কুপ্রথা ভারত থেকে তুলে দিতে পারেন নি। সর্বশেষে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে আইন প্রণয়ন করেন এবং হিন্দু বিধবা নারীদের রক্ষা করেন। কোন্ নিষ্ঠুর ধর্মযাজক যে এমন কু-প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন যার ফলে লক্ষ লক্ষ নারী আত্মাহুতি দিয়েছে, এদের করুণ আবেদনকে ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করে দগ্ধিভূত করেছে। ধর্মের কুসংস্কার শুধু সমাজকেই নয়, সমাজের মহান ব্যক্তিদেরও অন্ধ করে ফেলে। সমাজকে এরূপ নৃশংসতা, বর্বরতা ও মহাপাপের হাত থেকে উদ্ধার করেছে একমাত্র ইসলাম। ইসলামের নবী তথা সমগ্র মানুষের নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এ জন্যই অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেন নি। মুনাফেকের সকরুণ নিবেদনকেও সহানুভূতির সঙ্গে শ্রবণ করেন নি। সত্যের জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে হয়েছে। তাই মুসলমানগণ আজ মুক্ত। মুসলিম রমনীগণ আজ স্বাধীন।

ধর্মের অধিকার ঃ নিপীড়িত, নির্যাতিত নারী জাতি কতোভাবেই না লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। কেউ তাদের বলত শয়তানের যন্ত্র, কেউ বলত কামড়ানো বিচ্ছু; কেউ বা বলত খল, ভীমরুল, বোলতা ও বিষাক্ত সাপ। বাধা দেবার কেউ ছিল না। প্রতিবাদ করবার কারো সাহস ছিল না। পথে-ঘাটে ধর্ষিতা হতো, স্বামীর ঘরে পশুর মতো মার খেত, সমাজের বিচারে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিত। প্রাণের ভয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে নিবেদন জানাবে সে সুযোগও ছিল না। বেদবাণী শুনলে কানে গরম সীসে ঢেলে দেওয়া হতো। পূজার ঘরে গেলে পূজারী অপবিত্র হতো। আঁতুর ঘরে থাকলে নারী অস্পৃশ্যা হতো।

ইসলাম দিল সামাজিক অধিকার, ইসলাম দিল মানবিক অধিকার। ইসলাম দিল নারীকে ধর্মের অধিকার। দেখুন এটা সত্য কি না।

"নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারীগণ ও আত্মসমর্পণকারিণীবৃন্দ এবং বিশ্বাসীগণ ও বিশ্বাসীবৃন্দ এবং অনুবর্তীগণ ও অনুবর্তিনীবৃন্দ এবং সত্যপরায়ণ ও সত্যপরায়ণাবৃন্দ এবং ধৈর্যশীলগণ ও

ধৈর্যশীলাবৃন্দ এবং বিনীতগণ ও বিনীতাবৃন্দ এবং দানশীলগণ ও দানশীলাবৃন্দ এবং উপবাসকারীগণ ও উপবাসকারিণীবৃন্দ এবং গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণকারীগণ এবং সংরক্ষণকারিণীবৃন্দ এবং আল্লাহকে অধিকতর স্মরণকারীগণ ও স্মরণাকারিণীবৃন্দ—ইহাদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।" (৩৩ ঃ ৩৫)

ওপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াত থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ্ পাক পুরুষ ও নারীকে এক সঙ্গেই সম্বোধন করেছেন যারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সৎকর্ম করছে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলছে। নারীর জন্যও যে ধর্মের প্রয়োজন, নারীর কর্তব্যও যে পুরুষের মতোই, নারীর প্রতিদানও যে পুরুষেরই অনুরূপ—একথাই তিনি বুঝিয়ে দিয়ে নর-নারীর পার্থক্যের যেমন অবসান করেছেন, তেমন তাদের উৎসাহিত করে ধর্মের পথে তুলে দিয়েছেন। যারা মনে করত নারী উপাসনার জন্য নয়, সৎচিন্তার জন্য নয়, দান করে পুণ্য অর্জনের জন্য নয়—তাদের অন্ধ চিন্তাধারাকে এ বাণী নির্মূল করে দিয়েছে এবং নারীদের ধর্মের স্বাধীনতাকে ঘোষণা করেছে। এরূপ বাণী কোরআনে আমরা আরও বহু স্থানে দেখতে পাই। নিম্নে আর একটিমাত্র বাণীর উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"পুরুষ বা নারী হইতে যে সৎকার্য করে এবং সে বিশ্বাসীও হয় তবে নিশ্চয় আমি তাহাকে পবিত্র জীবনে জীবিত রাখিব। এবং তাহারা যে সৎকার্য করিয়াছিল, তৎপরিবর্তে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে প্রতিদান প্রদান করিব।" (১৬ ঃ ৯৭)

ইসলামের যে পাঁচটি স্তম্ভ আছে—কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত—এর প্রত্যেকটিতেই নারীর সম অধিকার রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্ব পুরুষ স্কন্ধে বহন করে নারীদের মুক্তি দেবে বা পার করবে এ ক্ষমতা পুরুষের নেই। পাহাড়সম পুণ্য অর্জনে নারীর কোন বাধা নেই। সুদূর আরবের কাবা ঘরে গিয়ে হজব্রত পালন করবে, পুরুষের সঙ্গে অনাবৃত মস্তকে কাবা প্রদক্ষিণ করবে, আল্লাহর কাছে হাত তুলে মোনাজাত করবে, এতে নারীর কোনই দোষ নেই। হজরত (দঃ) এ অধিকার নারীদের দিয়েছেন। সাম্যবাদের ঝড়-তুফান তুলে নারীরা যে অধিকার চায় ইসলাম তা পূরণ করেছে তাদের ধর্মীয় জীবনে।

শিক্ষা-দীক্ষা, কোরআন তেলাওয়াত, নামাজ, রোজা ও জাকাতে নারী স্বাধীন। হজরত (দঃ)-এর সময় নারীরা ফজরের নামাজে সমস্ত শরীর আবৃত করে পুরুষের সঙ্গে মসজিদে গমন করতেন। এশার নামাজেও অনেক নারী মসজিদে গমন করতেন।[১]

স্ত্রীদের মসজিদে যাবার ব্যাপারে হজরত (দঃ)-এর নির্দেশ নিম্নরূপ ঃ "স্ত্রী (মসজিদে আসিবার) অনুমতি চাইলে, স্বামী যেন নিষেধ না করে।"[২]

"যদি রাত্রিকালে মসজিদে যাইতে তোমাদের স্ত্রীরা অনুমতি চায় তবে অনুমতি দিবে।"[৩]

উক্ত নির্দেশ পেয়ে নারীরা অনেকেই জামাতে নামাজ পড়তে মসজিদে গমন করতেন। অনেকের নির্দেশটি মনোমতো না হলেও স্ত্রীদের মসজিদে গমনে বাধা দেবার সাহস তাদের হয় নি এ তত্ত্বটিও মেলে ইবনে ওমরের বর্ণনা হতে।

১। বুখারী, বর্ণিত হজরত আয়েশা।
২। বুখারী, ওমর হতে বর্ণিত।
৩। বুখারী, ওমর হতে বর্ণিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি বর্ণনা করেছেন, "হজরত ওমর (রাঃ)-এর স্ত্রী রাত্রির ও ভোরের নামাজে মসজিদে যাইতেন। তাহার স্বামী ইহা পছন্দ না করিলেও কখনও নিষেধ করিতে সাহসী হন নাই। কেননা হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, 'আল্লাহর দাসীদিগকে আল্লাহর মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না।"[৪]

ইহা শুনে ইবনে ওমরের পুত্র বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি ইহাতে নিষেধ করিব।

ইবনে ওমর এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তিরস্কার করেন এবং সারা জীবন তার সঙ্গে কথা বলেন নি।"[৫]

হজরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেছেন—"নারীরা পুরুষের পশ্চাতে থাকিয়া নামাজে যোগ দিতেন। সালাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মসজিদ হইতে সত্বর চলিয়া যাইতেন। হজরত (দঃ) ও তাঁহার শিষ্যেরা সালাম উচ্চারণের পর কিছুক্ষণ বসিয়া অপেক্ষা করিতেন, পরে অন্য নামাজ পড়িতেন।"[৬]

হজরত (দঃ) বলেছেন—"আমি যখন নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হই, নামাজ দীর্ঘ করিতে আমার ইচ্ছা হয়; কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের কান্না শুনিয়া আমি নামাজ সংক্ষেপ করি। কারণ তাহাদের মাতাদিগকে কষ্ট দেওয়া আমার ভাল লাগে না।"[১]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুম্মার নামাজে নারীদের যোগদান ইচ্ছাধীন ছিল। বাধ্যবাধকতা কিছু ছিল না। কেননা নারীরা পুরুষের মতো মুক্ত নয়। রজঃস্বলা, গর্ভবতী, স্তন্যদান ও গৃহকর্মে জড়িত থাকাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দুই ঈদের নামাজে সমস্ত ধরনের মেয়েদেরই যোগদানের নির্দেশ হজরত (দঃ) দিয়েছেন। এ তত্ত্বটি মেলে তাঁর নিম্নোক্ত বাণী হতে—

তিনি বলেছেন—"সকল নারী এমনকি রজঃস্বলা ও অন্তঃপুরবাসিনী যুবতীরা পর্যন্ত যেন ঈদের ময়দানে যায় এবং মুসলমানদের জামাত ও দোয়ায় যোগদান করে। তবে রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের নামাজের স্থান অন্য সকলের স্থান হইতে পৃথক থাকিবে।" একটি স্ত্রীলোক বলিল, 'হে আল্লাহর রসুল (দঃ) যদি কোন স্ত্রীলোকের চাদর না থাকে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তাহার সঙ্গিনী তাহাদের চাদর দিবে।' (বুখারী ও মুসলিম হতে মিশকাতে উদ্ধৃত। উম্মে আতিয়া হতে বর্ণিত।)

ঈদ ও জুম্মার নামাজে নারীদের যোগদানের প্রশ্নে অনেকেরই মনে কিছুটা গোলক ধাঁধা বাঁধার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে কোথাও এ প্রথা দেখা যায় না। আলেম-সমাজকেও এর ওপর কিছু বলতে বা লিখতে দেখি না। তাই সাধারণ মানুষের ধারণা নারীদের ঈদের জামাতে যাওয়া বা মসজিদে যোগদান করা পর্দাপ্রথার বরখেলাপ অথবা অবাধ নারী স্বাধীনতা দেওয়া। কিন্তু একথা তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, মসজিদ ঘরে অথবা ঈদের জামাতে যেখানে শত শত লোক উপস্থিত হয় এবং সকরুণ হৃদয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়—সেখানে নারীদের ওপর কুদৃষ্টি দেবার অথবা তাদের ওপর খারাপ ধারণা করবার মতো প্রবৃত্তি খুব কমই আসে। নিজ পাপের জন্য যেখানে হৃদয় বিগলিত, পরকালের মহাশাস্তির

৪। বুখারী, ইবনে ওমর হতে বর্ণিত।
৫। মুসলিম, ইবনে মাজাঃ ও আহম্মদ সলিম হতে বর্ণিত।
৬। বুখারী।
১। ঐ, আবু কাতাদা হতে বর্ণিত।

ভয়ে যেখানে চক্ষু অশ্রুসিক্ত, ধন-দৌলতের তুচ্ছ অহঙ্কার যেখানে ভস্মীভূত সেখানে নারীদের মসজিদে যেতে দোষ কি? হজের সময়ে আরাফাতের ময়দানে, কাবার গৃহে যখন নারী পুরুষ এক হয়ে মহাসাগরের ঢেউ-এ ডুবে যেতে থাকে তখন কি কোন পাপিষ্ঠ ভোগ-বিলাসের মোহমায়ার চাতুরী খেলবার সাহস পায়? তখন কি ভুলে যায় না স্বপ্ন, সাধ, শক্তি, সাহস ও যৌবনের তৃষ্ণা?

মাঠে, ঘাটে, শহরে, বন্দরে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে প্রভৃতিতে নারী যদি চলাফেরার সুযোগ পায় তবে পুণ্য অর্জনে মসজিদে ও ঈদের জামাতে যেতে পারবে না কেন? মোনাজাত যেখানে কবুল হয়, এক সেজদা যেখানে লাখ সেজদার সমান, এক মুহূর্তের কান্না যেখানে সারা জীবন কান্নার পুণ্য অর্জন করে সেখান থেকে নারীদের বঞ্চিত করা কি অপরাধ নয়? অপরাধ হলে, পর্দাপ্রথার বরখেলাপ হলে, নিশ্চয়ই নবী (সঃ) এ নির্দেশ দিতেন না। পুরুষদের ন্যায় নারীদেরও যে উপদেশ দেবার প্রয়োজন আছে, ধর্মতত্ত্বে নারীদেরও যে জ্ঞানমান অপরিহার্য এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আর পারবে না বলেই হজরত (দঃ) এ পথ দেখিয়েছেন।

আবু সাইদ খুদরী হতে বর্ণিত—"হজরত ঈদ ও বকরি ঈদের দিনে ময়দানে ঈদের নামাজ পড়িতেন। নামাজের পর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতেন। পরে নারীদিগের নিকটে আসিয়া উপদেশ দিতেন। তিনি বিশেষ করিয়া সকলকে দান করিতে বলিতেন। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই অলঙ্কার দান করিত।" (মুসলিম হতে মিশকাতে উদ্ধৃত)

বিশেষ বিধানের সঙ্গে পুরুষ নারীদের জামাতে ইমামতি করতে পারত। এটা কোন সময় নিন্দনীয় ছিল না। হজরতের সময়ে নারীরা নারীদের জামাতে ইমামতি করত। হজরত আয়েশা (রাঃ), হজরত উম্মে সালমা (রাঃ), (হজরতের পত্নীদ্বয়) তারাবীর নামাজে ও ফজরের নামাজে স্ত্রীলোকদের ইমামতি করতেন।[১]

হজরতের অনুমতিক্রমে ওরকা নাম্নী শিয়্যা নিজের পরিজনদের ইমামতি করলেন।[১]

হজরতের পত্নী উম্মে সালমা স্ত্রীদের নিয়ে তারাবী নামাজ পড়তেন এবং তাঁর দাসী হাসান বসরীর মাতা তাঁদের ইমাম হতেন।[৩]

নারীদের জামাতে যোগদান সম্বন্ধে হজরতের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস যা ওপরে বর্ণিত হাদিসসমূহের সমষ্টি তা তুলে ধরছি। যদিও পাঠকবৃন্দের নিকট শ্রুতিকটু মনে হবে—তবুও না লিখে পারছি না। কেননা ইসলামের উদারনীতি সংকীর্ণতাবাদের মাথায় বজ্রাঘাত হেনে কিভাবে নারীদের সমাজে ঠাঁই দিয়েছে এ হাদিসটি তার এক জ্বলন্ত নিদর্শন।

হাফসা বিনতে সিরীন বলেন—'আমি আমার যুবতী কন্যাগণকে ঈদের দিন (ঈদের ময়দানে) যাইতে নিষেধ করিলাম। একদিন একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বনী খলফের মহলে উপস্থিত হইলেন। আমি তাহার নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনি বারোটি যুদ্ধে হজরতের সঙ্গী ছিলেন। তন্মধ্যে ছয়টিতে তাহার ভগিনী উপস্থিত ছিলেন। তাহার ভগিনী বলেন, 'আমরা পীড়িতদের সেবা করিতাম ও আহতদের সেবা করিতাম ও আহতদের চিকিৎসা করিতাম।' তিনি (ভগ্নী) একদিন হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'হে আল্লাহর

১। ইবনে শয়বাঃ প্রভৃতি হতে মৌলানা আবদুল হাইয়ের উমদাতুর রী আয়াঃ টীকায় উল্লিখিত।
১। আবু দাউদ হতে উক্ত টীকায় উল্লিখিত।
৩। মৌলানা আবদুল হক দেহলভির মা সাবিতা বি সুন্না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

রসুল, যদি কোন স্ত্রীলোকের চাদর না থাকে তবে ঈদের দিনে বাহিরে না যাওয়া কি তাহার পক্ষে পাপ?' হজরত উত্তর দিয়াছিলেন—'তাহার সঙ্গিনী যেন তাহাকে নিজের (অতিরিক্ত) চাদর দেয় এবং নারীদের কর্তব্য যেন তাহারা পুণ্যে ও মুসলমানদের মঙ্গল প্রার্থনায় যোগদান করে।' পরে যখন উম্মে আতিয়া আসলেন, আমি (হাফসা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি হজরত রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে ঐ বিষয়ে কিছু শুনিয়াছেন কি?' তিনি উত্তর করিলেন, 'আমার পিতা তাহার জন্য উৎসর্গ হউন! হ্যাঁ, উৎসর্গ হউন!" হ্যাঁ উম্মে আতিয়া যখন হজরত সম্বন্ধে বলিতেন, তখন ঐরূপ বলিতেন। আমি তাহাকে (হজরতকে) বলিতে শুনিয়াছি, 'যুবতী অন্তঃপুরবাসিনী এবং রজঃস্বলা স্ত্রীলোক যেন (ঈদের দিন) বাহিরে বের হয় এবং পুণ্যে ও মুসলমানদের মঙ্গল প্রার্থনায় উপস্থিত থাকে। রজঃস্বলা স্ত্রীলোক নামাজের স্থান হইতে আলাদা থাকিবে।' হাফসা বলেন—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি রজঃস্বলা স্ত্রীলোক! তিনি (উম্মে আতিয়া) বলিলেন—'কেন রজঃস্বলা স্ত্রীলোক কি হজের সময় আরাফাতে এবং অমুক-অমুক কার্যে উপস্থিত থাকে না?'[১]

নারীদের ধর্মীয় অধিকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে হজরত লোকদের সতর্ক করে দিলেন নিম্নোক্ত বাণী দিয়ে—"হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে বেশভূষা দেখাইবার জন্য মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও; কেননা ইহুদি জাতি যে পর্যন্ত না তাদের স্ত্রীলোকেরা লোক দেখাইবার জন্য মসজিদে যাওয়া আরম্ভ করিল—অভিশপ্ত হয় নাই।"[২]

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুগন্ধি ও সুন্দর পোশাক যদিও ইসলামের অঙ্গ তবুও হজরত নারীদের মসজিদে যাবার সময় জাঁকজমক বেশভূষা ও সুগন্ধি তেল ব্যবহার করা পছন্দ করেন নি। কেননা এরূপ করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত নামাজের উদ্দেশ্যের চেয়ে ফ্যাশান ও পরিপাটির দিকেই নারীদের মন চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশি। বাস্তবক্ষেত্রেও এটা দেখা যায় ইউরোপীয় মেয়েদের ব্যাপারে—তারা গির্জায় যাবার সময় রং চং ও সাজসজ্জা করে পুরুষদের আকৃষ্ট করে। ইহুদি মেয়েরা নামাজে যোগদান করার জন্য মসজিদে যেত। কিন্তু যখন মেয়েরা সীমা অতিক্রম করে পুরুষদের শুধু রূপ দেখান আরম্ভ করল তখন তারা অভিশপ্ত হলো এবং ধ্বংস হলো। এজন্যই হজরত তাদের উপমা দিয়ে মুসলিমদের সতর্ক করে দিলেন। ধর্মে স্বাধীনতা দেওয়া হলেও, পুণ্য অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ তাদের দেওয়া হলেও, উলঙ্গের স্বাধীনতা ও স্বৈরাচারী স্বভাবের স্বাধীনতা হজরত দেন নি—একথা প্রতিটি মুসলমানকেই স্মরণ রাখতে হবে।

পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যখন জাগরণের ঢেউ উঠেছে তখন নারীদের আমরা চেপে রাখতে চাই না। সামাজিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে, ধর্মীয় জীবনে, নারীদের বিধিসম্মত উপায়ে যতটুকু অধিকার তাদের প্রাপ্য তা আমাদের দিতেই হবে, যেহেতু নারীরা পুরুষেরই অর্ধাঙ্গিনী—আল্লাহর সৃষ্টিমাহাত্ম্যের এক গৌরবান্বিতা জাতি। এদের প্রাণ আছে, বুদ্ধি আছে, মন আছে এবং আত্মাও আছে।

১। বুখারী। সংগৃহীত ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের ইসলাম প্রসঙ্গ।

২। ইবন আদিল রব তহমিদ পুস্তকে আয়েশা হইতে বর্ণিত। সংগৃহীত ঐ

বিধবা বিবাহ

মানুষের জন্য ধর্ম। ধর্মের জন্যই মানুষ নয়। যে ধর্মে নারী-পুরুষের অবাধ অধিকার রয়েছে, কুসংস্কার হতে মানুষকে মুক্ত করেছে, চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েছে, সৃষ্টজীব হিসাবে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে সেটাই প্রকৃত ধর্ম। যুগে যুগে তাই মহামনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছে। মানুষের কল্যাণে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং সুন্দর পথ নিয়ে এসেছেন। কিন্তু সমাজ মনগড়া ব্যবস্থা দিয়ে মানুষকে মুক্ত হতে দেয় নি। এই মনগড়া ব্যবস্থা পরিশেষে কুসংস্কারে পরিণত হয়ে মানুষকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে। এর শিকার হয়েছে যুগে যুগে নারী জাতি।

সহমরণ সতীদাহের মতো লোমহর্ষক প্রথার কথা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। নারীরা নিজ সতীত্বের প্রমাণ করতে, স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা প্রদর্শন করতে কেমন কঠোর প্রথাই না পালন করেছে। তবু পুরুষের মন যোগাতে পারে নি। পুরুষ বিবাহের পূর্বে সৎ কি অসৎ এ প্রমাণ দেবার প্রয়োজন পড়ে না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার প্রমাণ করতে তার সঙ্গে চিতায় অথবা কবরে আশ্রয় নিতে হয় না। বৈধব্যজীবন পালন করে পুরুষকে তার যৌবনকেও ভাসিয়ে দিতে হয় না। এর জন্য যেন শুধু নারীরাই দায়ী। তারাই শুধু নির্মম বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

কুমারী নারীকে যেন কোন পুরুষ অসতী করতে না পারে এ জন্য তাদের লোহার ল্যাঙ্গট, কৌপিন, কোমর বন্ধ পরান হতো। এর প্রমাণ আজও মেলে ইউরোপীয় মিউজিয়ামে। ডঃ নরম্যান হেয়ার এর ছবি নিয়েছেন এবং এমন সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তার প্রবন্ধের মাঝে যা পাঠ করা হয়েছিল লন্ডনে অনুষ্ঠিত ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে Sexual Reform Congress-এ। শুধু কি তাই? মেয়েদের যৌনস্থান সেলাই করে দেওয়া হতো।[১] সতী কুমারীদের সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য মৌমাছিদের লেলিয়ে দেওয়া হতো—এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়। কুমারীকে মৌমাছি না কামড়ালে নাকি প্রমাণিত হতো যে সে সতী। আর যদি দুষ্ট মৌমাছি কামড়িয়ে কুমারীর স্বাদ গ্রহণ করত তাহলে প্রমাণিত হতো যে সে অসতী।

অনেকে আবার নারীর মূত্র ও স্তন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাত। তাদের ধারণা ছিল যে, সতী কুমারী নারীর মূত্র অসতী কুমারীর চেয়ে পরিষ্কার। লিঙ্কনের বিশপ ১২৫১ খ্রিষ্টাব্দে স্তন টিপে নারীর সতীত্ব দেখতেন। যার স্তনে দুধের সঞ্চার হয়েছে মনে হতো, তাকে অসতী আখ্যায়িত করে নির্মমভাবে হত্যা করা হতো। কিন্তু কি আশ্চর্য! অসৎ পুরুষের পরীক্ষা করার জন্য মৌচাকের কাছে নিয়ে মৌমাছিদের লেলিয়ে দেওয়া হতো না। এদের গনোরিয়া, সিফিলিস ও ঘোলাটে মূত্র দেখেও অসৎ আখ্যায়িত করে হত্যা করা হতো না। চামড়া বা লোহার ল্যাঙ্গট পরিয়ে দিয়েও সঙ্গম বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা করা হতো না। স্বামীকে বিদেশে পাঠাবার সময় লিঙ্গ টেনে সেলাই করেও দেওয়া হতো না। কেমন দেশ! কেমন বিচার! কেমন বিচারক!

১। এ তত্ত্বটি মেলে Ploss and Bartels প্রণীত Women গ্রন্থে। আফ্রিকা মহাদেশের সুদানে ছোট মেয়েদের যোনী সেলাই করে দেওয়া হয়। বিবাহের পর স্বামী নিজ হাতে ঐ সেলাই কেটে সঙ্গম করে এবং স্ত্রীকে সতী বলে মেনে নেয়। (সংগৃহীত আবুল হাসানাতের যৌনবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ৩৭৭)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্তমান যুগে নারীদের প্রতি কঠোরতম ব্যবস্থাগুলো অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। ধর্মের বিধানগুলো রাষ্ট্রীয় বিধান হিসাবে অনেকাংশেই স্থান পেয়েছে ও পেতে চলেছে। এটা সত্যই একটা শুভ পদক্ষেপ। তবুও কোন কোন দেশে নারীদের ওপর জুলুম চলছে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ষোড়শী যুবতী হলেও তাকে বিবাহ দেবার কোন ব্যবস্থা আজও আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা করতে পারেন নি যদিও রাষ্ট্রীয় আইন পাস করা হয়েছে। আমি জানি না তাদের ধর্মের কি বিধান। ধর্ম এমন কঠিন শাসন দেবে, নারীর প্রাণে এমন আঘাত হানবে, তাদের শান্ত মনকে এমনিভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করে নরকের আগুনে পোড়াবে—এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।

যৌবন নরকে যেমন দংশন করে, নারীকেও তেমনি দংশন করে। যৌবনের এ জ্বালা নরকে যেমন পাগল করে, নারীকেও তেমনি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। নিজের যৌবনকে নিয়ে যদি কেউ বিচার করত তাহলে পরের ওপর এমন কঠিন আজাব দিত না। যৌবন জ্ঞান-বুদ্ধি মানে না। যৌবন মান-অপমানের পরোয়া করে না। যৌবন চায় মিলন। যৌবন চায় নারী-পুরুষের একত্র বাস। বিধবা হলে কি যৌবন বিধবা হয়? স্বামীর মৃত্যু হলে কি স্ত্রীর যৌন-বাসনার মৃত্যু হয়? স্বামীর দেহ ভস্মীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে কি স্ত্রীর কাম-বাসনা ভস্মীভূত হয়? প্রকৃতি নিয়মের বরখেলাপ করে না। আপন গতিতেই চলে। তাই যৌবন যৌবনই থাকে। তা হিন্দুর হোক, মুসলমানদের হোক, নারীর হোক, পুরুষের হোক, পশুর হোক বা পক্ষীর হোক!

হিন্দুধর্মেও যে বিধবা বিবাহের বিধান আছে একথা বহু শতাব্দী ধরে চাপা পড়ে থাকলেও আজ তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যুগে যুগেই মহামনীষীদের জন্ম হয়। মানুষের কল্যাণে তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। ভয়-ভীতির তাঁরা বহু উর্ধ্বে। তাই সমাজের কুসংস্কার ও দেশাচার ভেদের মাথায় কুঠারাঘাত করে সুন্দর সাবলীল ব্যবস্থারই নির্দেশ দিয়ে থাকেন। হিন্দুধর্মেও এর প্রমাণ মেলে স্বনামধন্য পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সকরুণ আবেদনের মাঝে। যুগ যুগের অবহেলিত বিধবাদের দুঃখ ও দুর্দশা দেখে এ দয়ালু মহাত্মা সহ্য করতে পারেন নি। ঝাঁপিয়ে পড়লেন কলুষ সমাজের মাঝে। প্রকাশ করে দিলেন চাপা দেওয়া ধর্মতত্ত্ব। আবেগময় ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় তিনি স্বজাতীয়দের সম্বোধন করে বললেন—

"আপনারা ইতিপূর্বে কেবল শাস্ত্র দেখিয়াই পূর্ব প্রচলিত আচারের পরিবর্তে অবলম্বিত নতুন আচারের সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এখানে যখন শাস্ত্র পাইতেছেন এবং সেই শাস্ত্র অনুসারে চলিলে বিধবাদিগের পরিত্রাণ ও শত শত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয় স্পষ্ট বুঝিতেছেন, তখন আর প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করা আপনাদিগের কোন মতেই উচিত নহে। যত ত্বরায় সম্মতি প্রদান করেন ততই মঙ্গল। বস্তুত দেশাচারের দোহাই দিয়া আর আপনাদিগের এ বিষয়ে অসম্মত থাকা অনুচিত।...

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করেতেছিস! তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস—ধর্মের মর্ম ভেদ করিয়াছিস, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে।...."

মহামনীষীদের বাক্য অমর। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এ বাণী পালনীয়। প্রতিটি ধর্মের মাঝেই কুসংস্কার বিদ্যমান। এ কুসংস্কার ভেদ করে সত্যের আলোর উর্ধ্বে আসা কঠিন। তবুও প্রয়োজন—বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা জাতি চিরদিন নিষ্প্রাণ হয়েই থাকবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে জ্ঞানদান করেছেন, যেভাবে চক্ষু উন্মিলন করে দিয়েছেন তা সত্যই অদ্ভুত। হিন্দু মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলের জন্যই এক মহান শিক্ষা। ধর্মের নামে যে অধর্মের রাজত্ব চলছে দেশাচারের নামে যে অনাচারের শেকড় বদ্ধমূল হয়েছে তার মুলোৎপাটন না করলে কোন জাতিরই মুক্তি নেই। ধর্ম ঠিকই শিক্ষা দেয়। কিন্তু সমাজ মনগড়া ব্যবস্থা দিয়ে মানুষকে মুক্ত হতে দেয় না। এই মনগড়া ব্যবস্থা পরিশেষে কুসংস্কারে পরিণত হয়ে মানুষকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে। আর এর শিকার হয় যুগে যুগে নারী-জাতি।

বিধবা বিবাহ না হবার ফলে হিন্দু-সমাজের কি পরিণতি দাঁড়িয়েছে এর তত্ত্বও উদ্ঘাটন করেছেন এ মহান চিন্তাবিদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বলেছেন—

হয়ে ভারতবর্ষীয় নারীগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিয়া দেখ তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উদ্বেলিত হইয়া যাইতেছে; আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর নিবিষ্ট চিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য ও যথার্থ মর্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিবারণ করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারে যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ়সংকল্প লইয়া লৌকিক রক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে প্রত্যাশা করিতে পার না যে তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জন, দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সংকল্পিত লৌকিক রক্ষা ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া যথার্থ সৎ পথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাস দোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধন প্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যার পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণালয়ে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার রিপু বশীভূত হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ। ধর্মলোপ ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোক-লজ্জা ভয়ে ভ্রূণ হত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ। কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকেও দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রী-জাতির শরীর পাপময় হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তিমূলক; পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, সদ্বিবেচনা নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম—আর যেন সে দেশে অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

হায় অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।"

[যৌনবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ৪২১-২২]

আজও যারা এ প্রাণস্পর্শী আবেগে সাড়া দিতে পারেন নি, অধর্মের বিপাকে পড়ে ধর্মকে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন, অবলা নারী জাতির মন নিয়ে খেলা করছেন, শুনে রাখুন, তারা মহাপাপে লিপ্ত। সমাজ আপনাদের বাহবা দিলেও মহাবিচারের দিনে আপনারা মুক্তি পাবেন না। কেননা বিধবাদের বিবাহ দেওয়া সৃষ্টিকর্তারই নির্দেশ। দেখুন তিনি কি বলেন ঃ

"এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং স্বীয় পত্নীগণকে ছাড়িয়া যায় তবে তাহারা চারিমাস দশদিন প্রতীক্ষা করিবে। অতঃপর যখন তাহার স্বীয় নির্ধারিত সময় উপস্থিত হয় তখন তাহারা নিয়মানুযায়ী যাহা করিবে তজ্জন্য তোমাদের কোন দোষ নাই; এবং তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ্ অভিজ্ঞ।" (২ ঃ ২৩৪)

সৃষ্টিকর্তার বাণী পেয়েছেন, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর নির্দেশ দেখেছেন, এবার আর নয়। বহুদিন আপনারা নারী-সমাজ নির্যাতিত হয়েছেন। পুরুষের নির্মম অত্যাচারে জীবন অতিবাহিত করেছেন। মানবী হয়েও দানবীর পাশবিক শিকারে পড়েছেন। বিশ্বের নারী-সমাজ মিলে এবার আওয়াজ তুলুন ঃ

"নারীর মর্যাদা দিতে হবে বেশ্যালয় ভাঙতে হবে"
"স্বামী সেবার সনদ চাই পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ চাই"
"পবিত্রতার গ্যারান্টি দাও মানুষ করার ভাতা দাও"
"স্বামীর চিতায় উঠব না নাচে গানে নামব না"
"খাবার বৈষম্য শুনব না। বিধবা জীবন কাটাব না"
"শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ নেব। ধর্মে কর্মে যোগ দেব ॥"

—লেখক

pdf By Syed Mostafa Sakib